কুর'আন ও সুন্নাহ্য় সুদ নিষিদ্ধকরণ

ইমরান নযর হোসেন

কুর’আন ও সুন্নাহ্‌য় সুদ নিষিদ্ধকরণ

ইমরান নযর হোসেন

মাকসুদা বেগম ও ফারজানা ইশরাৎ অনুদিত

প্রকাশকাল ঃ জিলহাজ্জা, ১৪২৭ হিজরী

জানুয়ারী, ২০০৭ খ্রীস্টাব্দ

পুণঃমুদ্রণ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী

অক্টোবর, ২০০৯ খ্রীস্টাব্দ

প্রচ্ছদ

টেকনোগ্রাফিক্স

প্রকাশক

মাহমূদ ব্রাদার্স

৮/১১ (ক) স্যার সৈয়দ রোড, মুহাম্মাদপুর

মূল্য ঃ দুইশত টাকা মাত্র

দশ ইউ এস ডলার

Qur’an O Sunnah’ai Sud Nishiddhokoron
Imran N Hosein
Translated from English by Maksuda Begum and Farzana Ishrat
Price : Tk. 200.00 ; US Dollar : 10.00

সূচীপত্র

৪ গ্রন্থকারের ইংরেজী মুখবন্ধ

৬ কেন এই অনুবাদ

১৫ প্রথম অধ্যায়

৩২ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রিবার (সুদের) সংজ্ঞা

৪৮ তৃতীয় অধ্যায় ঃ কুর'আনে রিবা নিষিদ্ধকরণ

৯৩ চতুর্থ অধ্যায় ঃ হাদীসে রিবা বা সুদ নিষিদ্ধকরণ

১৩১ পঞ্চম অধ্যায় ঃ রিবা (সুদ) সংক্রান্‌ড় মৌলিক আলোচনা

১৫৮ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রিবা এবং দারুল হারব (সংঘাতের সাম্রাজ্য)

১৬২ সপ্তম অধ্যায় ঃ রিবা এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার আইন বিধান

১৬৭ উপসংহার

১৭৪ পরশিষ্ট ঃ রিবা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

১৮০ **Glossary** -পরিভাষা পরিচিতি

গ্রন্থকারের ইংরেজি মুখবন্ধ

The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah (**কুর'আন ও সুন্নাহ্য় রিবা নিষিদ্ধকরণ**) বইটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু মওলানা ডক্টর মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (১৯১৪-১৯৭৪) রহমতুল্লাহ আলাইহির সম্মানে আনসারী স্মরণিকা সিরিজের দ্বিতীয় প্রকাশনা। প্রথমে এটি ছিল *ইসলামে রিবা নিষিদ্ধকরণের গুরুত্ব* নামের একটি পুস্ড়িকা। রিবার[১] ধ্বংসাত্মক ছোবলে আক্রান্ড় সংকটময় পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসেবে পূর্বের পুস্ড়িকাটি প্রকাশিত হয়। পুস্ড়িকাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং মালয়শিয়ায় প্রায় ৬০,০০০ কপি ছাপিয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

রিবার অত্যাচার ও আগ্রাসন এবং তার প্রতিকারে চিন্ড়া গবেষণা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফলে আমরা অবগত হয়েছি যে অধিকাংশ মুসলিমের *রিবা* বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্ড়া-চেতনা খুবই অপ্রতুল। রিবার পুরো বিষয়টিকে কৌশলে পর্দার অন্ড়রালে ঢেকে রাখা হয়েছে। সে কারণে অর্থ ব্যবস্থায় রিবা বিষয়ক সঠিক তথ্য জানা এবং বোঝার ব্যাপারটি বহুলোকের দৃষ্টি সীমানার বাইরে রয়েছে। বাদ বাকি মানুষ রিবার হারাম হওয়ার বিষয়টি জানতে নারাজ। রিবা (সুদ) যাদের রুজি রোজগারের মাধ্যম, তাদের ধারণা এ বিষয়ে জানতে গেলেই বিপদ।[২] এতো সেই সংকটময় সময়, যে সময়ের ব্যাপারে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: *কিয়ামতের আলামতের একটি হলো, ইলম উঠে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে* — সহীহ্ বুখারী।

মুসলিম জাতি তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে রিবার ভয়াবহ অভিশাপ এবং আর্থসামাজিক শোষণ ও নিপীড়ন থেকে উদ্ধারের জন্য রিবা বর্জনে ব্যাপক গণসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের ঘরে এমন সব বই জরুরী ভিত্তিতে পৌঁছে দিতে হবে যে সব বইয়ে অত্যন্ড় পরিষ্কার, সহজ ও সাবলীল বর্ণনায় রিবার ভয়াবহতার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। বই রচনা ও প্রকাশনার মধ্যেই আমাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং অবশ্যই তা বিলিয়ে দিতে হবে প্রতিটি মুসলিমের দোরগোড়ায়[৩]।

বিশ্বের মুসলিমের মাঝে রিবা বা সুদের বিষয়ে ভয়ানক অজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যেই এই গ্রন্থ রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই প্রচেষ্টা কোন কারণে ব্যর্থ হলে তা হবে আমাদেরই অক্ষমতা। সম্মানিত আলীম এবং পাঠকদের পরামর্শ, সহায়তা, সমালোচনা গ্রন্থটিকে

---

[১] রিবা একটি আরবী শব্দ যা বাংলা ভাষায় সুদ নামে পরিচিত।

২. [কারণ, জানলেই মানার পালা চলে আসে। তাদের ধারণায় 'না-জানা' বান্দার গুনাহ্ নেই। অথচ ইসলামে অজ্ঞতার অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগ নেই। কেননা রসুল (স)-এর প্রতি কুরআনের প্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তার প্রথম শব্দটিই হলো ইক্বরা অর্থাৎ জ্ঞানার্জন কর। আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুম অমান্য করার কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? তাছাড়া রসুল (স) বলেছেন: *এলেম অর্জন (তালাশ করা) প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয* (ইবনে মাজাহ্)। বর্তমানে রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং লেনদেনে বস্তুবাদী ভোগবাদী মানুষগুলি গুনাহ্ ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবে আছে।] তারা মনে করে সততার সাথে ব্যবসা করা বা রিবা বর্জন করে বর্তমানের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা চালিয়ে নেয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই রিবা বর্জিত অর্থনীতিতে আত্মনিয়োগ করলে বর্তমানের আরাম ও ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবনকে বিদায় জানাতে হবে। এ ধরনের উদাসীনতা ও অজ্ঞতার সুযোগে রিবার ভয়াবহতা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ঘিরে ফেলেছে, এই কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। আর আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হলে বলতে হবে, আলহামদুলিল্লাহ্, কারণ সে সফলতায় আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। তা একান্তই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অসীম দয়া।

রিবার মত জটিল একটি বিষয় উপস্থাপনে আমরা গ্রন্থকারের ভাবাবেগ ও অভিমতকে সীমাবদ্ধ রেখে যতটা সম্ভব কুর'আন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একই সাথে আলোচনার মূল বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর দায়িত্ব পালনের যথাযথ চেষ্টা করেছি। বহুমুখী প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কারণে কুর'আন সুন্নাহ্র কোন কোন উদ্ধৃতি পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের শেষে (স), সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুদের নামের শেষে (রা) এবং আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের নামের শেষে রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে সংক্ষেপে (রহ) লেখা হয়েছে। আরবী ভাষার সহীহ্ (শুদ্ধ) উচ্চারণ অন্য কোন ভাষায় সম্ভব হয়না। তাই পাঠকগণের কাছে এই সকল দু'আগুলি সহীহ্ উচ্চারণে পাঠ করার অনুরোধ রইল।

শায়তানের উচ্চাভিলাষ অনুযায়ী, মুসলিম বিশ্ব থেকে কুর'আন-সুন্নাহ্র আইন বিধান বিদুরিত হয়েছে। তাই বহুবিধ গোমরাহীর সাথে সাথে রিবা বা সুদের বিষয়টির প্রচার এবং প্রসার ঘটেছে মারাত্মক ছলচাতুরী ও প্রতারণার মাধ্যমে। শায়তানের একান্ত ইচ্ছা হলো প্রথমেই বিভিন্ন ছলনায় ঈমান নামক অমূল্য সম্পদ তথা আল্লাহর নি'আমাতকে মুসলিমের অন্তর থেকে মুছে ফেলা। অতপর মুসলিম বিশ্বের প্রধান একটি অংশকে প্রতারিত করা এবং দারিদ্রের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়া। রিবার মত একটি বিশাল ও জটিল বিষয় মাত্র একটি বই অধ্যয়ন করার ফলে মুসলিমের ধ্যান-ধারণা আচার আচরণ রাতারাতি পাল্টে যাবে এই আশা করা কতটা যুক্তিযুক্ত আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। আমরা আশা করছি, সম্মানিত পাঠক মহল এই বইয়ের বক্তব্য কুর'আন সুন্নাহ্র সাথে মিলিয়ে নিয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে রিবা নামক ভয়ংকর ফিৎনার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে শায়তানী আইন-বিধান ও ক্ষমতাকে প্রতিহত করার প্রয়াস পাবেন, ইনশাআল্লাহ্।

ইমরান নযর হোসেন
লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক
শাওয়াল ১৪১৭, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

৩. কুর'আনুল কারীমের পর রসুল (স)-এর সুন্নাহ্ বা হাদিস যে জ্ঞানার্জনের মূল উৎস, আজো এটা অধিকাংশ মুসলিম জানেন না। কুর'আন-সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে তাকে দূরে ঠেলে দেয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ শির্ক, কুফর ও বিদ'আতী রেওয়াজের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কেন এই অনুবাদ

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের এক সকালে দেখতে পেলাম ক'জন পুলিশ আমাদের বাড়ীওয়ালা বিধবা মহিলার ঘরের ফার্নিচার থেকে শুর‍ু করে সকল মালপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলছেন। আর অপর ক'জন পুলিশ সেই মালপত্রগুলি গাড়ীতে তুলে নিচ্ছেন। তিলে তিলে গড়ে তোলা সাজানো সংসারের কত সাধের মাল-সামানের এই ভয়ানক পরিণতি দেখে বিধবা আর স্থির থাকতে পারলেন না। একে একে প্রতিটি পুলিশের কাছে কান্নাকাটি করে অনুরোধ করতে থাকার এক পর্যায়ে তিনি এক পুলিশ অফিসারের পা জড়িয়ে ধরলেন মাল-সামান ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। পা ছাড়ানোর জন্য পুলিশ অফিসার সজোরে ধাক্কা মেরে দূরে ঠেলে দিলেন বিধবাকে। এই নির্যাতনের বির‍ুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম। পুলিশরা জবাবে বললেন: "বনানীর মত এলাকায় দশ কাঠা জমির উপর ব্যাংক ঋণ নিয়ে স্বামীর বানানো ছয়তলা বাড়ীর ভাড়া খেয়ে চলেছেন। অথচ এই মহিলা সুদের কিস্তি পরিশোধ করছেন না।" খালাম্মা আমাকে বললেন: "এত বছর ধরে ঋণের কিস্তি দিয়েই চলেছি কিন্তু ঋণতো আর শেষ হয় না মা। বিরাট এক ঝামেলার কারণে কয়েকটি কিস্তি বাকী পড়েছে তাই এরা মাল ক্রোক করে নিয়ে যাচ্ছে।" তিনি আরো বললেন: "বিরানব্বই হাজার টাকার ব্যবস্থা আমি এখন কোথা থেকে করবো মা?" অতপর সুদী ঋণের দায়ে আর্থিক দুরবস্থায় পতিত বিধবাকে বিরানব্বই হাজার টাকার ব্যবস্থা করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালক্রোকের হয়রানি থেকে উদ্ধার করলেন। হারাম-হালালের আইন বিধান লংঘন জনিত কারণে বিকৃত ও বিপর্যস্ত যে সুদী অর্থ ব্যবস্থা গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করেছে, এই ঘটনা তারই খন্ডচিত্র মাত্র। ইহুদি তথা পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদ গোষ্ঠি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত রিবা বা সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ঋণদানের মাধ্যমে প্রতারণা, জালিয়াতি ও অর্থনৈতিক শোষণের বীজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্বের মানুষ আজ দারিদ্রজনিত দাসত্বের কারাগারে বন্দী। আর ব্যক্তি থেকে শুর‍ু করে জাতীয় পর্যায়ে সারা বিশ্বের মানুষ এই সুদী ঋণের বোঝা বহন করে চলেছে। সুদী ঋণ ছাড়াও গোটা দুনিয়া জুড়ে আজ আরো বহু ধরনের আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন বিরাজমান রয়েছে। বিশ্ব জুড়ে আর্থ-সামাজিক নির্যাতন ও নিপীড়নের অন্যতম কারণ রিবা বা সুদ। বর্তমান দুনিয়ার একটি মানুষও রিবারূপী এই ফেৎনা থেকে রেহাই পায়নি। রিবা-সৃষ্ট ফেৎনা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করে বলেছেন: *তোমরা সেই ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক, যে ফেৎনার অশুভ পরিণাম তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না (বরং যারা এই ফেৎনাকে সহনীয় করে নিয়েছে তাদের কাছেও পৌছে যাবে)। আর জেনে রাখ আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিদানে খুবই কঠোর।* (সূরা আনফাল, ৮:২৫)।

কুর’আনের এই আয়াতের বক্তব্য এতই পরিস্কার যে একে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে একটি কথা সকলেরই মনে রাখতে হবে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কথিত আধুনিক যুক্তি ও কর্মকান্ড দ্বারা কোন ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকার উপায় নেই। যে কোন ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলিমগণকে কুর’আন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নিয়ে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। মুসলিমদের বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছেন কোন মানুষ বা কোন দেশের শাসকগোষ্ঠি যখন তাকে হালাল বা বৈধ বানিয়ে নেয় তখন সেটা শুধু কুফ্র নয় বরং শির্কের পর্যায়ে চলে যায়। মুসলিমদের আরো বুঝতে হবে যে, কুফ্র জগত সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র আইন ও বিধান বদলে দিয়ে স্রষ্টাবিমুখ দুনিয়া বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মগজ ধোলাইকৃত, নির্বোধ ও লোভী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণও কুফ্র জগতকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর’আনে ঘোষণা করেছেন:

হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা যদি আহলে কিতাবদের (ইহুদি, নাসারা) মধ্য হতে কোন একটি দলের কথা মেনে চলো তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পরও পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০০)।

তোমাদের দ্বীনে (জীবন বিধানে) যারা ঈমান এনেছে তারা বাদে অন্য কারোর (নিয়ম বিধান) তোমরা অনুসরণ করোনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩:৭৩)।

তারা কি আল্লাহ্র দ্বীন বাদ দিয়ে অন্য দ্বীন (নিয়ম বিধান) তালাশ করে বেড়াচ্ছে? (সূরা আলে ইমরান, ৩:৮৩)।

অথচ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আদেশই (হুকুম, বিধান) মেনে চলতে (কার্যকর করতে) হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭)।

আমি তোমাদের কাছে (এমন) কিতাব নাযিল করেছি, যে কিতাবে তোমাদের সকলের কথা আছে। তবুও কি তোমরা জ্ঞান বুদ্ধি খাটাবে না। (সূরা আম্বিয়া, ২১:১০)।

তোমরা হিদায়াত (জান্নাতে যাওয়ার সঠিক পথ দেখানোর নিয়ম) সম্বলিত কিতাব কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরো, তাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে করে তোমরা (গুণাহ্ ও নাফরমানী থেকে) তাকওয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পার। (সূরা আ'রাফ ৭:১৭১, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)।

হে লোক সকল তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্ তা'আলা ও রসুল (স) এর অবাধ্য হয়ে আমানাতের খিয়ানত করো না। জেনে রাখ মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি হচ্ছে তোমাদের জন্য ফেৎনা (যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চান, মাল-সম্পদ ও সন্তানরূপী নি'আমাত তোমরা কোন কাজে লাগাও)। হে মু'মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করে (তাঁর আইন বিধান মেনে) চলো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে পার্থক্য নির্ণয়কারী (স্বতন্ত্র মান মর্যাদা) দান করবেন, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দান অনেক বড়। (সূরা আনফাল, ৮:২৭-২৯)।

মহা বরকতময় তিনি, নিখিল বিশ্বের সর্বময় ক্ষমতা কর্তৃত্ব যার হাতের মুঠোয়, আর তিনি সর্বশক্তিমান। (আল্লাহ্র হুকুম বিধান অনুযায়ী চলে) তোমাদের মধ্যে আমলের বা কাজের দিক থেকে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মাউত (মৃত্যু) ও হায়াত (জীবন) সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭:১-২)।

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে (জীবন যাপনের) পথ দেখিয়েছি। এবার হয় সে আমার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে জীবন যাপন করবে নয়তো অকৃতজ্ঞ হয়ে কুফরীর পথে চলবে। (সূরা দাহ্‌র, ৭৬:৩)।

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিশ্চিতই তোমাদের কাছে অন্তর্দৃষ্টির আলো সম্বলিত নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব যে এই নিদর্শন দেখার চেষ্টা করবে, সে নিজেরই উপকার করবে আর যে তার দৃষ্টিশক্তি কাজে না লাগিয়ে অন্ধ থাকবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। (সূরা আন‘আম, ৬:১০৪)।

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় করেছে এবং গুণাহ ও খারাপ কাজ করা থেকে নিজের নাফ্‌সকে দমন করতে পেরেছে। অতপর নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার চিরকালের বাসস্থান। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯:৪০-৪১)।

অতপর যখন সে মহা দুর্ঘটনা (কিয়ামাত) ঘটে যাবে। যেদিন মানুষ তার সকল কৃতকর্ম স্মরণ করবে কি চেষ্টা সাধনা সে করে এসেছে। তাদের দৃষ্টির সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার (নিয়ম বিধানের) সীমালংঘন করেছিল। আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। অতপর জাহান্নামই হবে তার স্থায়ী ঠিকানা। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯:৩৪-৩৯)।

এমনিভাবেই কুর’আনুল কারীমের প্রতিটি আয়াতে উপদেশ, সতর্কবাণী, সুসংবাদ, উপমা ও ইতিহাস তুলে ধরে গোটা বিশ্বের মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথ ত্যাগ করে কল্যাণ ও সফলতার পথে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল-কুর’আনে আরো রয়েছে আল্লাহ্ তা‘আলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামে আত্মসমর্পনকারী মুসলিমের জীবন পদ্ধতি এবং সঠিক সোজা (সিরাতুল মুসতাকীমের) পথে চলার বিস্তারিত রূপরেখা। এখন মানুষের দায়িত্ব হলো আল-কুর’আনের সূরা বাকারা থেকে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত প্রতিটি সূরা ও আয়াতের অর্থ বুঝে পড়া, তার মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কেননা জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে আল-কুর’আন কল্যাণ ও নাযাত বা মুক্তির দিকে আহ্বান জানিয়েছে। কুর’আনের এই আহ্বান বিবেচনা করে প্রতিটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা‘আলার মনোনীত জীবন পদ্ধতি মেনে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা সাধনা করে যেতে থাকবে, না কি কুর’আনকে দূরে ঠেলে দিয়ে অজ্ঞতার অজুহাতে স্বেচ্ছাচারী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের পথ বেছে নিবে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

আর আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)।

ইবাদত বলতে মূলত যা বোঝায় তা হলো, ঈমান এনে কুর'আন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি হুকুম আহ্‌কামকে জানা ও তা পালন করা। আর কুর'আন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হারামকে হারাম মনে করে তা বর্জন করা। কেননা হালাল-হারামের ব্যাপারে আপোষ করে কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না যতক্ষণ না তাওবা করে হারাম পথ থেকে ফিরে আসা হয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলামের মূলনীতি হলো সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও মন মানসিকতার সংশোধন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে আত্মসংযমের মাধ্যমেই মানব প্রবৃত্তির যাবতীয় খারাপ দিকের এবং ক্ষতিকর জীবন ধারার মুলোৎপাটন করা সম্ভব। তাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা ও প্রকৃত অভাব নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের জরুরী প্রয়োজন বা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে অর্থ-সম্পদ বা রিয্‌ক আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় শির্‌ক-কুফ্‌র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও অন্যান্য ভ্রান্ত শিক্ষা, ক্ষমতা এবং আধিপত্য বিস্তার ও সন্ত্রাস ব্যভিচার সহ অসংখ্য ফেৎনা ফ্যাসাদ বিস্তার, অশ্লীল নাচ-গানের মত অপ-সংস্কৃতি, খেলাধূলার নামে বাড়াবাড়ি এবং খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক ব্যয়ের প্রতিটি পর্যায়ে অপচয়-অপব্যয় ইত্যাদির পেছনে। আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া রিয্‌ক শয়তানী ভ্রান্তনীতির পেছনে খরচ করার কারণে প্রকৃত অভাব দূর করে ইনসাফ ও সমবন্টনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না।

ইসলামের পক্ষে অবস্থান করে মুসলিম পরিচয় দিতে যারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তারাও অনেকেই পশ্চিমা জীবন ধারা অনুকরণে আরাম আয়েশ ও লোভ-লালসার মোহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই স্পেনের মুসলিম শাসন, ওসমানিয়া খিলাফাহ্, বাগদাদের ইসলামি খিলাফাহ্ এবং ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যের অবসান ও পতনের মূলে ছিল লোভ-লালসা, অধঃপতিত নৈতিক চরিত্রের কারণে অনৈক্য ও দুর্নীতি, ভোগ-বিলাস ও মদ-জুয়া ইত্যাদি ফেৎনা ফ্যাসাদের ব্যাপক বিস্তার। কুর'আনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

আর (মানুষের) জন্যে সামনে ও পিছনে একের পর এক ফিরিশতার দল নিয়োজিত থাকে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে হিফাজত করে। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজ অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির জন্যে কোন বিপদ পাঠাতে চান তখন তা প্রতিরোধ করার কেউই থাকে না এবং না থাকে কোন সাহায্যকারী বন্ধু আল্লাহ্ ছাড়া। (সূরা রা'দ, ১৩:১১)।

এই আয়াত থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ব্যক্তি জীবন থেকে শুর করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে আল্লাহ্ ও রসুলুল্লাহ্ (স) নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা মেনে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফিরিশতা দিয়ে মানুষকে হিফাজত করবেন। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার পরিণতি জানিয়ে কুর'আনের বর্ণনা শুনুন:

যখন আল্লাহ্ ও রসুল (স) কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মহিলার অধিকার নেই যে, তারা সে ব্যাপারে (আইন বিধান তৈরীতে) কোন রকম অধিকার খাটাবে। যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলা এবং রসুল (স)-এর আদেশ অমান্য করবে সে নিশ্চিত পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৬)।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সারা বিশ্বের মানুষ এমনকি মুসলিমদের জীবন ধারাও কুর'আন-হাদীসে পেশকৃত জীবন ব্যবস্থার সাথে চরম সাংঘর্ষিক। কুর'আন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য (হিদায়াত) সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা ও উদাসীনতাই এই সংঘর্ষের মূল কারণ। বর্তমান মুসলিম সমাজ, নির্দিষ্ট কিছু দু'আ উচ্চারণের মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের আশা করে এবং নামায, রোযা, ঈদ, কুরবানী, হজ্জ ও বিভিন্ন উপলক্ষে দিবস-বর্ষ উদযাপন করে শুধুমাত্র লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতার মাঝে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে বর্ণনা করেছেন:

তোমরা যে পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ ঘুরাও প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন পূণ্য নেই। বরং আসল পুণ্য হলো: যে ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, আখিরাতের উপর, সকল ফিরিশতা, সকল কিতাব ও সকল নবীগণের উপর। আর যারা আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও (আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়া) পথিকদেরকে দান করে তাদের অতিপ্রিয় মাল-সম্পদ থেকে, শুধুমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তারা আরো দান করে সাহায্যপ্রার্থীকে এবং বন্দীদশা হতে মুক্ত করার জন্য। আর তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, যখন ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদা তারা পূর্ণ করে। আর তারা অর্থ সংকট, রোগব্যাধি এবং হক-বাতিলের সংগ্রাম ও অন্যান্য বিপদ আপদে সবরকারী। এরাই সে সকল লোক যারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং প্রকৃত মুত্তাকী। (সূরা বাকারা, ২:১৭৭)।

আলোচ্য আয়াতে পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ ফেরানোর বিষয়টি একটি উপমা মাত্র। এ থেকে প্রথমত যা বোঝা যায় তা হলো শুধু নিয়ম রক্ষা ও আচার অনুষ্ঠান পালন প্রকৃত ইবাদত নয়। বরং ঈমান আনা এবং আল্লাহ্ ও রসুল (স)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফরয কাজগুলি করার সাথে সাথে কুর'আন হাদীসের আদেশ নিষেধ দৃঢ়ভাবে মেনে চলাই ইবাদত। দ্বীন ইসলাম হলো কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত বিধি বিধানের সমষ্টি। একটি বাদ দিয়ে বা অপূর্ণ রেখে অপরটি কখনো চলমান থাকতে পারে না। শান্তি ও কল্যাণের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে মানুষ আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে এটাই ইসলামের কাম্য। পর্যাপ্ত রিয্ক প্রাপ্তির ফলে আর্থিক ভাবে সচ্ছল ব্যক্তি নিজেদের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে যা বাড়তি থাকে তা থেকে মুসলিমগণ কুর'আন ও সহীহ হাদীসে যেমন প্রকৃত অভাবী আত্মীয়, বিধবা ও ইয়াতীম, মিসকিন, পথিক,

মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং বন্দীদশায় পতিত ব্যক্তির মুক্তির জন্য ও জনকল্যাণকর খাতে ব্যয় করবে এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। অসুস্থতা ও বিপদে আপদে অন্যের কাছে হাত যেন পাততে না হয় এবং মৃত্যুকালে স্ত্রী সন্তান ও উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়া ইসলামে বৈধ। তাই বলে নিজেদের জন্য জান্নাত তুল্য আরাম-আয়েশ ও ভোগ সুখের জন্য এক শ্রেণীর লোক প্রাসাদ বানাবে আর অঢেল সম্পদ ব্যাংকে জমা রাখবে, আর অপর শ্রেণী না খেয়ে কিংবা আধপেটা খেয়ে রাস্তা ঘাটে পশুর মত জীবন কাটাবে এটা ইসলামের বিধান হতে পারেনা।

দ্বীনের বিধান মানার ব্যাপারে যদিও ইসলামে কোন জোর জবরদস্তি রাখেনি, তথাপি ইসলামে সত্য সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুর'আন পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সৎকাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজে বাধাদানের মাধ্যমে শোষণ, অবিচার ও দুর্নীতির মুলোৎপাটনে সদা সচেষ্ট থাকা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এটাই মু'মিনের মিশন। (দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪ ও ১১০)।

ইসলামে স্বার্থপরতা, অপচয়, ভোগ-বিলাসিতা, দুর্নীতি, শোষণ ও জুলুমের কোন স্থান নেই। ইসলামে রয়েছে সাম্যের বিধান। ইসলাম সম্পদশালীদের যেমন অপব্যয়-অপচয় বর্জন করার নির্দেশ দেয়, তেমনি তাদের বাড়তি সম্পদ (সঠিক হিসাব করে) যাকাত, সাদাকা, কর্‌যে হাসানা দানের নির্দেশ ও উৎসাহদানের মাধ্যমে সমাজের সম্পদ সমাজের মাঝে আবর্তিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তেমনি মানুষ যাতে একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়ে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে না দেয় সে শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি নবী (স) এর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি ভিক্ষা দিয়ে বললেন, যদি তোমরা ভিক্ষার কুফল জানতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কিছু চাইতে না। ইয়াতীম, বিধবা, আত্মীয়, প্রতিবেশী, পথিক, মুসাফির ও শ্রমজীবী মানুষের হক আদায়ে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে দারিদ্র বিমোচনের যে বিধান ইসলামে রয়েছে তা কার্যকর করা গেলে কখনোই বিদেশী খয়রাত গ্রহণ করতে হতো না ও রিবা বা সুদী ঋণের কবলে মুসলিমদের পড়তে হতো না। বরং তাদের জমানো বাড়তি সম্পদ সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হতে পারতো। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় অন্যতম প্রভাবশালী বিধান হলো বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও সুবিচারমূলক মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হালাল ব্যবসার ব্যবস্থা করা।

কুর'আন সুন্নাহ তথা ইসলামি হুকুম বিধান সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা মুসলিম উম্মাহ্‌কে ফেৎনা ফ্যাসাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে রেখেছে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় দুর্নীতি, জুলুম, নিপীড়ন ও শোষণের বিলোপ সাধনে যে কার্যকর ও মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো রিবা বা সুদ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে সকল প্রকার সুদী কর্মকান্ডের মুলোৎপাটন। রিবা বা সুদ আর্থ-সামাজিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমান বিশ্ব রিবার মাধ্যমে দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতির বিষাক্ত সংক্রমন ছড়িয়ে মানুষকে

ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। রিবা ভিত্তিক বিকৃত অর্থ ব্যবস্থায় লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী সুদী ঋণ দানের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায়। রিবা মানুষকে কৃপন, স্বার্থপর প্রতারক, অলস এমনকি স্রষ্টা বিমুখ বানিয়ে ছাড়ে। রিবা হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ, দান-সাদাকা এবং কর্যে হাসানা দানকে চরমভাবে নির‍ুৎসাহিত করে আর মানুষের সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল ও হারাম পন্থায় সুদী বিনিয়োগে তাড়িত করে বেড়ায়। ফলে সম্পদ সমাজের সকল মানুষের মাঝে আবর্তিত না হয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী মানুষের চারপাশেই আবর্তিত হতে থাকে। এই পুঁজিবাদী মহল নিজেদের মধ্যে সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার মানুষকে নিঃস্ব কাঙালে পরিণত করে। দারিদ্রের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে ফলে তারা অর্ধাহার, অনাহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়। শির্ক, কুফ্র ও অন্যান্য ভ্রান্ত্নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি এই সকল লোকের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদী গোষ্ঠির কাছে খয়রাত কিংবা অর্থঋণ সুবিধা চেয়ে হাত পাতে, যা ইসলামে অতি জোরালো ভাষায় নির‍ুৎসাহিত করা হয়েছে। '*যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দারিদ্রের দরজা খুলে দেন*'। (মু'জামুস সগীর, তাবরাণী)। স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী মহল তাদের পুঁজি, সুদী ব্যবসায় খাটানোর জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাবলম্বি হবার কথা কল্পনাও করতে না পারে। চির জীবন পুঁজিবাদদের সুদী ঋণের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে বছরের পর বছর পুরনো ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পুনরায় নতুনভাবে ঋণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বন্দীদশার মাঝে পতিত হয়। আরো অধিক দুঃখজনক ব্যাপার হলো স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও লোভ-লালসার শিকার হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের নামে অপচয়, চালবাজি, অনুৎপাদনশীল খাত, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, খেলাধূলার নামে বাড়াবাড়ি, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি, অস্ত্র ও বিলাসী পণ্য ও মেশিন আমদানী, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী লালন-পালন ইত্যাদি আত্মহননকারী কর্মকান্ডে খয়রাতি ও ঋণের অর্থ ব্যয় করে। তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক বলেছিলেন বর্তমান মুসলিমের জর‍ুরী প্রয়োজন বাদে অন্য কোন খাতে খরচ করা উচিৎ নয় কারণ বর্তমান অর্থ সম্পদের সাথে মিশে আছে খয়রাতি (যা শুধু মিসকিনের হক) সুদী-ঋণ এমনকি বেশ্যাদের (উপার্জিত হারাম অর্থের উপর) ট্যাক্সের অর্থ। এক কথায় হারাম সম্পদ হালাল সম্পদের সাথে মিশে গিয়ে পুরো সম্পদকেই হারাম করে দিয়েছে যা জর‍ুরী প্রয়োজন বাদে ভোগ করার সুযোগ কোন মুসলিমের নেই।

পশ্চিমা বিশ্বের ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং এবং দুনিয়ার অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে থাকা লুণ্ঠনকারী ধনী ও সম্পদশালী মহল অতি কৌশলে সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের সম্পদ ও রক্ত শোষণ করে চলেছে। রিবা কি? রিবার ধরণ কি? সাধারণ মানুষ থেকে শুর‍ু করে

সকল শ্রমজীবী মানুষকে দারিদ্র ও বন্দীদশার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ যে রিবা এবং এই বন্দী দশা হতে মুক্তির জন্য মুসলিমের কি করণীয় তা নিয়ে ভাবতে হবে। রিবা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনে শরীক হওয়ার লক্ষ্যে ইমরান নযর হোসেন এর The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah বইটি পড়ার পূর্বেই বইটি অনুবাদের জন্য লেখক এর এক বন্ধুর সাথে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হই।

এ গ্রন্থ ক্রমবর্ধমান ফেৎনা ফ্যাসাদ চিহ্নিত করে বিকৃত ও বিপর্যস্ত অর্থব্যবস্থা নিয়ে সচেতন মানুষের জন্য চিন্তা গবেষণা করে রিবা মুক্ত সমাজ গঠন করার উপায় উপকরণ জোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠক বান্ধব (reader-friendly) করার লক্ষ্যে আমরা শাব্দিক তরজামা (অনুবাদ) না করে বইটির ভাবানুবাদ করার যথাযথ চেষ্টা করেছি। আমেরিকার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত কোন কোন বিষয় এবং আরো কিছু জটিল আলোচনা পরিস্কারভাবে বোঝানোর জন্য বিষয়বস্তু অবিকৃত রেখে বইয়ের কোন কোন স্থানে ফুটনোট সংযোজন করা হয়েছে। বইয়ের প্রতিটি বিষয়ই কুর'আন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বিকৃত অর্থ ব্যবস্থার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও যুক্তিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মুক্ত মনে বইটি পড়ে কুর'আন ও হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে আমাদের নিবেদন রইলো। গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়াদি এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে অনুবাদকগণের জ্ঞান সীমিত তাই সম্মানিত পাঠক গবেষক মহলের সত্যনির্ভর সমালোচনা প্রত্যাশা করছি। গ্রন্থটি পড়ে বর্তমানে প্রচলিত রিবাভিত্তিক বিপর্যস্ত অর্থব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলি চিহ্নিত করে রিবা বর্জনে উদ্বুদ্ধ হলে, আলহামদুলিল্লাহ্ (নিখিল ভূবনের যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য)। জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত (মুক্তি) প্রত্যাশী আমরা ক'জন আপনাদের দু'আ কামনা করি। আর এই বই পড়ে যদি মনে কোন প্রশ্ন জাগে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। উপস্থাপিত তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয় কুর'আন এবং সহীহ হাদীসের দলিলসহ (সূরা নম্বর, আয়াত নম্বর, কোন্ হাদীস, হাদীসের নম্বর, প্রকাশকের নাম ইত্যাদি) আমাদেরকে লিখে জানালে আমরা উপকৃত হব, ইনশাআল্লাহ্। হে আমাদের রব! এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ ও প্রকাশনায় অর্থ সহায়তা দান, প্রুফ রিডিং এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অন্য যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের এবং আমাদের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা আপনি কবুল করে নিন। আমাদের প্রত্যেককে রিবা সহ ইসলামে অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়ন করে সঠিক জ্ঞান অর্জনের তওফিক দিন। আর সে অর্জিত জ্ঞান পুরোপুরি 'আমল করার মন মানসিকতা ও পরিবেশ আপনি সৃষ্টি করে দিন। আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ কল্যাণ আপনি আমাদেরকে দান করুন। হে আমাদের রব! এই প্রচেষ্টায় আমাদের কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমাদেরকে আপনি মাফ করে দিন। আমীন।

মাকসুদা বেগম ও ফারজানা ইশরাত

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
জিলহাজ্জা, ১৪২৭ হিজরী,
জানুয়ারী, ২০০৭ খৃস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

অপ্রতিরোধ্য গতিতে দরিদ্ররা যখন হতে থাকে আরো দরিদ্র, আর ধনবানরা হতে থাকে আরো ধনী, সেটাই হলো আর্থ-সামাজিক নির্যাতন। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক নিপীড়নে নিমজ্জিত আজকের দুনিয়া। এই নিপীড়ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মুসলিম উম্মাহ কুর'আনের আইনকে উপেক্ষা করে মানব রচিত আইন বিধানে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বিচারকার্য তথা সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের জীবন ধারার সংস্পর্শে এসে নিজেদের ঈমান-আকিদা ধ্বংস করে চলেছে। ফলে বর্তমান সমাজের মানুষ বিবিধ গোমরাহীর সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে রিবা বা সুদী অর্থ-ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা লুন্ঠনকারী পুঁজীবাদী গোষ্ঠি নিখুঁত প্রতারণার মাধ্যমে রাজনীতি ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা, শিক্ষা, আইন-বিচার ব্যবস্থা, মিডিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে চলেছে। যাতে করে আর্থ-সামাজিক নির্যাতনের সকল কর্মকান্ড নির্বিঘ্নে বাস্ড়বায়ন করা যায়। মানব জাতিকে কল্পরাজ্যে বিচরণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, ভি-সি-আর, ভি-সি-ডি, ইন্টারনেট ওয়েব সাইট, ভিডিও গেইম, চিত্র জগত, সঙ্গীত শিল্প, খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ভোগ-বিলাসী পণ্যকে কাজে লাগানো হচ্ছে। যেন তারা ভোগ-বিলাসিতা, অসার কাজ, অজ্ঞতা ও অবলুপ্ত চেতনার মাঝে জীবন যাপন করতে পারে। তারা যেন জানতে না পারে বা জানার চেষ্টাই না করতে পারে যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং দাসত্বের শৃংখলে আটকে রাখার জন্য রিবাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধ্বংসাত্মক এই রিবার কারণে বিত্তহীনরা হয়ে চলেছে আরো বিত্তহীন। অপরদিকে পুঁজিবাদী বিত্তবানরা গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়। বিশ্বের অন্যতম লুন্ঠনকারীরা সংঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভুত হয়ে পাশ্চাত্য নামক কুফ্‌র রাজ্যে সাধু মহাজন সেজে আস্ড়না গেড়েছে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও বিরাজমান লুন্ঠনকারী ধনী ও বিত্তশালী শ্রেণী প্রতিনিয়ত অসহায় সাধারণ মানুষের অক্লান্ড় শ্রমলব্ধ সম্পদটুকু প্রতারণা ও অত্যাচারের অন্যতম হাতিয়ার রিবার মাধ্যমে শুষে নিচ্ছে। এই লুটেরা দলের মূল উদ্দেশ্য হলো বহুমুখী উন্নয়নের মিথ্যা বুলি ছড়িয়ে কুটকৌশলে মানুষকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিয়ে বিশ্ব মানবতাকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। যাতে করে এই ক্রীতদাসরা প্রভুদের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারে ।

প্রচলিত ভাবধারা অনুযায়ী রিবা বলতে যা বুঝায় তা হলো নীতি-বিবর্জিত উপায়ে উচ্চহারে মুনাফা (profit) আদায়ের বিনিময়ে ঋণদান। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন স্বার্থ বা লাভের বিপরীতে ঋণদানের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ঝুঁকিতে মূলধন ও সম্পদ বাড়ানোর ব্যবস্থাই হলো রিবা বা সুদ, সেই লাভ কম হোক আর বেশী। যখন রিবা বা সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দেয়া হয় তখন অর্থ নিজেই কোন শ্রম, প্রচেষ্টা এবং

ঝুঁকির সম্ভাবনা ছাড়াই শুধু সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বেড়ে যাওয়া অর্থ অর্জিত হয় অপরের শ্রম, পণ্য ও মাল সম্পদ শোষণের মাধ্যমে। শ্রম, পণ্য ও সম্পদের এই শোষণ নিহিত থাকে এগুলির মূল্য হ্রাসের মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (১১:৮৫, ২৬:১৮৩)[১]।

বিভিন্ন প্রতারণা ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে সম্পদ হাতিয়ে নেয়াও এক ধরনের রিবা। যেমন কাগজি মুদ্রা , প্লাস্টিক ও ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন, ফাটকা ব্যবসা ও অনুমান নির্ভর ব্যবসায়িক লেনদেন, ওজনে ও মাপে কম দেয়া কিন্তু নেয়ার সময় বেশী নেয়া ইত্যাদি সকল কর্মকান্ডই রিবা। তাকিয়ে দেখুন বর্তমানে কতভাগ ব্যবসা হালাল পদ্ধতিতে চলছে? প্রতারণা, ফাটকাবাজী, মাপে ওজনে কমবেশী আদান প্রদান ছাড়া কোন ব্যবসার অস্তিত্ব আছে কি?[২]

১ এবার ভেবে দেখুন বর্তমানের ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে জড়িত হয়ে শ্রম ও ঝুঁকি ব্যাতিরেকে মূলধনের চেয়ে বাড়তি যে অর্থ একাউন্টে জমা হয় তা হালাল কিনা। আসলে বাড়তি কিছু আদায় করতে বা পেতে হলে অবশ্যই তা হওয়া চাই শ্রম, সম্পদ বা অন্য কোন সামগ্রী অথবা লাভ লোকসানের ঝুঁকির বিনিময়ে। কেননা সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন:

মানুষের জন্য কিছুই নেই সেটা ব্যতীত যার জন্য সে চেষ্টা করে। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩:৩৯)।]

আল-কুর'আনের এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম ছাড়া মানুষ কিছুই পেতে পারেনা। আর যা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করে, মানুষ তা-ই পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা এ নিয়ম মানে না, তাদের শোষণের কারণে শ্রমলব্ধ পণ্যের মূল্য বা পরিমাণ কমতে থাকে। মনে রাখতে হবে, রিবা ভিত্তিক অর্থনীতিরই অপর নাম পুঁজিবাদ। তাই পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে যার পুঁজি আছে, চেষ্টা ও লোকসানের ঝুঁকি ছাড়াই তার অর্থসম্পদ একতরফাভাবে ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এই পদ্ধতিতে সম্পদের হস্তান্তর হয়না। তাই ধনবানরা ক্রমান্বয়ে আরও ধনী হতে থাকে আর দরিদ্ররা হতে থাকে নিঃস্ব ও কাঙাল।

২ এ সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন:

তোমরা মাপ ও ওজনের কাজকে ইন্‌সাফের সাথে সম্পন্ন করবে। মানুষকে কখনও তাদের প্রাপ্য থেকে কম দেবে না। আর (মাপে ও ওজনে তারতম্য করে) যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়োনা। (সূরা হুদ, ১১:৮৫)।

লোকদেরকে তাদের পাওনা কখনও কম দেবে না এবং দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। (সূরা শু'আরা, ২৬:১৮৩)।

ইনসাফের সাথে (ওজনের) মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনে কম দিয়ে মানদন্ডের ক্ষতিসাধন করো না। (সূরা রহমান, ৫৫: ৯)।

ধ্বংস ঠকবাজদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা অন্য লোকদের থেকে যখন মেপে নেয় তখন তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি নেয়। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় তখন কম দেয়। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩:১৩)।

ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা নিষেধ করে রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার থাকবে, যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয় বিক্রয়ে বরকত চলে যাবে।* (সহীহ বুখারী ৪:১৯৪৭, পৃ:২৫, ইফাবা)।

আল্লাহ তা'আলা রিবাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করা সত্ত্বেও সারা বিশ্ব এমনকি মুসলিমরাও আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে হারাম ঘোষিত ধ্বংসাত্মক এই রিবার মাঝে। আর তাই রসুলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যতবাণী আজ দিবালোকের মত বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:[১]

মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন একটি মানুষও রিবা হতে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি রিবা না খেলেও রিবার ধোঁয়া বা ধুলিকণা অবশ্যই তাকে স্পর্শ করবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌নে মাজাহ্‌, মিশকাত ৬:২৬৯৪)।

আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় অপর একটি হাদিসে রসুল (স) বলেছেন:
মানুষের উপর এমন যুগ অবশ্যই আসবে যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে মাল-সম্পদ অর্জন করছে, হালাল নাকি হারাম উৎস থেকে। (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৪৮)
আমরা সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি যখন মানুষ শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনটাকে উপভোগ করার জন্যই হালাল হারাম যে কোন উপায়েই হোক জীবিকার তালাশে চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আখিরাতের পরম ও চিরস্থায়ী নি'আমত (উপকরণ) তারা চায় না বলেই অবস্থাদৃষ্টে প্রমাণিত হয়। এসব দুনিয়াভোগী লোকদের সাবধান করে বহু আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করেছেন:
আর যা কিছু তোমাদের দেয়া হয়েছে, তা হলো দুনিয়ার জীবনের ভোগের সামগ্রী মাত্র। কিন্তু আল্লাহর কাছে (আখিরাতের জন্য) যা আছে তা-ই উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তবুও কি তোমরা আক্‌ল-বুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা কাসাস, ২৮:৬০)।
নিশ্চয়ই যারা আখিরাতের (পরকাল) উপর ঈমান আনে না (না দেখে বিশ্বাস করে না) তাদের জন্য তাদের কর্মকান্ড সমূহকে আমরা শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা আপন কর্মকান্ডের চারপাশে উদ্ভ্রান্তের (পাগলের) মত ঘুরে বেড়ায়। (সূরা নাম্‌ল, ২৭: ৪)।
(শোন) হে মানুষেরা (আখিরাত বিষয়ে) আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের ধোঁকা না দিতে পারে এবং ধোঁকা না দিতে পারে ধোঁকাবাজ শয়তান। নিশ্চয়ই শয়তান হলো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই মনে করবে। সে তার দলবলদের ডাকতে থাকে যেন তারা সকলেই জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যায়। (সূরা ফাতির, ৩৫:৫-৬)।
তারাই সে সকল লোক যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে কিনে নিয়েছে। ফলে না তাদের আযাব কমিয়ে দেয়া হবে এবং না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (সূরা বাকারা, ২:৮৬)।
আর যে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, নিশ্চয়ই জাহান্নামই হবে তার স্থায়ী ঠিকানা। (সূরা নাযি'আত, ৭৯:৩৮-৩৯)।
আরো দেখুন ১০:৭-৮, ৩:১৪, ৬:৩২, ৯:৬৯, ১০:২৪, ১৬:১০৭, ৭:৫১, ২৬:৮৮।
কুর'আনে আরও বহু আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ার ভোগ ও বিলাসিতা ছেড়ে আখিরাতে সফলতা অর্জন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষতো আজ কুর'আন অধ্যয়ন করেনা, কারণ কুর'আনের শিক্ষা তাদের প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করে না। তাদের প্রয়োজন দেশী বিদেশী কাগুজে ডিগ্রী যা দিয়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নেয়া যায়। সে কারণে কুর'আনের শিক্ষা চলে গেছে আজ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
এ নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের কি কিছুই করার নেই? হ্যাঁ আছে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের মাঝে দাওয়াহ্‌ বা উপদেশ দানের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন:
তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাক। (সূরা গাশিয়া, ৮৮:২১)।
তুমি বোঝাতে থাক, এ উপদেশ মু'মিনদের কাজে আসবে। (সূরা যারীয়াত, ৫১:৫৫)।
উপদেশের ব্যাপারে আরো কঠোর হয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:
অতএব এই কুর'আনের আয়াত দিয়ে তাকে বোঝাতে থাক যে আমার আযাবকে ভয় করে। (সূরা কাফ, ৫০:৪৫)।
আমরা কুর'আনের আয়াত এবং রসুলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্‌র সাহায্যে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি *যারা মু'মিন তারা উপকৃত হবে।* (৫১:৫৫) ইনশাআল্লাহ।
সূরা মা'উনে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের বর্ণনা করেছেন। যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা পরিচয়ে মুসলিম হলেও তাদের চরিত্রে ধোঁকা, প্রতারণা, দরিদ্র জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ, লোক দেখানো ইবাদত ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটিগুলি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর এ সকল কাফির মুনাফিকদের কারণেই আজকের দুনিয়ায় ফেৎনা ফ্যাসাদের এতটা বিস্তৃতি ঘটেছে। কুর'আন এ সকল কাফির মুনাফিকদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে (১০৭:১-৭)।

ভয়ংকর এই ফেৎনার যুগে আমাদের কি করা উচিত?

মূলত একজন মু'মিন নিজেকে এবং পরিবারকে রিবা থেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে শুধু তা-ই নয়, বরং কুর'আন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ ও সংশোধন করে একজন মু'মিন সমাজ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে রিবার বিষাক্ত ছোবল থেকে উদ্ধার করার অবিরাম চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। প্রতিটি মু'মিন নিজেদের গরীব আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন এবং সমাজের অন্যান্য অসহায় মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি তথা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিরূপণ করবে। আর সে সকল চাহিদা পূরণে যাকাত, সাদাকা, কর্‌যে হাসানা ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা দান করবে, এবং ব্যক্তিগত ভাবে, প্রয়োজনে সামাজিক ভাবে, চেষ্টা চালিয়ে যাবে যতদিন না সমাজের দারিদ্র দূর হয়। আর্থিক সহায়তা দান করে এবং হাদিস ও কুর'আনের আলোকে কথা বলা ও লিখার মাধ্যমে এ চেষ্টা-সংগ্রাম ছড়িয়ে দিতে হবে ব্যক্তি থেকে দলে, দল থেকে সমাজ ও জাতিতে। আইন-বিধান দাতা তাগুতি সমাজকে সমূলে ধ্বংস করার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অজ্ঞতা ও গোমরাহিতে ঘুমিয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহ্‌র আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রচেষ্টা হতে পারে। রিবার ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে উদ্ধারের জন্য যে সংগ্রাম, সে সংগ্রাম হবে সমুদয় দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে, শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র আইন-বিধাক্ষে প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আর মানব রচিত তাগুতি আইন-বিধানের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মু'মিনের এই চেতনাই রিবা নির্মূলের অন্যতম হাতিয়ার। যে মু'মিন না জেনে রিবা খাচ্ছেন তাদের প্রয়োজন রিবা বিষয়ে কুর'আন সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জন করে 'রিবা' নির্মুলের নিরলস সংগ্রামে নিজেকে শরিক করা। কেননা অজ্ঞ থাকার সুযোগ ইসলামে রাখা হয়নি বরং সকলের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকে (তালাশ) ফরয করা হয়েছে। [১]

১ জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দিয়ে আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে:

(দুনিয়াতে) বেশী পাওয়ার লোভ তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। এমনি করেই তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে। এমনটি কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কখনো নয়, তোমরা অতি সত্তরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে। (কতো ভাল হতো!) তোমরা যদি সঠিক জ্ঞান কি তা জানতে পারতে, তাহলে বুঝতে যে তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে। অতপর (আল্লাহ তা'আলার দেয়া) নি'আমত সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা তাকাসুর ১০২:১-৮)।

কোন মু'মিন যদি রিবা (সুদ) বর্জন করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে কিংবা আল্লাহর বিধান কায়েমের উদ্দেশ্যে রিবা (সুদ) মুক্ত আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাধ্যমত শরিক না হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় তার ঈমান অন্তঃসারশূন্য যা কুফরী ও মুনাফেকীর ব্যাধিতে আক্রান্ত। ঈমান যেন কুফরীর সাথে মিশে না যেতে পারে সে বিষয়ে আল-কুর'আনে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে: *কেউ যদি ঈমানকে কুফরীর নিয়মের সাথে বদল করে নেয় অবশ্যই সে সঠিক রাস্তা হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।* (সূরা বাকারা, ২:১০৮)। *তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি চাইলে সে শোকর গোজার বান্দা হতে পারে, অন্যথায় কাফির হয়ে যেতে পারে। তবে যারা কুফরীর পথ বেছে নেবে তাদের জন্য আমি শেকল, বেড়ি ও আগুনের লেলিহান শিখা (দিয়ে শাস্তির) ব্যবস্থা করে রেখেছি।* (সূরা দাহ্‌র, ৭৬:৩-৪)।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিধ্বংসী রিবার (সুদের) নির্যাতন থেকে বিশ্বমানবতাকে উদ্ধারকার্যে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার সাথে যথাযথ কর্মপন্থা প্রণয়ন। আর এই

কর্মকান্ড চালাতে হলে রিবার (সুদের) রাজ্য থেকে বের হয়ে মুসলিম কম্যুনিটিতে মু'মিনদের জন্য জামা'আত-বদ্ধ জীবন গড়ার উদ্যোগের প্রয়োজন। এই মুসলিম কম্যুনিটির আমীর হবেন একজন সুশিক্ষিত এবং নেতৃত্বদানে পারদর্শী দক্ষ আমীর। মু'মিনগণও এই আমীরের আনুগত্য ও সহায়তাদানের বাইয়্যাত (লিখিত ওয়াদা) নিয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অতপর সকলেই সেই জামা'আতের নিয়ম-বিধান মেনে চলবেন। আমাদের ধারণায় রিবার (সুদের) ধুঁয়া বা বাষ্প গ্রহণ থেকে আত্মরক্ষা করে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার বিকল্প আর সকল পথ আজ বন্ধ। পক্ষান্তরে খোলা আছে রিবা বা সুদের রাজ্যে বিচরণের অবাধ সুযোগ।

রিবা (সুদ)-ভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদরা শুধু যে চিরস্থায়ী ধনশালী হয়ে তুষ্ট থাকবে তা নয়, বরং তাদের অদম্য লোভ ও হিংসার দহনে অন্যের সম্পদ শুষে নেয়া অব্যাহত রাখবে। লোকসানের ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগ পদ্ধতি ছড়িয়ে দিয়ে লুটেরা পুঁজিবাদ সম্প্রদায় পরের সম্পদ আহরণের অদম্য লোভকে চিরজাগ্রত করে রাখবে। *ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগ (risk-free investment) গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের আইন অনুমোদিত চুরি*। পুঁজিবাদী গোষ্ঠি বাদে অন্য সকল মানুষের সম্পদের ছিঁটে-ফোটা অস্তিত্ব যতদিন আছে, ততদিন এই চুরি চলতে থাকবে। অত্যাচারী এই লুটেরা গোষ্ঠি চায় দরিদ্র-বিত্তহীনদের নিঃস্ব করে সকল সম্পদের অধিকারী হতে। রসুল (স) বলেছেন: *দরিদ্র-নিঃস্ব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরীর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়*। তাই রসুলুল্লাহ্ (স) সালাহ্ (নামায) শেষে কুফ্‌র ও ফাক্‌র (দারিদ্র) থেকে পানাহ্ চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন। (সুনান নাসাঈ, ২:১৩৫০ পৃ ২৫১, ইফাবা)।

রিবা ভিত্তিক পুঁজিবাদ বিস্তারের ফলে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব দরিদ্র ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রিবার (সুদী) রাজ্য বিস্তারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শয়তানের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রেখে গোটা মানবজাতিকে শিরক, কুফর, নিফাক (মুনাফেকী) এমনকি নাস্তিকতায় নিমজ্জিত রাখা।

আজ একথা বলতে কোনই দ্বিধা নেই যে, রিবা (সুদ) বর্জনে সময়োপযোগী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে দারিদ্রের কবলে পড়ে অচিরেই বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম হয়তো ঈমানহারা কাফিরে পরিণত হবে (নাউযুবিল্লাহ), তবে আল্লাহ্ তা'আলাই এ বিষয়ে ভাল জানেন। পৈশাচিক অপশক্তির কারণে যে সকল মানুষ অত্যাচার-নিপীড়নের নির্মম শিকার, তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসা বর্তমানে প্রতিটি মুসলিমের দ্বীনি দায়িত্ব। আমরা কি জানি অত্যাচারীদের দোসর কারা? এরাই তারা যাদের কাছে রয়েছে তথ্য সাম্রাজ্যের (Media World) একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। তারা দারিদ্র বিমোচনের নামে মানবতার মুক্তির ধুঁয়া তুলে রিবার (সুদী) রাজ্য বিস্তার করেছে। আর দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি মানুষকে সুদখোর বানিয়ে আল্লাহ ও রসুল (স)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রেখেছে। আল্লাহ ও রসুল (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক বানিয়ে (২:২৭৯) বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছে। এরাই তারা যারা হীন চক্রান্ত ও চরম অত্যাচার

করে অশিক্ষা, কুশিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। আর সত্য সঠিক দ্বীন, ইসলামকে উগ্রবাদ, মৌলবাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছে।

যখন অত্যাচারিত শোষিত এবং বঞ্চিতদের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলাম একটি স্বাধীনতাকামী শক্তিরূপে ভূমিকা পালন করতে যায় তখনই তা অস্বাভাবিক তীব্র পৈশাচিকতার সম্মুখীন হয়। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। প্রচারযন্ত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলি (Media) তাদেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যারা রিবার প্রবর্তন করেছে এবং তা টিকিয়ে রেখেছে। যারা নিজেরাই মানবজাতিকে শোষণ করছে! এরাই দ্বীন ইসলামকে মৌলবাদ আখ্যা দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইসলামের একটি বিকৃত শক্তি ব্যাংক ইন্টারেষ্টকে সুদ বা রিবা হিসেবে চিহ্নিত করে না। তাই তারা শোষক শ্রেণীর প্রতি হুমকি তো নয়ই বরং এমন সকল বিষয় প্রচার মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলে সত্যকে বিকৃত করে সত্যিকার বিধান বলে প্রচার করে বেড়ায় যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

যদি এই বিকৃত চরিত্রের লোকগুলি রিবার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ চালিয়ে যেতে থাকে তবে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার চেয়েও মারাত্মক যে অঘটন ঘটাবে তা হলো মানবজাতিকে ক্রীতদাসে রূপান্তর করা। এ দাসত্ব থাকবে সাধারণ মানুষের বোধশক্তির বাইরে (invisible slavery)। যখন প্রকৃত ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল তখনকার মনিবগণ তাদেরকে ইচ্ছেমত খাটাতো ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে তাদের থাকা খাওয়ার কিছুটা হলেও ব্যবস্থা করতো। কিন্তু বর্তমান invisible দাসত্ব প্রথা আরো জঘন্য, কারণ এই প্রথায় মনিবরা তাদের দাসদের ইচ্ছেমত খাটিয়ে নেয় ঠিকই, কিন্তু ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দাসদেরকে নিজেদেরই ঘাড়ে তুলে নিতে হয়।

রিবা (সুদ) বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে ঠান্ডা লড়াই করে চলেছে। অথচ এই লড়াইয়ের ক্ষয়ক্ষতি অধিকাংশ মানুষের কাছে সরাসরি দৃশ্যমান হয় না। সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে: *ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের যে রিবা (সুদ) লোকদের কাছে পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা তা না করো (সুদ না ছাড়) তাহলে শোন, আল্লাহ্ ও রসুল (স)-এর পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করা হলো*। (সূরা বাকারা, ২:২৭৮-২৭৯)।

কুর'আনে আরো যেসব বিষয় হারাম ঘোষণা হয়েছে রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণের ভাষা সবচেয়ে কঠোর। আল্লাহ্ তা'আলার সে সকল কঠোর নিষেধবাণী উপেক্ষা করে সুদ খাওয়া অব্যাহত থাকলে, লুন্ঠনকারী পুঁজিবাদীদের কাছে চিরদাসত্ববরণ তো শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। দাসত্ববরণের সাথে সাথে সম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শক্তি, মনোবল সবই তুলে দিতে হবে পুঁজিবাদ অত্যাচারী দাজ্জাল শক্তির হাতে। এই দাজ্জালরা তখন মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিমের ঈমান-আমল ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নেবে।

ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্ব দাজ্জালরূপী ইহুদি-খ্রীষ্টানদের হাতে সকল ক্ষমতা সঁপে দিয়ে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে গেছে বলে মন্ড্ব্য করতে পারেন অনেকেই। কিন্তু আমাদের ধারণায়, আমাদের মাঝে উলে□খযোগ্য সংখ্যক মুসলিমের শক্তি-ক্ষমতা ও ঈমান এখনো ফুরিয়ে যায়নি আলহামদুলিল□াহ্! যেটুকু শক্তি-ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে সেটুকু নিঃশেষের অপেক্ষায় না থেকে রিবা ও রিবাখোরদিগকে বয়কট করার আন্দোলনে শরিক হওয়া এখন প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য (ফরয)।

এ গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে রিবা বিষয়ক ব্যাখ্যাদান এবং রিবা বা সুদী অর্থনীতির ধারক-বাহকদের চিহ্নিত করে তাদের কুটকৌশল ও অপকর্ম বিস্ড়্রের বর্ণনা দেয়া। আর ঈমান বিধ্বংসী যুদ্ধের অবশিষ্ট চিত্র তুলে ধরে ঘুমন্ড় মুসলিম বিশ্বকে সাইরেণ বাজিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করা। কারণ রিবা (সুদ) খাওয়ার ব্যাপারে রসুল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্ড়্বে পরিণত হয়ে সুদের ধুঁয়া সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছে। রসুল (স) অত্যন্ড় পরিস্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ও ঈমান আকিদা ধ্বংসের অন্যতম কারণ হবে রিবা ভক্ষণ ও সর্বস্ড়্রে রিবার ব্যবহার। আর আল□াহ্ তা'আলা রিবা নিষিদ্ধকরণের (হারাম) বিষয়কে সর্বশেষ ওয়াহী (প্রত্যাদেশ) হিসাবে বেছে নিয়েছেন।[১]

রিবার (সুদের) ভয়াবহতার এমন ব্যাপ্তি ঘটেছে যে রসুল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যে শুধু বাস্তবে পরিণত হয়েছে তা নয়, আমাদেরই জীবদ্দশায় দেখতে পাচ্ছি কিভাবে রিবা বা সুদের ধ্বংসাত্মক ছোবল বিশ্ববাসীকে নিঃস্ব কাঙাল করে দিচ্ছে। এই সুদের ভয়াবহতা বিস্ড়্তি পাচ্ছে গত প্রায় আশি নব্বই বছর ধরে, বিশেষকরে অটোম্যান খিলাফাহ্ (তুরস্কে অবস্থিত ওসমানিয়া খিলাফত) বিলুপ্তির পর থেকে। ১৯২৪ সালে অটোম্যান খিলাফাহ্র পতন ঘটে। পুঁজিবাদী ইউরোপ ১৯২৪ সাল পর্যন্ড় ইসলামের কয়েকটি ইস্যু বাদে অন্য কোন সেক্টরে প্রবেশের সুযোগ করে নিতে পারেনি। ঘটনা প্রবাহ শুর্ু হয় অটোম্যান

১ যাতে করে হয় মানুষ সুদী কর্মকান্ড ছেড়ে দিবে নয়তো আল□াহ্ ও রসুল (স)-এর বির্ুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে নিঃস্ব সর্বহারা হয়ে শূণ্য হাতে কবরে গিয়ে অনন্ড়কাল জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে। সুদী কর্মকান্ডে জড়িয়ে মুসলিমগণ যে শুধু আখিরাতের পরম স্বাচ্ছন্দময় অনন্ড় সুখ-ভোগের সম্ভাবনা হারাচ্ছে তা-ই নয়, বরং রিবার মত হারাম ভক্ষণের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠি জগতের সর্বাধিক নির্যাতিত, অত্যাচারিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে চলেছে। কোন কোন মুসলিম শুধু যে রিবা ভক্ষণ করে তা–ই নয় বরং শিরক্ কুফর ও বিদ'আত শ্রেণীর কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে সর্বশক্তিমান আল□াহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে পড়ছে, আর আল□াহ্র সকল আইন-বিধানে শিথিলতা এনে এবং আল□াহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে তাঁর ক্রোধে নিপতিত হয়ে চলেছে। তাই বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলিম, ইহুদি-নাসারা তথা আল□াহ্র শত্র্ুদের কর্ুণাপ্রার্থী হয়ে তাদের উচ্ছিষ্টভোগী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। আল□াহ্র আইন-বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে: *আল□াহ্ তা'আলা যে আইন-বিধান নাযিল করেছেন তার ভিত্তিতেই তুমি বিচার-ফায়সালা করো, আর তোমার নিজের কাছে যা সত্য দ্বীন এসেছে, তার থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের জন্য শারি'আহ্ ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি*। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৪৮)।

খলিফার তৎকালীন সময়ে ইউরোপ থেকে অর্থঋণ নেয়ার পর থেকে। এই ঋণ গ্রহণের পরিণতি এতদুর গড়িয়েছিল যে ১৮৫৭ সালে তিনি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিং-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। যার ফলশ্রুতিতে ঋণ এবং ঋণের সুদ মওকুফ পাওয়ার জন্য অটোম্যান সাম্রাজ্যের সকল স্থানে জিযিয়া কর এবং *আহলুয- যিম্মাহ* অবলুপ্ত করে দিতে বাধ্য হন। এই চক্রান্ত হলো অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সকল চক্রান্তমূলক কর্মকান্ড বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। যা মুসলিম জাতি বুঝতে পারছেনা, বোঝার চেষ্টাও করছে না।[১]

১৯২৪ সালের পর থেকে মুসলিম জাহানের প্রতিটি স্তরের আর্থিক লেনদেনে রিবা (সুদ) ঢুকে পড়ে এবং রিবার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে অবাধ ও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যায়। অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-বিধান, বিচার-ফায়সালা, সামাজিক নিয়ম কানুন ইত্যাদি সকল পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে কুর'আন-সুন্নাহ্‌র (হাদীসের) বিধি-বিধানের স্থান দখল করে নেয় শির্‌ক ও কুফ্‌রে ভরপুর ভোগবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপীয় আইন-বিধান (নাউযু বিল্লাহ্‌)।

আমরা কুর'আন সুন্নাহ্‌ থেকে সত্য সন্ধানে যদি সচেষ্ট হতে চাই তাহলে, কুর'আন-সুন্নাহ্‌য় রিবা (সুদ) হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে। যে কোন উপায়ে লোভ, ভোগ-বিলাসিতার ধারাকে প্রতিরোধ করে সততা ও কঠোর সবরের মাধ্যমে আমরা যদি রিবার বয়কটকে অব্যাহত রাখতে পারি, তাহলে রিবার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে ঈমান ও মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে আত্মরক্ষা

১ সুদীর্ঘ সাতশত বছর শাসন পরিচালনার পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে কুর'আন সুন্নাহ্‌র শিক্ষা উপেক্ষা করে চলে। যথাযথ দায়িত্ব পালনে মুসলিম শাসকদের চরম অবহেলার সুযোগ নিয়ে দজ্জালের দল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে দেয়। দাজ্জালরূপী ইহুদি-নাসারা একমাত্র প্রতিপক্ষ মুসলিম উম্মাহ্‌র ক্ষতিসাধনে এমন কোন হীনপন্থা ছিলনা যা তারা অবলম্বন করেনি। এদের এই হীন চরিত্রের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন:

হে লোকসকল, তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের নিজ দলের লোক ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। কারণ, তোমাদের ক্ষতিসাধনের কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করবে না, তারা তো শুধু তোমাদের অকল্যাণই কামনা করে। তাদের মনে লুকানো প্রতিহিংসা তাদের মুখ থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য, তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা আরো তীব্র ভয়ংকর। আমরা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বর্ণনা করে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে সতর্ক হয়ে যাও। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১৮)।

আল্লাহ্‌ তা'আলার এই সতর্কবাণী সত্বেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ দাজ্জালদের প্রতারণার ফাঁদে আটকে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে আগ্রাসনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত রিবার (সুদী কর্মকান্ডের) ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে বিশ্ব মানবতা আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। তাই আর ঘুমিয়ে থাকার মোটেও সময় নেই। গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে হবে মুসলিম উম্মাহ্‌কে। প্রতিটি মুসলিমকে রুখে দাঁড়াতে হবে রিবাসহ অন্যান্য গোমরাহী ও আল্লাহ্‌-বিরোধী প্রতিটি বিধি-বিধান ও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রিবা (সুদ) বর্জন করে, প্রতারণা ও উন্নয়নের ভুয়া শ্লোগানের মাধ্যমে মুসলিমের সম্পদ লুটতরাজের ধারাকে প্রতিহত করতে হবে।

করা আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব। লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের নবী (স) কী আমাদেরকে সাতটি কবিরা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করে যান নি?

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে তোমরা দুরে থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্‌র রসুল (স) সে সাতটি বিষয় কি? তিনি বললেন: ১ আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাউকে শরিক করা, ২ যাদুবিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, ৩ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪ রিবা ভক্ষণ (সুদ খাওয়া), ৫ ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করা, ৬ জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭ মু'মিন মহিলাকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দেয়া। (সহীহ বুখারী, ৫:২৫৭৫)।

আজ আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করছি যেখানে (জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতার অবসান হয়েছে মনে করা সত্বেও) রিবা পুনরায় আঘাত হেনেছে। আর মানব জাতির উপর চালাচ্ছে শোষণ ও নির্যাতন। এই শোষণ নির্যাতন প্রতিনিয়ত চরম থেকে চরমতম রূপ ধারণ করছে। ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত কুর'আনিক আঙ্গিকে লিখা এই বই যে বিপদ সংকেত দিচ্ছে তা হল আগামী পঁচিশ বছরে লুণ্ঠনকারী ধনীদের হাতে সমগ্র মানবতা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি।

এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে দেখানো হয়েছে যে একমাত্র ইসলামই আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীন। তাই শুধুমাত্র ইসলামই রিবার কারণে উদ্ভাবিত সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। একমাত্র ইসলামই দারিদ্র, নিপীড়ন, অত্যাচার ইত্যাদি থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদানে একচ্ছত্র অধিকারী।

রিবাযুক্ত (সুদী) অর্থ ব্যবস্থার কারণে শুধু মুসলিমরা নয় ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলেই আজ অতিষ্ঠ। তাই সারা বিশ্বের মানুষ রিবা বর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায়। এমনকি উত্তর আমেরিকার আফ্রিকানরা এগিয়ে এসেছিল রিবা নিষিদ্ধকরণ ও রিবা বর্জনের দাবী নিয়ে, কারণ এরা চরম বৈষম্য ও আর্থ-সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে দুর্বিসহ জীবন যাপন করে আসছে। ভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধির দর্শন অনুকরণে এই নির্যাতিত জনতাকে নিয়ে লং মার্চে নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৬৩ সালে, ডক্টর মার্টিন লুথার কিং চলে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন ডি-সি পর্যন্ড়।[র] ম্যালকম এক্স (Malcolm X)-ও ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন কিন্তু সে দিনকার লংমার্চে তিনি যোগ দেননি। নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন জোরালো কণ্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন মার্টিন লুথার কিং। অর্থনৈতিক নির্যাতন ও অত্যাচার নির্মূলে সহিংসতাবিহীন (নন-ভায়োলেন্ট) আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সময় বয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে কিন্তু ডক্টর মার্টিন লুথার কিং-এর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আর আফ্রিকান-আমেরিকানদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলে।

এমনি সময় অদৃশ্য-অশুভ শক্তির চক্রান্ড়ে নিহত হন মার্টিন লুথার কিং। আরো নিহত হন Malcolm X। অতপর নর্থ আমেরিকার আফ্রিকানদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন যে

শুধু চরমে পৌছে যায় তা-ই নয়, বরং এই অত্যাচারের বির"দ্ধে তাদের র"খে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও হয়ে পড়ে দুর্বলতর। বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতার যে সামগ্রিক ধ্বস নেমেছে তা নির্দেশ করছে যে সংঘবদ্ধ শোষক গোষ্ঠির নির্মম অত্যাচারের কারণে আজ শোষিতরা প্রতিবাদ করার আভ্যন্ড়রিন অনুভূতি এবং শারিরীক শক্তি দু'টোই হারিয়ে ফেলেছে। তারা যে শোষিত হচ্ছে এই বুঝটুকুই তাদের মাঝে আর অবশিষ্ট নেই!

১৯৭০ সালে নন-ইউরোপীয়ান জনগণ দলবদ্ধ হয়ে নতুন আন্ড়র্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা New International Economic Order (NIEO) প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় যাতে করে মানবজাতি সততা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাদের এই স্বপ্ন ও পরিকল্পনা একইভাবে ব্যর্থতার রূপ ধারন করে। একে একে সকল জোরালো বক্তব্য ও আন্দোলন ব্যর্থ হয় কিন্তু দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে রিবাযুক্ত বা সুদী অর্থনীতি। ফলে পুঁজিবাদের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্ব হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ধনবানরা দরিদ্রদের সম্পদটুকু ছিনিয়ে নিয়ে মহাজন হয়ে বসে। অন্যদিকে বিশ্বের দরিদ্ররা ঋণের ভার বহন করতে করতে লুণ্ঠনকারী, পুঁজিবাদী ঋণদাতাদের ঋণের কারাগারে আবদ্ধ হয়।

বহুবার লক্ষকোটি জনতা আন্দোলনমুখর হয়ে রাস্ড়য় নেমেছে, সভা, সমিতি ও সেমিনার মঞ্চে আগুনঝরা বক্তৃতার বুলি ঝরিয়েছে। কিন্তু শক্তিধর পুঁজিবাদ প্রথা নির্মূলের ব্যাপারে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ধ্বংস ও নির্যাতনের হাত থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তি পাওয়াতো দুরের কথা, বিন্দু পরিমাণ নির্যাতন ও ধ্বংসলীলা লাঘব করা সম্ভব হয়নি। তাই সকল আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে এভাবেই প্রমাণ করেছে কুর'আন-সুন্নাহ্ তথা আল্লাহ তা'আলার দ্বীনেই রয়েছে সমগ্র মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও মুক্তি। আর তাই সুদী লেনদেন তথা অর্থনৈতিক নির্যাতন থেকে মুক্তির যত পথই মানুষ খুঁজুক না কেন সকল চেষ্টা-সাধনাই ব্যর্থতার এক একটি জ্বলন্ড় দৃষ্টান্ড় বহন করবে মাত্র। প্রকৃতপক্ষেই শোষিতদের অবস্থার দিনে দিনে অবনতি হয়ে চলেছে। শোষিতদের নেতা লুইস ফারা খান (খড়ঁরং ঋধৎৎধয কযধহ) সহ কোন নেতা দিক নির্দেশনার কোন ধারনাই আঁচ করতে পারেন নি আর্থ-সামাজিক শোষণ নির্যাতন থেকে শোষিতদের মুক্ত করার। এই বই যখন লিখা হচ্ছে শোষিতদের নেতাশ্রেণী দ্বারনা আয়োজিতসেই লক্ষ মানুষের পদযাত্রার প্রথম বার্ষিকী পালিত হচ্ছিল। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। তবে শোষিতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয়নি।

আমাদের ধারনায় অর্থ ব্যবস্থায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল কর্মকান্ড ব্যর্থ হতেই থাকবে যতদিন না মানবজাতি নিজেদের পথ নির্দেশনার জন্য অবিকৃত সেই সত্যের উৎস কুর'আন ও সহীহ হাদীসের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখবে ও নির্ভরশীল হবে। কেননা কেবলমাত্র কুর'আন-হাদীস থেকেই মানুষ রিবা ও অন্য যে কোন অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাধান বিষয়ে সত্য-সঠিক তথ্য জানতে পারবে। এই গ্রন্থ শোষক গোষ্ঠির অত্যাচারের সেই গুপ্ত কৌশল ফাঁস করে দিবে। আর উন্মুক্ত করে দিবে শোষণের সেই শক্তিশালী

অস্ত্রকে যা দিয়ে তারা মানব জাতির গলায় শোষণের রশি আরো খঠোরভাবে বেধে দিতে সক্ষম। অত্যন্ড় পরিতাপের বিষয় যে, শোষিতশ্রেণীর নেতাদের রিবা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নেই বললেই চলে। অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ সহ মানব জীবনের যে কোন সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক জ্ঞানের অবিকৃত উৎস রয়েছে একমাত্র ইসলামে। তাই রিবা বিষয়ক সঠিক তথ্য পেতে হলে সকল মানুষকে অধ্যয়ণ করতে হবে অবিকৃত ও নির্ভুল তথ্যের উৎস কুর'আন এবং আল□াহ তা'আলার সর্বশেষ রসুল মুহামামাদ (স.) এর সহীহ হাদীস (সুন্নাহ)। [১]

রিবা ভিত্তিক অর্থনৈতিক নির্যাতন রোধে শান্ড়িপূর্ণ সমাধানের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প পথ খুঁজে বের করে রিবা বা সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা মজলুম জনতাকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে রিবা নির্মূল আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান এসেছে স্বয়ং আল□াহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে (কুর'আন, ২:২৭৯), তাই এ আহ্বানের গুর"ত্ব দিতে হবে। সেই সাথে এই আহ্বানে সাড়া না দেয়ার পরিণতি মুসলিম উম্মাহ্কে বুঝে নিতে হবে, কেননা আল□াহ্ যেমন রহমানুর রহীম তেমনি মহাদমনকারীও বটে (কুর'আন, ৫:২)। এই আয়াতে মহাদমনকারী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আল□াহ্র ক্রোধের পরিচয় দেয়া হয়েছে। ইসলামের ভিত্তি ও মূল বিষয়বস্তু অর্জন বর্জন সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত এক মহাসত্যের উপর। আর মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব হলো সর্বাবস্থায় অত্যাচার-নিপীড়নের বির"দ্ধে সোচ্চার থাকা। [২]

১ প্রকৃতপক্ষে সর্বস্ড়রে সুদী লেনদেন বয়কট করে আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও নিরাপত্তাদানে সময়োপযোগী ও সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে আল□াহ্ তা'আলার দীনে। তাই একমাত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকেই বিশ্বের সকল মানুষ পেতে পারে দিক নির্দেশনা এবং ন্যায়-নীতি, বিচার-ফায়সালা এবং নিরাপত্তা-শান্ড়ি নিশ্চিত করে রিবার (সুদের) নির্যাতন সহ সকল অত্যাচার নির্মূলের সঠিক শিক্ষা। এ বিষয়ে আল□াহ্ তা'আলা রসুলুল□াহ্ (স) কে সম্বোধন করে বলেছেন: *(হে মুহাম্মদ) তোমার প্রতি সত্য দ্বীনসহ এই কিতাব নাযিল করেছি, (অবিকৃত অবস্থায়) পূর্ববর্তী কিতাবের যা কিছু তাদের সামনে মজুত আছে এই কিতাব তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং হিফাজতকারী। অতএব তোমরা আল□াহ্র নাযিলকৃত আইন-বিধান অনুযায়ী লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা কর, আর যে মহা সত্য দ্বীন তোমাদের কাছে নাযিল হয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারি'আহ্ ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি। অতএব সৎকাজে তোমরা সবাই প্রতিযোগিতা কর কেননা আল□াহ্র কাছেই তো তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন*। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৪৮)।
অতি দুঃখের বিষয় যে এতো পরিস্কার ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণার পরও মুসলিম উম্মাহ বন্দী হয়ে রইলো অত্যাচারী, লুন্ঠনকারী সুদখোর পুঁজিবাদীদের সুদী ঋণের কারাগারে। যে জাতির কাছে কুর'আনের মত মহাসম্পদ রয়েছে তারা আজ কর"ণাপ্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এমন এক গোষ্ঠির কাছে যাদের কাছে সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য অবিকৃত কোন কিতাব নেই। তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে জ্ঞানের বিকৃত উৎস মাত্র। এসব অত্যাচারী, লুন্ঠনকারী দলের লিডারদের রিবা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে জানতে হলে তাদেরকে ইসলামি জ্ঞান ভান্ডারের মূল ও বিশুদ্ধ উৎস কুর'আন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে যেন তাদের নিজেদের অশুভ কর্মকান্ড নিজেদেরই চোখে ধরা পড়ে।

২ আল□াহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিচ্ছেন:

তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মাহ্ (জাতি); তোমাদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে মানুষের কল্যাণে (সচেষ্ট থাকার) জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়-অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল□াহ্র প্রতি ঈমান মজবুত রাখবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০ ও ১০৪)।

[বর্তমানে কোন কোন মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রাত-দিন বিভিন্ন ইবাদাতে নিমগ্ন রয়েছেন। এতে কল্যাণ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত ও সৎকাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজে বাধাদানের নির্দেশকে অমান্য করার কারণে প্রতারণা, ওজন ও মাপে তারতম্য করা ও সুদী কর্মকান্ড, ঘুষ প্রথা, ব্যাভিচার ইত্যাদি সমাজ বিধ্বংসী সংক্রমনগুলি ক্রমশ বেড়ে গিয়ে আজ এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

একনিষ্ঠ মুসলিম, যারা ইসলামি আন্দোলনের কোন না কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন বাংলাদেশের বিশাল তাবলীগি জামা'আত এবং modern-day Salafis, তাদেরকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে সূরা আল মাঊন (সূরা নং ১০৭)-এর বক্তব্য। তারা দুস্থ মানবতার কল্যাণে নিজেরা এগিয়ে আসাতো দুরের কথা অন্যদেরকেও একাজে বাধা দিয়ে বেড়ায়। এই সূরায় মুনাফিকদের ব্যাপারেও বর্ণনা রয়েছে যারা বাহ্যত মুসলিম বলে পরিচিত, কিন্তু আখিরাতের প্রতি, দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ মেনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারটি উদাসীনতার সাথে উপেক্ষা ও অমান্য করে চলে। তাদের এই আচরণ ইসলামকে অস্বীকার করারই সামিল।

রিবা বা সুদ এমন একটি সামাজিক ব্যধি যা মানুষের মাঝে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা, কৃপণতা এমনকি নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার জন্ম দেয়। সুদ মানুষকে কর্ম বিমুখ করে রাখে। কারণ বিনা শ্রমে সুদী লাভ পাওয়া যায় বলে মানুষ কর্‌যে হাসানা বা ব্যবসায় বিনিয়োগের মত কল্যাণকর কাজে টাকা না খাটিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে। তাই রিবা (সুদ) শুধু আল-কুর'আনেই হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি বরং রিবা বা সুদ হারাম বিষয়ক ঘোষণা পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের শরিয়তেও ছিল। মুসা (আ)-এর কিতাব তওরাত, ঈসা (আ)-এর কিতাব ইঞ্জিল এবং দাউদ (আ)-এর কিতাব যবুরেও সুদ হারাম ছিল যা বিকৃত করে ফেলা হয়। [১]

বর্তমানে আমরা এমন এক ক্রান্তিকাল পার করছি যেখানে নীতি ও মূল্যবোধের অবস্থান নেই বললেই চলে। সততা, একনিষ্ঠতা, সত্যনিষ্ঠতা, পরস্পর মহব্বত ও পারিবারিক দৃঢ় বন্ধন আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে সারা বিশ্ব থেকে ঈমানদীপ্ত মুসলিমদের সংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে হুযাইফা (রা)-এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *একজন মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে আর তার অন্তর থেকে সততা উঠে যাবে, যে*

১ পূর্ববর্তী কিতাবগুলি ভন্ড ধর্মজাযকদের দ্বারা বিকৃত হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুর'আন হিফাজতের দায়িত্ব নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে: *নিশ্চয়ই আমি উপদেশপূর্ণ কুর'আন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই এর হিফাজত (সংরক্ষণ) কারী*। (সূরা হিজর, ১৫:৯)।

পূর্ববর্তী কিতাব এখন আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহুদি-নাসারা নেতৃবৃন্দ এসব কিতাবকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে নিয়েছে, তথাপি খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তির শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ (গীর্জা) হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তিকাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। আর পরিবর্তনের পরেও বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা Old Testament-এ এখনও সুদ নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ রয়েছে। এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কারণেই সুদী-অর্থব্যবস্থা বিশ্ব মানবতা নিধনে মহা প্রতাপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

[ইহুদি-নাসারারা ভালভাবেই জানে যে মুসলিমের ঈমান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর হাতিয়ার। এই ঈমান নষ্ট না করে মুসলিমদের বাগে আনা সম্ভব হবে না কারণ মুসলিমরা সহজে নতি স্বীকার করার পাত্র নয়। তারা এটাও অনুধাবন করতে পেরেছিল যে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ মুসলিমের শিক্ষা ও ঈমানী চেতনার মূল উৎস। তাই তারা একদিকে দীনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষমতা ও কৌশলে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। অপরদিকে দ্বীনের আলীম নিধন অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার আলীমদের হত্যা করে কিংবা কারা নির্বাসন দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করার দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

সামান্য সততাটুকু ঘুম থেকে জাগার পর অবশিষ্ট থাকবে তার উদাহরণ হলো একটি ছোট্ট কালো দাগের সমান। অতপর সে যখন আবার ঘুমাতে যাবে সেই সামান্য পরিমাণ সততা থেকেও কমে গিয়ে যা বাকী থাকবে তা হলো তার পায়ে একটি জ্বলন্ড় অঙ্গার পড়ে ফোস্কার কারণে যেটুকু ফুলে উঠে সেই পরিমাণ। এই ফোস্কার কারণে যেটুকু ফুলে উঠবে মানুষ শুধু সেটুকুই দেখতে পাবে। কিন্তু আসলে ভেতরে কিছুই পাওয়া যাবে না। লোকেরা ব্যবসা পরিচালনা করবে কিন্তু বিশ্বস্ড় লোক পাওয়া কঠিন হবে। তখন বলা হবে অমুক গোত্রে একজন সৎলোক আছে। যাকে নিয়ে অন্যরা বলাবলি করবে কত জ্ঞানী, ভদ্র এবং সাহসী ও শক্তিশালী সে লোকটি – যদিও তার অন্ড়রে ঈমানের পরিমাণ একটি সরিষার সমান হবে না। (তিরমিযী, ৪:২১৮২ পৃ ৫২১-৫২২ ইফাবা)।

আজকের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে কেউ কেউ সহজেই হয়তো মেনে নেবেন যে, হাদীসে বর্ণিত অবস্থা বর্তমানেই বিরাজমান রয়েছে। কাজেই ‘রিবা’র কারণে সৃষ্ট নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং রিবার প্রকোপ নিজেই কিয়ামতের আলামত বহন করছে। আজকাল বিশ্বস্ড় লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর। [১]

সুদখোর ঈমানহারা লোকগুলির নৈতিকতার এতটাই অধপতন হয়েছে যে, এতিম, দুস্থ, অসহায়দের সম্পদ চুরি কিংবা লুট করতেও আজ তারা ভয় কিংবা লজ্জাবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

ইউরোপীয়দের মধ্যে মুহাম্মদ আসাদ এমন ভয়ংকর লোভের নমুনা দেখেছেন যা কুর’আনুল করীমের সূরা কাহ্‌ফ (সূরা নং ১৮) এবং অন্যান্য সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ আসাদ তার Road to Mecca গ্রন্থে লিখেছেন: “লোভ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। প্রতি যুগের মানুষের মাঝেই লোভ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের লোভ-লালসার মাত্রা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যা সকল যুগের লোভ-লালসার পরিধিকে হার মানায়। একজনকে ছাড়িয়ে অপরজন আরো বেশী অর্থ-সম্পদ বাড়ানোর মোহ ও অদম্য লোভ মানুষকে অন্য সকল বিষয়ের প্রতি অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ কেবলই সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ড়। আজ যা আছে আগামীকাল তার চেয়ে আরো বেশী চাই, আগামী পরশু আরো বেশী। লোভের চাহিদা এমনভাবে বেড়ে চলেছে যেন এক মহাদানব মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে চাবুক মেরে অসীম লোভের রাজ্যে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। জাগতিক সকল কিছু দুহাতে অর্জনই আজকের মানুষের মূল লক্ষ্য।

১ মানবতার মিথ্যা শে্লাগানের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মানবতা বিধ্বংসী কর্মকান্ড চালিয়ে ঈমান হারা কথিত মুসলিমের সংখ্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। অদম্য লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসিতা পূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ড় হয়ে মুসলিমরা ব্যয়বহুল জীবন যাত্রা বেছে নিয়েছে। বাড়তি এই ব্যয়ভার সামাল দেয়ার জন্য হালাল হারামের বাছ বিচার না করে যে যেভাবে, যেদিক থেকে পারছে দু’হাতে উপার্জনের ধান্দায় চর্কির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অদম্য এ লোভকে আরো বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভোগ্যপণ্যের সমাহার নিত্য নতুন মোড়কে, নিত্য নতুন সাজে লোভনীয়, মোহনীয় ভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। অতপর মানবজাতিকে

আকৃষ্ট করার জন্য সে সব পণ্য বাজারে আসছে যেন মানুষের চোখের ও মনের ক্ষুধা কবরে

যাওয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ড় নির্বাপিত না হয়। অবশ্যই, তুমি যদি জানতে তাহলে কোন্ জাহান্নামে আছ, তা তুমি দেখতে পেতে।[২]

মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত ও রহমত স্বরূপ কুর'আন ও সুন্নাহ্ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ড় থাকবে। আমরা মনে করি হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে কুর'আন অধ্যয়ন করে সেমত জীবন গড়ে নিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যেতে পারবো। তাই আমাদের প্রথম কাজ হলো কুর'আন-সুন্নাহ্ অধ্যয়ন করে কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কুর'আন থেকে হিদায়াত লাভ করতে চাইলে কুর'আনকে গাইডবুক হিসেবেই গণ্য করতে হবে। পূর্বের নাযিলকৃত সকল কিতাবে ঈমান রেখে সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব আল-কুর'আনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় প্রতিটি আয়াত এমনকি প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সুবিধামত, একটি ছেড়ে অন্যটির উপর বিশ্বাস ও আমল করলে ঈমানের শর্ত ভঙ্গ হয়ে যায়। বস্তুবাদী দুনিয়ায় লোভ লালসা ও ভোগ বিলাসিতার মোহ কাটিয়ে উঠতে না পারার কারণে যারা কুর'আনের সামান্য কিছু অংশকেও ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করছে, তারা যেন পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখেন। বর্তমান দুনিয়ার লালসা ও ভোগের সমুদ্রের মধ্যে থেকে কুর'আন সুন্নাহ্য় ঈমান আনা এবং আল্লাহ্র প্রতিটি বিধি বিধান মেনে চলার জন্য অতীব সবর ও সাহসিকতার প্রয়োজন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্র বিধান পালন সহজ না কঠিন, তা নির্ভর করে ঈমানের মজবুতি তথা আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর। একজন সত্যিকার মু'মিন-মুসলিমের জন্য রিবা বর্জনতো বটেই, অন্য যে কোন বিধি নিষেধ মেনে চলাই আল্লাহ্ সহজ করে দেন। প্রয়োজন শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একনিষ্ঠ ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং কোন ভুল করে ফেললে তাওবা করে কুর'আনের দিকে পুনরায় ফিরে আসা।

আমাদের মতে রিবা নিষিদ্ধকরণকে বুঝতে পারার, তথা আধ্যাত্মিক জাগরণের, লিটমাস পরীক্ষা নিহিত রয়েছে দু'টি বিষয়ের সাথে: (১) রিবা বা সুদভিত্তিক বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা; এবং (২) ধর্মনিরপেক্ষতার নামে স্রষ্টাবিমুখ রাজনৈতিক শির্ক প্রতিষ্ঠা। বর্তমান বিশ্ব মুসলিমদের ঈমানী পরীক্ষার যে ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে প্রথমেই তা অনুধাবন করতে হবে যাতে করে এ দু'টি বিষয়ের মুকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। রিবা হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার পর আশা করা যায় মানুষ এমন এক জীবন

[২] Muhammad Asad, 'Road to Mecca'. Islamic Book Trust. Kuala Lumpur, 1996. p. 310. "অবশ্যই, তুমি যদি জানতে তাহলে কোন্ জাহান্নামে আছ, তা তুমি দেখতে পেতে" — কথাটি সূরা তাকাসুরের ৬ নং আয়াত থেকে নেয়া।

পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা করবে যাতে থাকবে ঈমান ও সৎ আমল করার পরিবেশসহ জীবনের সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধানে সক্ষম ইসলামি বিধান, যার দ্বারা মানবজাতির সত্য সঠিক পথচলার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। আর সে দিক নির্দেশনার মাধ্যমে মানুষ শিখতে পারে এ যমানার নেকড়েদের কবল থেকে মেষপালের সংরক্ষণ, সেই সাথে তাদের লালন পালন, ও উন্নয়নের নিয়ম-বিধান।

আজকের দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যারা নিজেদেরকে মেষপালক হিসেবে দাবী করে কিন্তু নেকড়ে থেকে মেষপাল সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করা তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার, কারণ তারা নেকড়ে চিনেই না। আবার কোন কোন লোক আছে যারা নেকড়ের দলের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নেকড়ে দলের ‘নুন খায় তাই গুণ গায়’। এ ধরনের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার কারণে এসব মেষপালক গোষ্ঠি মেষপালের লালন পালন ও নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত না থেকে বরং পালের মেষগুলিকে এক এক করে সরাসরি নেকড়ের মুখে তুলে দেয়। এমনকি যারা মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দ বলে দাবী করেন তারাও নির্বোধের মত বিশ্বাসঘাতক সেজে দুনিয়া থেকে দ্বীন-ইসলাম অপসারণের ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। অধিকাংশ মুসলিম সরকার রিবা বা সুদের রাজ্যে আত্মসমর্পণ করে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বেচ্ছায় দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে। যদি না বিশ্ববাসী কুর’আন-সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কুর’আনের অবিকৃত ও মূল উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে সঠিক পথের দিশা তালাশে সচেষ্ট হয়, যদি না কুর’আন-সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়ে তোলে, তাহলে তারা যে শুধু অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে তা-ই নয় বরং চরম দারিদ্রের কবলে পড়ে পরস্পরে অত্যাচার, উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে, এবং রক্তপাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর তখন আজকের এই দুনিয়া মানবতা ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

ইসলামে রিবাকে হারাম বা নিষিদ্ধকরণের ঘোষণা এসেছে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিশ্বচরাচরের মালিক স্বয়ং আল□াহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে। আর রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে কুর’আনুল কারীমে যা একমাত্র অবিকৃত আসমানী কিতাব হিসাবে বর্তমান রয়েছে; যে কিতাব তার মূল অবস্থায় আজও আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ড় থাকবে, যা আল□াহর পক্ষ থেকে আজ তেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। তাই যেকোন মু’মিন-মুসলিমের এমনকি যে কোন মানুষের অধ্যয়ন ও গবেষণার অন্যতম প্রধান ও মূল উৎস হওয়া উচিত আল-কুর’আন।

সে কারণে কুর’আনকেই আমরা আমাদের গবেষণার মূল উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমরা কুর’আন থেকে শুধু বিষয়ভিত্তিক আলোচনাই করিনি বরং এ বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সে সকল আয়াত নাযিলের কারণ ও বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা মূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। রিবার বিষয়টি পর্যায়ক্রমে তিনটি সময়ের

প্রেক্ষাপটে তিনটি স্তরে নাযিল হয়েছিল। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা রিবার (সুদের) বিষয়টিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং রিবাকে হারামের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দুনিয়া থেকে একে নির্মূল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুর'আনের পরেই সত্যনির্ভর ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের উৎস হলো মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর সুন্নাহ্, যা হাদীস নামে সুপরিচিত। সে কারণে রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সুন্নাহর আলোচনাও আমরা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেছি।

দু'টি বিশেষ কারণে রিবাকে হারাম বা নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে এই গ্রন্থ রচনায় আমরা অন্য কোন উৎস ব্যবহার করার চেষ্টা করিনি। প্রথমত, অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া বইগুলি সমসাময়িক অর্থ ব্যবস্থায় রিবা দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ ও ক্ষতিকর দিকগুলিকে উপস্থাপন না করে দ্বিধাগ্রস্ত বক্তব্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়ত, বইগুলি রিবাকে হারাম ঘোষণার ব্যাপারে আইন বিষয়ক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা সৃষ্টি করে এর ক্ষতিকর দিকগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[১]

আমরা বিকল্প কোন অর্থনৈতিক মডেল তৈরী করার চেষ্টা করিনি। কারণ বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার পুরোটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রিবার (সুদের) উপর। আর এই সুদী অর্থ ব্যবস্থার একশত ভাগই রয়েছে লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক সুদী লেনদেনের মুলোৎপাটন করে ইসলামি ব্যবসা ও বাণিজ্য নীতি পরিচালনা করা। আর এতে কোনই সন্দেহ নেই যে একমাত্র কুর'আনের আইন-বিধান ও দন্ডবিধি প্রবর্তনই স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক মুক্ত বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম ।

আমাদের প্রস্তাবনা:

যে সকল মুসলিম বর্তমানে সুদী পদ্ধতিতে অর্থ-বিনিয়োগ করেছেন তাদের জন্য বিকল্প বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।[২]

১ ফলে অধিকাংশ উৎসগুলিই রিবা নিষিদ্ধকরণ ও বিশ্ব অর্থব্যবস্থা থেকে রিবাকে বয়কটের বিষয়ে জোরালো বক্তব্যগুলিকে পাশ কাটিয়ে রিবা দ্বারা সৃষ্ট বিষাক্ত পরিবেশকে হালকাভাবে উপস্থাপন করেছে, যা থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও দিক নির্দেশনা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার বলে আমরা মনে করেছি। এই গ্রন্থে এমন কোন বিষয় বা এমন কারো বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যারা হক ও বাতিলকে একসাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। কিংবা আলাদীনের চেরাগের স্পর্শে বাতিল পন্থায় নিজেদের তকদীর পরিবর্তনে বিশ্বাসী হওয়ার মাঝেও দ্বীনের অনুমোদন রয়েছে এই ধরনের দাবী করে সুদী বিনিয়োগের অংশীদার হয়েছেন।

২ আর ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে সর্বাবস্থায় সুদ বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।অর্থনৈতিক সুন্নাহ্কে সামনে রেখে সুন্নতী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করা। আর অপচয়, বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার মাধ্যমে ব্যয়বহুল জীবনযাপন থেকে নিজেকে এবং আহ্‌ল পরিজনকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

মুসলিমগণ যেন কোন অবস্থাতেই বাড়ী, গাড়ী কিংবা অন্য যে কোন কিছু কেনার জন্য ব্যাংক তথা সুদী ঋণ ব্যবস্থায় না যান বরং আল্লাহ্‌র বিধানে কায়েম থাকার জন্য

সর্বোচ্চ সবর করেন এবং বিকল্প হালাল ব্যবস্থা গ্রহণে আল্লাহর সহায়তা কামনা করতে থাকেন।

এ গ্রন্থে আরো যে সকল বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলো 'রিবা ও *দারুল হারব*'। কিছু কিছু পন্ডিত মনে করেন, আমেরিকা বা অনুরূপ দেশগুলি 'দারুল হারব' বিধায় সেসকল দেশে রিবার নিষিদ্ধকরণ প্রযোজ্য নয়। এই দাবীর বিরুদ্ধে আমরা জোরালো প্রতিবাদ উপস্থাপন করেছি। কারণ সারা দুনিয়ায় যখন দারুল ইসলামের অস্তিত্ব নেই সেখানে দারুল হারব-এর প্রশ্ন তোলা অবান্তর। ইরান ও সুদান দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হতে পারত, যদি তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত কর্তৃত্বকে মেনে নেয়া থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারত। কারণ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সুপ্রিম অথরিটী দাবী করা যেমন শির্ক, অন্য কাউকে সুপ্রিম অথরিটী হিসেবে মেনে নেয়াও তেমনি শির্ক।[১]

মুসলিম সমাজে এমন সম্পদশালী ব্যক্তিদের অভাব নেই যারা বৈধ-অবৈধ সকল উপায়ে সম্পদ আহোরণ করেছেন এবং নিজ পছন্দমত ধার্মিকতা দেখাতে পিছপা হন না। তারা পুঁজিবাজারে তথাকথিত *হালাল* বিনিয়োগ করার পথ খুঁজতে থাকেন। বলা বাহুল্য, তাদেরকে মূল্যবান এবং দক্ষতাপূর্ণ সহায়তা দিতে পারেন এমন অর্থনীতি বিশারদের আজ আর অভাব নেই। সবশেষে বলতে হয় যে এই গন্থের প্রতিটি বিষয় বুঝতে পারা হয়ত সহজ নাও হতে পারে। তবে আশা করা যায় যে এখানে এমন কোন তথ্য উপস্থাপিত হয়নি যা বিতর্কের জন্ম দিয়ে পাঠককে সত্যের প্রত্যাখানের দিকে পরিচালিত করবে। আমরা বিশ্বাস করি, গভীর চিন্তা, ধ্যান ও যথাযথ গবেষণার মানসিকতা নিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই তার রহমতের দৃষ্টি আমাদের দিকে প্রসারিত করবেন। আমাদেরকে সত্য সঠিক এলেম দান করে হক পথে চলার তওফিক দান করবেন। কারণ তিনি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন।[২]

এবার আমরা এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর দিকে এগিয়ে যাই এবং রিবার যথার্থ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি।

১ শির্ক কুফরে আকন্ঠ ডুবে থাকার কারণে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ কুর'আনুল কারীমের নিয়ম-বিধান পরিবর্তন করেই চলেছে। উল্লেখ্য যে কুর'আন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসুল (স) যে সকল বিষয় হারাম ঘোষণা করেছেন তা কিয়ামাত পর্যন্ত হারাম থাকবে। কোন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র যখন সেটাকে হালাল ঘোষণা করে কিংবা হালাল ঘোষণা দানের চেষ্টা করে তখন সে ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র শির্কে লিপ্ত হয়। তাই যে সকল রাষ্ট্র লটারী, জুয়া, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার পর্ণগ্রাফী (অশ্লীল ছবি প্রদর্শন) ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণাকৃত হারামকে আইন করে কিংবা গায়ের জোরে যে কোন উপায়েই হোক হালাল বা বৈধ বানিয়ে নিয়েছে তারা শুধু কুফরী নয় শির্কের ফাঁদেও বন্দী রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। আর এটাই কুর'আনকে অবমাননা করা এবং কুর'আনের সাথে কুফরী এবং মুনাফেকী। বিভিন্নভাবে কুর'আনকে অবমাননা করার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ যে চরম মূল্য পরিশোধ করে চলেছে তা আজ দিবালোকের মত পরিস্কার। অন্যান্য বহু গুনাহ্র সাথে সাথে সারা বিশ্বের মুসলিমদের গোটা অর্থনৈতিক জীবনই রিবা রূপী ফিৎনায় ছেয়ে গেছে। তাই শুধু রাষ্ট্র নয় সারা মুসলিম উম্মাহ্ রিবা, কুফর ও শির্কের মাঝে বন্দী হয়ে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: *নিশ্চয়ই শির্ক হলো মহা জুলুম*। (সূরা লুকমান, ৩১:১৩)। *নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মাফ করেন না (তাওবা ছাড়া) শির্কের গুনাহ্*। (সূরা নিসা, ৪:৪৮ ও ১১৬)।

২ ইরশাদ হচ্ছে: *আমার কোন বান্দা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (হে নবী আপনি বলে দিন) আমি তার একান্ত কাছেই আছি, আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই যখনই আমাকে সে ডাকে। তাই তাদেরও উচিৎ আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপরই ঈমান আনা। যাতে করে তারা সঠিক পথের দিশা পায়।* (সূরা বাকারা, ২:১৮৬)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রিবার সংজ্ঞা

সম্ভবত এমন কোন আধুনিক পন্ডিত নেই যিনি বাস্ড়বতার নিরিখে রিবার (সুদের) ভয়ানক ক্ষতিকর রূপ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে লিওপল্ড ওয়াইয (Leopold Weiss)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি জন্মসুত্রে ইহুদি ছিলেন এবং ১৯২৬ সালে মুহাম্মদ আসাদ নাম ধারণের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। Road to Mecca নামক গ্রন্থে তিনি একজন মুসলিম হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রা অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত কুর'আনের তাফসীরে (The Message of the Quran) তিনি রিবা বিষয়ক কুর'আনের বর্ণনা ও নির্দেশাবলী দক্ষ ও সৃজনশীল মন নিয়ে সফলতার সাথে ব্যক্ত করেছেন। রিবার মত একটি জটিল বিষয়ের গভীরে এতটা সফলভাবে তার ঢুকতে পারার পেছনে মূল রহস্য হলো, ইহুদি জীবনে ইউরোপীয় সমাজের সুদী অর্থনীতির সাথে তার সম্পৃক্ততার বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা।

এখানে মুহাম্মদ আসাদের তাফসীর হ'তে রিবার সংজ্ঞা ও রিবা সংক্রান্ড় ব্যাখ্যা-বিশে্লষণ তুলে দেয়া হলো। শব্দগত বা ভাষাগত দিক থেকে রিবা বলতে যোগ করা বুঝায়, প্রাথমিক অবস্থা থেকে কোন পণ্যের পরিমাণ বা আকারে বৃদ্ধি পাওয়াকে বুঝায়। কুর'আনের পরিভাষায় যেকোন অবৈধ ও বেআইনী উপায়ে বা অন্য কোনপ্রকার সুবিধাভোগের মাধ্যমে মূলধনের পরিমাণ বা আকার বৃদ্ধি করা রিবার আওতাভুক্ত। কোন সম্পদ বা অর্থ অপর কোন ব্যক্তিকে ধার দিয়ে সুদের মাধ্যমে বিনাশ্রমে মূল অর্থ বা পণ্যের আকার বা পরিমাণকে বৃদ্ধি করাই 'রিবা'।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তৎকালীন মুসলিম আইন-বিধান প্রণেতাগণ (Jurists) 'রিবা' বলতে সুদের মাধ্যমে মূলধনের সাথে অবৈধ পন্থায় বাড়তি যোগ করা অর্থ-সম্পদকে বুঝিয়েছেন। মূলত ঋণদানের মাধ্যমে, সুদের হার কমবেশী যা-ই হোক, বিনাশ্রমে অবৈধ উপায়ে মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ আদায় করাকেই রিবা বলা হয়।

রিবা সংক্রান্ড় বৃহদাকার বই-পুস্ড়ক অধ্যয়ন ও গবেষণা মূলক বিবিধ ব্যাখ্যা-বিশে্লষণ করা সত্বেও ইসলামি পন্ডিতগণ আজো একমত হয়ে রিবার যথাযথ সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে সক্ষম হন নি। প্রকৃতপক্ষে রিবার বিষয়টিকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন যা এবিষয়ে সকল প্রকার ধারণা, ব্যাখ্যা এবং আইন-বিধানকে বিবেচনা করবে। ইবনে কাসীর (রহ) সূরা বাকারার ২৭৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, রিবার বিষয়টি খুবই জটিল তাই আলিমগণের মধ্যে অনেকেরই এর বিভিন্ন মাসআলার উপর প্রশ্ন রয়েছে। উলে্লখ্য যে, সূরা বাকারার ২৭৫–২৮১ নম্বর আয়াতগুলিই হলো কুর'আনে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা রিবাকে চুড়ান্ড়ভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর রিবা বা সুদ দাতা ও সুদ গ্রহীতা উভয়ের জন্যই কঠিন শাস্ড়ির ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। এই আয়াত নাযিলের অল্প

কিছুদিন পরেই রসুলুল্লাহ্ (স)-এর ওফাত হয়। ফলে সাহাবাগণ তাঁর কাছ থেকে রিবার বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ব্যাপারে বিস্ড়রিত জেনে নেয়ার সুযোগ পাননি। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাই বলেছেন: *রিবার আয়াতটিই শেষ ওহী; দুঃখের বিষয় রসুলুল্লাহ্ (স) এর পুরো অর্থ বুঝিয়ে দেবার আগেই চির বিদায় নিলেন।*[১]

তৎকালীন সমাজে যে বা যারা রিবা ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে কুর'আনুল কারীমে যে তীব্র ঘৃণাবোধ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে রিবার সামাজিক এবং মৌলিক তাৎপর্য অত্যন্ড় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল-কুর'আন এবং রসুল (স)-এর সুন্নাহ্য় রিবা সম্পর্কে যা বর্ণনা রয়েছে তাতে এটাই বুঝা যায় যে দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ নিপীড়িত ও অন্যান্য সাধারণ মানুষকে ঋণ দিয়ে ঋণদাতার পক্ষে কোনরকম ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া সুদসহ আসল ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়াটিই রিবা নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় ঋণদাতার সকল প্রকার স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত থাকে। পক্ষান্ড়রে ঋণ গ্রহীতার কোন সুযোগ সুবিধা এবং অধিকারের কথা, অথবা নৈতিক-অনৈতিক কোন্ কারণে ঋণ নেয়া হচ্ছে এসব বিবেচনা করা হয় না। সে যদি ভীষণ ক্ষতির মধ্যেও পতিত হয় তথাপিও যে করেই হোক যথাসময়ে সুদসহ আসল ফেরত দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। উপরন্তু ঋণ গ্রহিতার করুন অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে ঋণ মওকুফের শর্ত চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকে না, তাই সময়ের মেয়াদ শেষে সুদসহ আসল ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে তার সুদের পরিমাণ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে এবং তাকে বিবিধ অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হতে হয়।

রিবা সংক্রান্ড় পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা মনে রেখে আমাদের বুঝতে হবে কোন্ ধরনের আর্থিক লেনদেন রিবার (সুদের) আওতায় পড়ে এবং কোন্ ধরনের আর্থিক লেনদেন রিবার আওতামুক্ত, এবং কিভাবে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে লাভ এবং ক্ষতি আনুপাতিকহারে ভাগ করা হয়। তাছাড়া খেয়াল রাখতে হবে ঋণগ্রহীতার উপর এমন কোন শর্ত যেন আরোপিত না হয় যাতে ঋণের বোঝা বহন করতে যেয়ে তাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সকল যুগে সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমস্যা সমাধানের নির্দিষ্ট উত্তর দেয়া মূলত খুবই কঠিন। বর্তমান যুগে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, রাষ্ট্রিয় বিধি-বিধান পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাছাড়া যুগের আবর্তনে লেনদেনের পদ্ধতি বদলে গেছে, যেমন সোনা রূপার মুদ্রার পরিবর্তে বহুদিন ধরে কাগুজে টাকার প্রচলন হয়েছে। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম বিষয়ক নিয়ম পদ্ধতি আরো একধাপ লাফিয়ে উঠে বর্তমানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। আগামীতে হয়তো আরো কত নতুন কিছুর উদ্ভাবন ঘটবে। সে কারণে যুগের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিবার এমন ব্যাখ্যা দিতে হবে যেন সেটা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।[২]

১ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ "বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমরা রসুলুল্লাহ্ (স) হতে বিস্ড়রিত জ্ঞান আহরণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তুলে নিয়েছেন। বিষয় তিনটি হলো– প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রিবা, দ্বিতীয়ত কালালহ্ (নাতীর জন্য দাদার উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপার) এবং খিলাফাহ্। ২:২৭২৭ ইবনে মাজাহ্

বর্তমান সুদী ব্যাংকের কার্যধারা পরখ করলে দেখা যায় যে, দুস্থ-নিঃস্বদের ঘামে ভেজা অর্থ সম্পদ সময়ের ব্যবধানে গুটিকতক পুঁজিবাদীদের কাছে জমা হতে থাকে। এই জমানো অর্থ আবার পর্যায়ক্রমে পুঁজিপতি শোষকদের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত হয়। সাধারণ লোকের নিয়ন্ত্রণে অর্থ অবশিষ্ট থাকে না, ফলে তারা চিরঋণী কাঙালে পরিণত হয়।

এবার কুর'আনের ভাষায় রিবার (সুদের) প্রকৃত সংজ্ঞায় আসা যাক। রিবা বিষয়ক সংজ্ঞা ও পরিচিতি তুলে ধরে প্রথমে ঘৃণা প্রকাশের ভাষায় কুর'আনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো:

আর তোমরা যে সুদী বিনিয়োগ করো, এই ভেবে যে অন্যের অর্থের সাথে মিলে তোমাদের অর্থ বৃদ্ধি পাবে (অন্যের সম্পদ খরচ হয়ে তাদের তহবিল থেকে তোমাদের কাছে জমা হবে) কিন্তু আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না (তাই এই বিনিয়োগ আল্লাহ্ অনুমোদন করেন না) বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে দান সাদাকা তোমরা কর তাই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। (সূরা রূম, ৩০:৩৯)।

যে যামানায় কুর'আনের এই আয়াত নাযিল হয়, তখন মূলধনের সাথে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করার পদ্ধতিকে রিবা (সুদ) বলা হতো। সুদী লেনদেনে সর্বদাই একজনের সম্পদ কমিয়ে অপরজনের সম্পদ বাড়ানো হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যদি সুদী লেনদেনের মাধ্যমে আমার মূলধন বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ হলো সেটা মূলত অপর একজনের লোকসানের মাধ্যমেই হলো। এ ধরনের লেনদেন কখনোই ব্যবসা হতে পারে না। বরং এ ধরনের লেনদেন হলো দুর্নীতি, শোষণ ও প্রতারণা। ইসলামি বিধানে ব্যবসা হলো উভয়পক্ষের সমঝোতা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে। তাই কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে:

হে মু'মিনগণ তোমরা একে অপরের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। ব্যবসা বাণিজ্য যা করবে তা করবে পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে। (সূরা নিসা, ৪:২৯)।

২ যদিও কুর'আনুল মাজীদে রিবা যে অতীব ঘৃণ্য বর্জনীয়, কবীরা গুণাহ সে কথা স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। তথাপিও যুগে যুগে সাধারণ মানুষ এবং ইসলামি স্কলারদের মন মানসিকতার পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ভিত্তিতে রিবার সংজ্ঞা দিতে হবে কুর'আন-সুন্নাহর সাথে মিল রেখে। সেই সাথে সে বিষয়ে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে হবে। যাতে করে সর্বকালের মানুষই রিবাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং রিবার ধ্বংসাত্মক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

ঋণ খেলাপীদের কথা বলা যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ নেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সেসব ঋণ পরিশোধ না করে ঋণ খেলাপী হন এবং সমাজের অগনিত মানুষের কঠোর শ্রমে অর্জিত সম্পদ আত্মসাৎ করেন। সেসব লোক ঋণ খেলাপী আখ্যায়িত হওয়ার পরও সমাজে তারা মাথা উঁচু করে চলেন। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা গণ ঋণ শোধ করতে না পারলে কিংবা সুদের কিস্তি দিতে না পারলে তার গরু ছাগল, ভিটে, ঘর বাড়ী ক্রোক, বিক্রি করে হলেও সুদাসল আদায় করা হয়।

সংজ্ঞা সহ রিবার পরিচয় তুলে ধরে কুর'আনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতকে (৩০:৩৯) অধিকতর শক্তিশালী করণ ও অনুমোদনের মাধ্যমে রিবা বিষয়ক দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়। কুর'আনের এই আয়াতে আল□াহ্ তা'আলা ইহুদিদেরকে সীমালংঘন, অত্যাচার, দুর্নীতি ও শয়তানী কর্মকান্ডের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন। তাদের কিতাব তওরাতে হারাম ঘোষণা সত্বেও তারা সুদী ব্যবসার মাধ্যমে চরম শোষণ-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। সে কারণে আল□াহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে তারা:

. . . ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের মাল সম্পদ গ্রাস করত. . . (সূরা নিসা, ৪:১৬০-১৬১)।

কুর'আনের এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, রিবা হলো অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে নিজের মূলধন বাড়িয়ে নেয়ার অন্যতম মাধ্যম। সে কারণে রিবা বা সুদী কর্মকান্ড অবশ্যই অর্থনৈতিক অত্যাচার ও নিপীড়ন।

রিবা বিষয়ক তৃতীয় ও চতুর্থ ওহীতে সর্বশক্তিমান আল□াহ্ তা'আলা রিবার যে ধরন চিহ্নিত করেছেন তাহলো, নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে নির্দিষ্ট হারে মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শর্তে ঋণদান যা বর্তমানে 'Interest' নামে পরিচিত। সুদী অর্থ ব্যবস্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ হাতবদল করে।[১]

"অনুমোদিত চৌর্যবৃত্তির" (legalized theft) আকারে অর্থনীতির ভিতরে লুকিয়ে থাকার কারণে রিবাকে (সুদ) অনেক সময় চিনতে পারাটা কঠিন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড ফক 'অনুমোদিত চৌর্যবৃত্তি' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে অনুমোদিত চৌর্যবৃত্তি বলতে লুন্ঠনপরায়ণ পুঁজিবাদকে বুঝায় যেখানে অন্যায়ভাবে সম্পদের হাতবদল হয়। তবে আমাদের দৃষ্টিতে সকল পুঁজিবাদই লুন্ঠনপরায়ণ।

১ ঋণদাতার জন্য মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ ঋণগ্রহীতার জন্য বাধ্যতামূলক। উপরন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দেনাদার দেনা পরিশোধে অক্ষম হলে দেনা-পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হয়। মেয়াদ বাড়ানোর পরিণতিতে দেনাদারকে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদসহ মূলধন প্রদানে বাধ্য করা হয়। এই ধ্বংসাত্মক শোষণ ও নির্যাতনের মূল হোতা সুদী অর্থ ব্যবস্থা নির্মূলে আল□াহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন: *হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়োনা। আল□াহ্কে ভয় কর, যাতে করে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার, আর সে আগুন হতে আত্মরক্ষা কর যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের (যারা আল□াহ্ এবং তার বিধানকে অস্বীকার ও অমান্য করে) জন্য।* (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩০-১৩১)।

হে মু'মিনগণ তোমরা আল□াহ্কে ভয় কর এবং তোমাদের কাছে যে রিবা (সুদ) বাকী আছে তা বর্জন কর যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হও আর যদি তা না (সুদ বর্জন) কর তাহলে, শুনে নাও, আল□াহ্ ও রসুল এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে (কারণ এটা তোমাদের মাল কাজেই এটা তুলে নেয়ার অধিকার তোমাদেরই) আর তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা, ২:২৭৮-২৭৯)।

এবার দেখা যাক লিগালাইযড থেফ্‌ট বা আইনের ছত্রছায়ায় চৌর্যবৃত্তির প্রচলন কিভাবে হলো? কুর'আনের রিবা বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত আয়াতে ধার-কর্জ লেনদেনের মাধ্যমে রিবা বা সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সাধারণত রিবা বলতে যা বুঝায় তা হলো উচ্চ সুদের হারে অর্থ ঋণদান।[১] অথচ রসুলুল্লাহ (স)-এর কাছে নাযিলকৃত শেষ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুদ বর্জন করে শুধুমাত্র মূলধন ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (২:২৭৮-২৭৯)।

"সুদে টাকা ধার দেয়া অন্য যে কোন ব্যবসার মতই একটা ব্যবসা" এই ধারণাকে কুর'আন নাকোচ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। সুদ আর ব্যবসা এক জিনিষ নয়। কেন? কারণ ব্যবসা সংঘটিত হয় মুক্ত ও ন্যায্য বাজারে, যেখানে ঝুঁকি আছে, যেখানে লাভ এবং ক্ষতি দুটাই সম্ভব। অপর দিকে রিবা ব্যবস্থায় বাজারের চালিকাশক্তিকে (অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহ প্রসূত অবস্থাকে) এড়িয়ে যাওয়া হয়, এবং টাকা ধার দেয়াতে কোন ঝুঁকি নেয়া হয় না, অতএব ক্ষতিবরণের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অথচ লোকসানের ঝুঁকি ছাড়া কখনো স্বচ্ছ ও মুক্ত বাজার টিঁকে থাকতে পারে না। বর্তমানে তাই পৃথিবীতে মুক্ত বাজারের কোন অস্ড়িত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ঋণদাতা দবির নিজেকে সকল ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখলো, আর ঋণগ্রহিতা ইমরানকে তার নিজের এবং দবিরের ক্ষতির ঝুঁকি বহন করতে বাধ্য করা হলো। এক্ষেত্রে এটা পরিস্কার যে ইমরানের তহবিল থেকে একতরফাভাবে দবিরের তহবিলে অর্থ-সম্পদ জমা হতে থাকবে। অর্থাৎ ইমরান একাই উভয়ের ব্যবসার ঝুঁকি এবং উদ্ভূত যে কোন ক্ষতি বহন করতে থাকবে। এটাকেই অর্থনৈতিক শোষণ বলা হয়।

বর্তমানে ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণ সংস্থাগুলি কে কত কম সুদের হারে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করছে সেই প্রতিযোগিতাকে কোনভাবেই মুক্ত ও স্বচ্ছ বাজারের প্রমাণ হিসাবে ধরা যায় না। বরং এ ধরনের প্রতিযোগিতাকে ভাড়াটে খুনীদের দর কষাকষির সাথে তুলনা করা যায়। হতদরিদ্র এলাকা থেকে ব্যাংকগুলি সব সময় অন্যত্র চলে যায়, কারণ তারা গরিবদেরকে টাকা ধার দিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না।

চলুন এবার আমরা ফিরে যাই রসুলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্‌র (হাদীস) মাঝে এবং দেখি সেখানে রিবার প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা কিভাবে দেয়া হয়েছে। একাজ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই রিবা বহু ধরনের হতে পারে, সুদে টাকা ধার দেওয়া তার মধ্যে একটি। নিঃসন্দেহে রিবার সত্তরটি প্রকারভেদ রয়েছে, যার অধিকাংশ রূপই বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

১ এই ঋণদান পদ্ধতিতে নিজস্ব কোন শ্রম, চেষ্টা-সাধনা বা ঝুঁকী ছাড়াই সময় বাড়ার সাথে সাথে ঋণদাতার বিনিয়োগকৃত মূলধন আপনা আপনিই বৃদ্ধি পায়। এই রিবা হলো ঠিক সে ধরনের রিবা যা কুর'আনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং লেনদেনই হলো রিবা।

বিভিন্ন প্রকারের রিবা

রিবার নিম্নলিখিত প্রকারগুলি উলে[?]খযোগ্য:

১। সুদে টাকা ধার দেয়া; এটাকে রিবা আল-ফাদ্‌ল বলা হয়; অর্থাৎ ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশন (বায়' মুয়াজ্জাল) বা টাকা ধার রেখে জিনিস বিক্রি করা।

২। জিনিসের মূল্য পরিশোধ করতে সময় নিলে (অর্থাৎ বাকিতে মাল কিনলে) সেই বিবেচনায় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়া। এধরনের ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশনকে রিবা আন-নাসিয়া বলা হয়।

৩। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এমন ছলচাতুরী ও প্রতারণামূলক ক্রয় বিক্রয় যেখানে ন্যায্য, স্বচ্ছ ও মুক্ত বাজারের কোন তোয়াক্কা করা হয় না। এটাকে গারার (gharar) বলা হয়, এবং এটাও কয়েক প্রকারের হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ফাটকা ব্যবসা, যাকে 'পরিশীলিত জুয়া' বললে ভুল হবে না। বহু সাধারণ মানুষ এধরনের ব্যবসার মাধ্যমে রিয্‌ক অন্বেষণ করে, কিন্তু লুটেরা ধনীরা এই জুয়ার মাধ্যমে তাদের সেই রিয্‌ক শোষণ করে নিয়ে যায়।

৪। নিলামের সময় দালারদের সাহায্যে কৃত্রিম উপায় জিনিসের দাম বাড়ানো; অর্থাৎ এভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত বাজারকে কলুষিত করা।

৫। মাল গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন করা; অর্থাৎ মুক্ত বাজারকে দুর্নীতিতে আক্রান্ত করা।

৬। একচেটিয়া ব্যবসা, যার কারণে পণ্যের মূল্য মুক্ত বাজারের পরিবর্তে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

৭। বাকিতে বিক্রি করার কারণে পণ্যের দাম বাড়ানো (নাসিয়া), এবং পরবর্তীতে সেই ঋণ কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা। এতে মালের বিক্রেতা ও তৃতীয় পক্ষ দুজনেই লাভবান হয়।

[উদাহরণ- ক একটি ১০০ টাকার পণ্য খ-কে ১ মাস পর মূল্য পরিশোধের শর্তে ১৫০ টাকা দিয়ে বিক্রি করলো। ক এই ঋণের দলিল গ-কে দিয়ে ১৪০ টাকা নিল। ১০ টাকা হলো ডিসকাউন্ট। মাস শেষে গ, খ-এর কাছ থেকে ১৫০ টাকা নিবে। ফলে এখানে ক ও গ উভয়েই লাভবান হল খ-এর শ্রমের বিনিময়ে।]

কোন্‌ ধরনের রিবা সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক?

সর্বজ্ঞানী আল[?]াহ্‌ তা'আলা রিবার যে বিশেষ ধরনকে কুর'আনে উলে[?]খ করেছেন, নিশ্চিতভাবে সেটিই রিবার সর্বাধিক ক্ষতিকর রূপ। কেননা এ ধরনের রিবাই মানবজীবনকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। বলা বাহুল্য, সুদের লেনদেনই হচ্ছে এই বিশেষ রিবা। আর এই সুদজড়িত রিবাই আজ সমগ্র মানবজাতিকে তার বিষাক্ত আলিঙ্গনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেধে নিয়েছে। সুদী রিবাকে আইন সম্মত করে নেয়ার কারণে এটা আরও অধিক মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, কারণ এটাই হলো আইনের আশ্রয় নিয়ে চুরি করার শামিল। অবশ্যই আইনসম্মত চুরির আরও অনেক প্রকার রয়েছে।

রিবা এবং মুক্ত বাজার

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ন্যায্য ও মুক্ত বাজারকে পাশ কাটিয়ে, দুর্নীতি কিংবা অবৈধ উপায়ে যত প্রকার আর্থিক লেনদেন চলে তার সবই রিবার অন্তর্ভুক্ত। মুক্ত, স্বচ্ছ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বাজার যে কোন কারসাজির কবলে পড়লে দুর্নীতির সুত্রপাত হতে বাধ্য যা ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে দেয়, অর্থনৈতিক শোষণের পথ খুলে দেয়, এবং সমাজকে দারিদ্র্য, দুঃস্থতা এমনকি দাসত্বের দিকে নিয়ে যায়।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের Merchant of Venice নাটকের খলচরিত্র ইহুদি সুদখোর শাইলকের পর, এই মানবজাতির আর কখনো হয়নি।

আজকের সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ঘৃণা ও নিন্দা জানাতে আমরা খুবই কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছি। তবে আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (স) এর চেয়ে কত বেশী কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমরা অবশ্য ঠিক সেই ভাষা ব্যবহার করেছি যা ঈসা (আ) রিবাকে নিন্দা করতে গিয়ে ব্যবহার করেছিলেন।

আর ঈসা (আ) মাসজিদুল আকসায় গেলেন এবং মাসজিদে যারা কেনা বেচায় ব্যস্ত ছিল তাদের সবাইকে বের করে দিলেন। আর সুদী-মহাজনদের (Money Changers) টেবিলগুলি উল্টে দিলেন (যারা সুদের মাধ্যমে জনসাধারনের সম্পদ লুটে নিচ্ছিল) এবং তাদেরকে বললেন; কিতাবে এটা লিখা আছে যে এই ঘর আল্লাহর ইবাদতের ঘর কিন্তু তোমরা একে চোরের আস্তানা বানিয়ে রেখেছ। (ইঞ্জিল, মথি, ২১:১২-১৩)।

মুক্ত ও স্বচ্ছ বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে যা অত্যাবশ্যকীয় তা হলো:

- বাজারে প্রবেশাধিকারের স্বাধীনতা;
- বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতা;
- বাজারে নিজ নিজ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা (কোন পণ্যের মূল্য পূর্বনির্ধারিত হতে পারে না);
- বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange) বেছে নেয়ার স্বাধীনতা, (যেখানে কাগুজে মুদ্রাসহ যে কোন কৃত্রিম মুদ্রা নেবার উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, বস্তুত মুক্ত বাজার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে হলে কাগুজে মুদ্রাসহ যে কোন কৃত্রিম মুদ্রার নিষিদ্ধকরণ);
- (বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে) যে কোন পণ্য তৈরী করার স্বাধীনতা;
- যে কোন পণ্য কেনা এবং বিক্রি করার স্বাধীনতা; (অবশ্যই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত বাজারে সেই সকল পণ্য বেচা-কেনা করা যাবে না যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (স) হারাম বলে চিহ্নিত করেছেন);
- বাজার দর থেকে মূল্য বাড়িয়ে বা কমিয়ে পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ;
- ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণা নিষিদ্ধকরণ;
- বাজারকে এড়িয়ে ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ, যেমন সুদী ঋণদান;

– ধোঁকাবাজি ও চুরি নিষিদ্ধকরণ।

গ্যাট (GATT) নামের একটি সংস্থা যা বিশ্ব বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিয়ম কানুন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি সিস্টেম এর ভিত্তি হলো প্রকৃত মুদ্রার (স্বর্ণ মুদ্রার) সাথে বিনিময়ের অযোগ্য (non-redeemable) কৃত্রিম কাগুজে মুদ্রা যা মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রতিনিয়তই তার নিজস্ব মূল্য হারাতে থাকে। আর ইন্টারেস্ট ভিত্তিক ব্যাংকিং এর সার্বজনীনতার দিকে তাকালে বোঝা যায় স্বচ্ছ ও ন্যায় ভিত্তিক মুক্ত বাজারের লেশমাত্রও বর্তমান বিশ্বে আর অবশিষ্ট নেই।

বর্তমানে যত ধরনের রিবা রয়েছে তা সমূলে উৎপাটনের কঠোর বিধি নিষেধ এবং আইন বিধান প্রয়োগে বৈষম্যহীন বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বচ্ছ ও সুবিচার মূলক মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠা ও টিঁকিয়ে রাখার প্রশ্নই উঠে না। রিবা নির্মূলের সকল সমাধান এবং রিবা ভক্ষণ করে আইন-বিধান লংঘনের কার্যকর দন্ডবিধি যথাযথভাবে সবই রয়েছে ইসলামে!!

ইসলামে রিবা হারাম হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থ ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয় রোধে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ মুক্ত বাজার অর্থনীতি গঠন করে তার ক্রমোন্নতি সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যেমন দুনিয়াবাসী ইসলামে চুরির শাস্ড়ির বিধান থেকে বুঝে নিতে পারে যে চুরি প্রতিরোধে চুরির শাস্ড়ি কতটা বৈষম্যহীন এবং শান্ড়ি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কতটা কার্যকর।

আইশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসুল (স) এর কাছে একজন চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলে, তিনি চোরটির হাত কেটে দিলেন। যারা চোরটিকে ধরে এনেছিলেন তারা বললেন, আমরা ভাবতেও পারিনি যে আপনি চোরটির শাস্ড়ির ব্যাপারে এতটা কঠোর হবেন। উত্তরে রসুলুল□াহ্ (স) বললেন: *আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো তাহলে তার হাতও আমি কেটে দিতাম*। (সুনানু নাসাঈ ৫:৪৮৯৬)।

চুরির দায়ে হাত কেটে দেয়ার ইসলামি এই বিধান কার্যকর হলে, রাস্ড়াঘাটে বহুলোককেই দেখা যেত যাদের হাত নেই। অর্থনৈতিক নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্ড়ি প্রতিষ্ঠায় চুরির দায়ে ইসলামের এই কঠোর বিধান অত্যাবশ্যকীয়। ইসলামি এই বিধান কার্যকর হলে বিশ্বমানবতার চিরশত্র" লুণ্ঠনকারী পুঁজিপতিদের শোষণ নির্যাতন বহুলাংশে কমে যেত এমনকি বন্ধও হয়ে যেতে পারতো। ফলে দেখা যেত হাতবিহীন বহুলোক বর্তমান যুগের শেয়ার বাজার (Wall Street) পরিত্যাগ করেছে।

এ গ্রন্থের অন্যতম প্রধান যে যুক্তি তাহলো, সফল শিক্ষাভিযান এবং বিপ□বাত্মক অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলিমরা 'দার"ল ইসলাম' (কুর'আনের আইন বিধান সম্বলিত ইসলাম অধ্যুষিত এলাকা) পুনর"দ্ধারে সক্ষম না হলে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও মুক্ত বাজার

কখনোই পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না। মুক্ত বাজার পুনরুদ্ধার তখনই সম্ভব যখন মুসলিমরা কোন রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে এবং সে রাষ্ট্র চলবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কুর'আন ও হাদীসের বিধান মত। তাছাড়া দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে সে এলাকায় পুনরুদ্ধার হবে মুক্ত বাজার, ফিরে আসবে রিবামুক্ত (সুদমুক্ত) অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা। আর সে রাষ্ট্রে সর্বস্তরে রিবা বর্জন বিষয়টি কালের স্বাক্ষী হয়ে থাকবে।

ঋণ পরিশোধের সময় অতিরিক্ত অর্থ লেনদেন যে উপায়ে হালাল বা বৈধ হয়।

ঋণ পরিশোধের সময় দেনাদার পাওনাদারকে কোন্ অবস্থায় ঋণের আসল পরিমাণের সাথে কিছুটা বাড়তি অর্থ প্রদান করতে পারেন এ বিষয়ে এবার আলোচনায় আসা যাক। তবে এই বাড়তি অর্থের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি মাফিক কিংবা ঋণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে না। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তিতে পাওনাদারের কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ না পেলে এবং দেনাদার খুশী হয়ে যে পরিমাণ অর্থ দান করবে তা রিবার পর্যায়ে পড়ে না। এ বিষয়ে আমরা জানতে পারি রসুল (স) এর নিজের জীবনের একটি ঘটনা থেকে–

জাবির (রা) বলেছেন, আমি একদিন রসুলুল্লাহ্ (স) এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মাসজিদে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "দুই রাকাত সলাহ্ আদায় কর"। তারপর তিনি আমার কাছ থেকে নেয়া ঋণের টাকা ফেরত দিলেন এবং আরো বাড়তি কিছু অর্থ আমাকে দিলেন। (সহীহ বুখারী ৪:২২২৯)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই বোঝা গেল যে, ঋণ দিয়ে মূলধনের চেয়ে চুক্তিমাফিক অতিরিক্ত যে কোন পরিমাণ অর্থ আদায় করাই রিবা। আর চুক্তি, শর্ত ও ঋণদানের সাথে সম্পর্কহীন বাড়তি অর্থ প্রদান রিবার পর্যায়ে পড়ে না।

মুনাফা বা সুদ কত হলে তাকে রিবা বলা যাবে–

কুর'আনের সর্বশেষ আয়াতে (২:২৭৮) আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন: *তোমাদের কাছে যে রিবা (সুদ) এখনও বাকী আছে তা ছেড়ে দাও (যে সকল ঋণ, রিবাকে হারাম ঘোষণার পূর্বে দেয়া হয়েছিল)। আর যদি তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই পাওনা*। লক্ষ্য করুন, এখানে মূলধনের সাথে সার্ভিস চার্জ কিংবা যুক্তিযুক্ত হারে ইন্টারেস্ট বা সুদ মিলিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে কিংবা পাওনা ফেরত নিতে কিন্তু বলা হয়নি।

সুদের পরিমাণ কম-বেশীর (১%-২৫%) কোন প্রশ্ন নয় বরং ঋণ চুক্তির শর্ত হিসেবে মূলধনের অতিরিক্ত যে কোন হারে অর্থ আদায়ই হলো রিবা (সুদ)। ধরা যাক, একটি গ্লাসে কাউকে হুইস্কি (মদ) পান করতে দেয়া হলো। গ্লাসে মদের পরিমাণ খুবই অল্প তাই বলে সে মদটুকু একজন মুসলিমের জন্য হালাল হতে পারে কি? অথবা ধরুন

আপনাকে ছোট্ট এক টুকরা শুকরের গোস্ড় খেতে দেয়া হলো -আপনি কি সেটা খাবেন বা তা কি হালাল? আসলে মদ কিংবা শুকরের গোস্ড় কম বেশী যা-ই হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। রিবা ভক্ষণ, মদ্যপান এবং শুকর খাওয়া হারাম এটাই হলো ইসলামের চুড়ান্ড় ফায়সালা।

মুসলিম বিশ্ব আজ লোভ ও শখের বশে অতি কৌতুহলী হয়ে অদ্ভুত অস্বাভাবিক বিবিধ ফিৎনার সম্মুখীন হয়েছে। ভীষণ আফসোসের ব্যাপার যে, বর্তমান ব্যাংকিং পদ্ধতিতে যে কোন 'মুনাফা' (Interest) অর্জন যে রিবা (সুদ) এই সহজ-সত্য বিষয়টি সাধারণ মানুষের তো বটেই এমনকি কথিত ওলামা ও ইসলামিক স্কলারগণের কাছেও রিবা হারামের বিষয়টি যথাযথ গুর"ত্ব পায়না! আর খ্রীষ্টানরাতো ইতিমধ্যেই দ্বিধাহীনভাবে অভ্যস্ড় হয়ে পড়েছে রিবা ভক্ষণে। এটা যে তাদের জন্যও হারাম ছিল এ কথা তারা ভুলেই গিয়েছে। অথচ যে কেউ রসুলুলাহ্ (স) এর বিশদ বিবৃতি মূলক হাদীস অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে বিষয়টি এতদিনে দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কথা। আর এ সকল ইসলামিক স্কলারগণের স্মরণ রাখা উচিৎ যে কুর'আনের তর্জমা ও ব্যাখ্যা শিক্ষাদানের জন্য আলাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (স) কে পাঠিয়েছেন। এসব কথিত স্কলারগণকে যেমন পাঠাননি তেমনি পাঠাননি সৌদি অ্যারেবিয়ান মনিটরি এজেন্সিকেও (SAMA - Saudi Arabian Monetary Agency) -যারা সমস্ড় সৌদী পেট্রোডলার উজার করে সুদী বিনিয়োগ করে সব পশ্চিমা ব্যাংকগুলিতে। যেসব ব্যাংকগুলি এমন এক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যারা ইসলামের প্রধান শত্র"।

আবদুলাহ্ ইউসুফ আলী (রহ) এর ইংরেজী ভাষায় কুর'আনের তর্জমা ও তাফসীরটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তথাপিও তিনি পূর্বের এবং বর্তমানকালের উলামাদের দেয়া রিবার সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার মতে রিবার সংজ্ঞা হওয়া উচিত অযৌক্তিক মুনাফা অর্জন, কিন্তু সেসব উপায়ে নয় যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ যেমন -সোনা, রূপা এবং বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী গম, বার্লি, খেজুর এবং লবন রসুল (স) এর খাদ্য তালিকা অনুযায়ী। তিনি বলেন, ইকোনমিক ক্রেডিট, বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বাদে সকল মুনাফা অর্জন আমার দেয়া রিবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত।

নিশ্চিত বলা যায় আবদুলাহ ইউসুফ আলি (রহ) রিবার সংজ্ঞাদানের ব্যাপারে সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছেন। কুর'আন অবশ্যই বর্ণনা করেছে যে মূলধনের অতিরিক্ত বৃদ্ধিই রিবা (সুদ)। যেমন যে মূলধন ধার দেয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ বেড়ে যাওয়া (৩:১৩০)। তবে ব্যবসায় বাড়তি লাভকে কখনো রিবার (সুদ) সংজ্ঞায় ফেলা হয়নি। ব্যবসাকে রিবা না কুর'আনে বলা হয়েছে, না বলেছেন রসুলুলাহ্ (স)। মূলত 'মূলধন' যা কর্জ দেয়া হয়েছিল, এই কর্জ বাবদ ঋণপত্রের শর্ত হিসেবে যে কোন সুযোগ-সুবিধা তা কম-বেশী যা-ই হোক না কেন তা আদায় করাই হলো রিবা। ব্যাংক কিন্তু কখনো দয়া করে কর্জ দেয় না এবং ব্যাংক কর্জা বা ঋণদান করে যে ইন্টারেস্ট

কামায় তা দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফিতির ক্ষতি পূরণও করে না। ব্যাংক ঋণ দেয় শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট অর্জনের জন্য। ব্যাংক ঋণদান করে বিশাল মুনাফা অর্জন করে। ব্যাংক ঋণদানের বিপরীতে মুনাফা অর্জনের শোষণ চালায়। একইভাবে ইকোনমিক ক্রেডিট হলো বর্তমান ব্যাংকের সৃষ্টি, যা নিশ্চিতভাবে রিবা, হোক এই ইন্টারেষ্টের হার কম কিংবা বেশী, জটিল কিংবা সরল। ইউরোপ, আমেরিকা তথা ইহুদি ব্যাংকিং এর সফলতা মূলত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের এক জ্বলন্ড় উদাহরণ। সে কারণে আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) বর্ণনায় রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *তুমি যদি কাউকে কর্জা দাও আর সে যদি তোমাকে একবেলা খাওয়াতে চায়, তুমি তা খাবে না। কেননা এটা রিবা। যদিনা কর্জদানের পূর্ব থেকেই তোমাদের পরস্পরে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর অভ্যাস থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি খেতে পারবে।* রসুল (স) আরো বললেন: *তুমি যদি কাউকে কর্জ দাও, আর সে যদি তোমাকে তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তুমি তাতে আরোহণ করবে না, কারণ এটি রিবা যদি পূর্ব থেকেই তোমাকে তার যানবাহনে চড়ানোর অভ্যাস থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে তুমি তার যানবাহনে চড়তে পার।* (সুনান বায়হাকী)

–অন্য এক হাদীসে আনাস (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কর্জ দেয় সে তার থেকে কোন হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতে পারবে না (তবে কর্জা পরিশোধ হয়ে গেলে হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে)*। (সহীহ বুখারী)।

-আবু বারদাহ্ বিন আবু মুসা (রা) বলেছেন: *আমি মদিনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা) (যিনি ইহুদি ধর্মযাজক ছিলেন অতপর ইসলাম কবুল করেন) এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন "তুমি এখন এমন এক দেশে বাস করছো যেখানে রিবা (সুদী) লেনদেনের প্রচলন অত্যন্ড় বেশী। তাই কেউ যদি তোমার কাছে ঋণী থাকে, আর সে যদি তোমাকে এক বস্ড়া যব তোহফা দেয়, তুমি তা নিবে না, এমনকি সামান্য একবোঝা খড়ও যদি দেয় তাও গ্রহণ করবে না। কারণ এটা রিবা*। (সহীহ বুখারী)।

–ফাদালাহ্ বিন ওবাইদ (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *কর্জ দিয়ে তা থেকে যে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করাই রিবা (সুদ)*। (সুনান বায়হাকী)।

আবু উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত রসুল (স) বলেছেন: *যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোন সুপারিশ করলো, আর এ জন্যে সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া (উপহার) দিল এবং সে তা গ্রহণ করলো তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাগুলির মধ্যে একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো*। (আবু দাউদ, আহমাদ)।

পূর্ববর্তী যুগে সৃষ্ট রিবার ভয়াবহতাকে আরো গভীরে ও খারাপীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রয়েছে একটি মারাত্মক ভুল। যা করেছিলেন শেখ মুহাম্মদ আবদুহ রেক্টর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর (বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ) তিনি উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, বর্তমান ইউরোপে তিনি ইসলামকে খুঁজে পেয়েছেন যদিও

সেখানে মুসলিম নেই। অথচ মিশরে মুসলিম আছে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না ইসলাম। অত্যন্ড় লজ্জার বিষয় যে ম্যালকম এক্স (Malcom X) এর মত ব্যক্তিত্বও কখনও এ ধরনের অবাস্ড়ব এবং আজগুবী মিথ্যা উক্তি করতে পারতো না।

যে ইউরোপ মুহাম্মদ আবদুহ দেখেছেন সেটা ছিল সদ্য প্রত্যক্ষ করা ফরাসী বিপ□বোত্তর (French revolution) ইউরোপ। এই ফরাসী বিপ□ব গঠন করেছিল সামাজিক একটি আবর্তনের কেন্দ্র বিন্দু। সে আবর্তন ছিল পশ্চিমা ইউরোপীয় সভ্যতাকে খ্রীষ্টবাদ থেকে রূপান্ড়র করে পুরোপুরি নাস্ড়িকতায় ফিরিয়ে নেয়ার।

যে ইউরোপে আবদুহ ইসলাম দেখেছেন বলে উক্তি করেছেন তা ছিল ইউরোপে শয়তানের অনিষ্ট, কুদৃষ্টি, ফিৎনা ও অপক্ষমতা বিস্ড়ারের প্রথম টার্গেট। এই ফিৎনার যুগে শয়তানকে আল□াহ্ ছেড়ে দিয়ে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছেন কতটা বিপর্যয় সে ঘটাতে পারে দেখার জন্য। রসুলুল□াহ্ (স) বলেছেন কিয়ামাতের পূর্ববর্তী যুগ হলো ফিতানের যুগ। ফিতান হলো ফিৎনার বহুবচণ। যার অর্থ–পরীক্ষা, প্রলোভন, কুকর্মে প্ররোচনা, বিমুগ্ধকরণ, রাজদ্রোহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মতভেদ-বিবাদ। হাদীসে বর্ণিত আছে ইয়াজুজ - মা'জুজ যখন ছাড়া পাবে তখন তারা প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে দলে দলে নেমে আসবে এবং অদৃশ্য ক্ষমতা বলে তারা সারা দুনিয়ায় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ছড়িয়ে দেবে। সারা বিশ্ব তখন শয়তানী নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় অনিষ্টকারী দুষ্টশক্তি, ইয়াজুজ-মা'জুজকে আটকে রাখার জন্য জুলকারনাইন যে প্রাচীর তৈরী করেছিলেন, সে প্রাচীর আল□াহ্ তা'আলা ভেঙ্গে দিয়েছেন। সে প্রাচীর ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অনিষ্টকারী শয়তানী শক্তি ছাড়া পেয়ে গেছে। আর তাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কাজ নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনার বিস্ড়ৃতি ঘটানোর মিশন বাস্ড়বায়িত হয়ে চলেছে। তবে চুড়ান্ড় ফলাফল ততদিন পর্যন্ড় বাস্ড়বায়িত হবে না যতদিন না সত্যিকার ঈসা মসীহ অবতরণ করে ভন্ড মসীহ্ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং জীবানু যুদ্ধের মাধ্যমে স্বয়ং আল□াহ্ তা'আলা ইয়াজুজ মা'জুজকে ধ্বংস করে দিবেন।

ফলে ইউরোপের স্রষ্টা বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি, নতুন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে যারা ঘোষণা দিয়েছে, আল□াহ্ নয়, গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের প্রতিনিধি, সরকারই (State) সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (নাউজু বিল□াহ্)। এটা শির্ক! অবশ্যই এটা চরম শির্ক। এই শির্কের ভিত্তি হলো বস্তুবাদ যা আধুনিক সভ্যতার নতুন দর্শন।

বস্তু ছাড়া অন্য কোন বাস্ড়বতার উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হলো বস্তুবাদের প্রকৃত সংজ্ঞা। অথচ সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মিশরীয় মুহাম্মদ আবদুহ দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ইউরোপের আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার দর্শন।

তিনি ভন্ড, প্রতারক ও মিথ্যেবাদী দাজ্জলের অভিনয় দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন, তাই তিনি জাহান্নামের রাস্ড়াকে মোহগ্রস্থ ও বিভ্রান্ড় হয়ে দেখেছিলেন জান্নাতের রাস্ড়ার মত। আর তার বিভ্রান্ড় মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা মুসলিম বিশ্বে। তবে ভারতীয় ডক্টর মুহাম্মদ (আলামা) ইকবালকে শায়তান বিভ্রান্ড় করতে পারেনি।

আর ইদানিংকালের ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপীয় সমাজের মিথ্যার মুখোসে কৃত্রিম সঠিক পথের বাহ্যিক আবরণ দেখেই আবদুহ মোহগ্রস্ড় ও বিভ্রান্ড় হয়েছিলেন। তিনি টেরই পাননি যে ফরাসী বিপবের কারণে ইউরোপীয় অর্থনীতি সত্য পথ ছেড়ে দেয়ার কারণে সঠিক দিক নির্দেশনা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে। ক্যাথলিক চার্চগুলি প্রায় পাঁচশত বছর রিবার বির—দ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে স্বকিয়তা হ্যারিয়ে শেষ পর্যন্ড় ধর্মনিরপেক্ষতা তথা স্রষ্টা বিমুখতার মাঝে হারিয়ে গেছে। বর্তমান পুঁজিবাদী ইউরোপীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে রিবার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় ব্যাংকিং এর মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক অত্যাচার-নিপীড়নের যে বুনিয়াদ গঠিত হয়েছিল তা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মিশরীয় আবদুহ। তার চোখের সামনে পর্দা থাকার ফলে তিনি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নির্যাতন দেখতে পান নি। স্রষ্টা বিমুখ ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ তিনি এখনো টের পাননি। তাই আজো তিনি বলছেন এসব নির্যাতনের উপস্থিতি সেখানে ছিল না। এটা আসলে তার ভিমরতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উপরন্তু তিনি মিশরে পৌঁছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করে মিশরীয় পোস্ট অফিসে রিবা বা সুদী লেনদেন যুক্ত সঞ্চয়ী হিসাব প্রবর্তণের ব্যবস্থা করেন। আর রায় (ফতোয়া) দেন যে এই পদ্ধতির লেনদেন সন্দেহাতীতভাবে রিবামুক্ত (নাউযু বিলাহ্)।

পূর্বেই উলেখিত হয়েছে যে, ইন্ডিয়ান স্কলার ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল শায়তান কর্তৃক বিভ্রান্ড় কিংবা প্রতারিত হন নি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ইসলামি সমাজ ও সভ্যতা ক্রমশই ইসলামের মূলনীতি ও মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতির পথে চলে যাচ্ছে। তথাপিও সত্য দ্বীন ইসলামের এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা ইনশাআলাহ্ পুনর—দ্ধার সম্ভব। যখন তিনি ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করলেন, তখন তার কাছে তাদের সাধারণ মানুষের চরিত্রের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে ফুটে উঠেছিল তাহলো-সততা, বিশ্বস্ড়তা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যমী প্রবণতা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। তবে নীতিগত দিক থেকে পাশ্চাত্য সমাজের কোন বিষয়ই তার নিজ জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। উপরন্তু তিনি আরও লক্ষ্য করলেন পাশ্চাত্যের সমাজে এ সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে তাদের মাঝে বিভ্রান্ড়িকর এক অহমিকাবোধ জেগে উঠেছে। তাই তাদের মাঝে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বড়ত্বের বড়াই। তদুপরি ইউরোপীয় সমাজে আরো যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান তা হলো লুণ্ঠনকারী পুঁজিপতি ধনীদের স্বার্থে নিরীহ গরীবদের বঞ্চিত করার তীব্র প্রবণতা। আর গরীবদের অত্যাচার ও বঞ্চনার মূলে রয়েছে ধ্বংসাত্মক রিবা। বস্তুত

লক্ষ্যনীয় যে, মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের সর্বাধিক বড় বাধা হলো আজকের ইউরোপ এবং ইউরোপীয় অধিবাসীদের জীবনধারা।

শেখ তানতাওয়ী (Sheikh Tantawi) মিশরের বিগত সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত মুফতী যিনি বর্তমানে শেখ আল-আযহার এবং শেখ আল-গায্যালী (রহ) উভয়েই নিউ ইয়র্কের বর্তমান যুগের অতিথি, তারাও ঠিক একইভাবে বিভ্রান্ড় হলেন যেভাবে হয়েছিলেন আবদুহ। আর তারাও যুক্তি দিয়েছেন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রিবা নয়। এসব বিভ্রান্ড় লোকগুলি যা-ই করুক না কেন মিশরের বহু বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার রয়েছেন যাদের কথা আমরা কখনই ভুলে যেতে পারব না। তারা হলেন এমন ক'জন যারা রিবার বির—দ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে সত্যের পথে শক্তিশালী প্রচারণা চালিয়ে গিয়েছেন। তারা জোরালো বিবৃতি চালিয়ে যাচ্ছেন যে বর্তমান ব্যাংকিং লেনদেন অবশ্যই 'রিবা'। এ সকল স্কলারদের মাঝে একজন হলেন নিরপরাধ অন্ধ শেখ উমর আবদুল রহমান। তিনি চরম অত্যাচারিত হয়ে সীমাহীন মূল্য দিয়েছেন রিবার বির—দ্ধে জিহাদ (বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম) করার দায়ে। তিনি বর্তমানে আমেরিকার কারাগারে। যে অপরাধে যাবজ্জীবন কারাভোগ করছেন তা হলো পুঁজিবাদীদের অত্যাচার, নিপীড়নের বির—দ্ধে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ইসলামের দাওয়াতী মিশন পরিচালনা।

বর্তমান ফিৎনার যুগের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ইসলামিক স্কলাররা বাস্ড়বতাকে সঠিকভাবে অনুধাবনে অদ্ভুত এক ধরনের সমস্যা ও অসহায়ত্ব বোধ করছেন।

আবদুহ কট্টর জাতীয়তাবাদী সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। একইভাবে আবদুহ আবার প্রভাবিত করেছিলেন তার শিষ্য শেখ রশীদ রিদাকে। হতে পারে তারা সরল প্রাণ নির্বোধের মত মিশরীয় অর্থনীতিতে রিবার (সুদের) বিষাক্ত বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে অত্যাচার নির্যাতনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যা ক্রমশ বিষক্রিয়া ছড়িয়ে মিশরের অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে থাকে। আবদুহ আর তার শিষ্য রশীদ রিদার মাধ্যমে মিশরে রিবার যে বিষাক্ত বীজ ঢুকেছিল তাই বর্তমানের ধ্বংসপ্রাপ্ত মিশরীয় অর্থনীতির চরম পরিণতি। এই নির্বোধ দু'টি লোক মিশরে রিবা ঢুকিয়ে শুধু যে মিশরীয় অর্থনীতিকে পচিয়ে দিয়েছিলেন তা নয় বরং মিশরীয় সুদী অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে পোষমানা গ্রহপালিত প্রাণীর ন্যায় সকলেই অনুকরণ করে অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে। ফলে সারা মুসলিম বিশ্বে রিবার অবাধ প্রচলন ঘটে। আর রিবার বিষাক্ত দুষণ দ্র—ত ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম দুনিয়ায়।

কোন কোন ইসলামি স্কলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে, যেসব মুসলিম, অমুসলিম দেশে বসবাস করেন, তারা যেন ব্যাংক থেকে পাওয়া রিবা (সুদ) যুক্ত অর্থ বর্জন না করেন। বরং তারা সেসব সুদী অর্থ গ্রহণ করে গরীব দুঃখীকে দান করে দেয়াই উত্তম। এসব ইসলামি স্কলারগণ এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন যা অত্যন্ড় আপত্তিকর ও বিভ্রান্ড়িকর। যেমন তারা বলেন অমুসলিম দেশে শারি'আতের বিধি বিধান প্রযোজ্য

নয়। প্রকৃতপক্ষে শারি'আতে "অমুসলিম দেশ" বলে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। বরং দারুল ইসলাম (মু'মিন দ্বারা পরিচালিত অঞ্চল যেখানে আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রসুল (স) এর আইন বিধান পালন করা হয়) এবং দারুল হারব (দারুল ইসলামের বিপরীতে অবস্থানরত কুফর রাজ্য) ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহ) যে অঞ্চল দারুল ইসলামের সাথে শান্তির এবং যুলুম নির্যাতন বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ সে অঞ্চলকে দারুল আহ্দ নামে অভিহিত করেছেন।

আমরা মনে করি এসব স্কলারদের মুসলিম-অমুসলিম দেশ এধরনের অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত পরিভাষা বাদ দিয়ে উচিৎ হলো "দারুল ইসলাম" ও 'দারুল হারব' এর মত পরিস্কার ও উৎকৃষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করা।

যদি অমুসলিম দেশকে 'দারুল হারব' নামকরণ করা হয় তাহলে সেখানে হয়ত রিবা থাকুক বা না থাকুক এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন পড়ে না।

অমুসলিম দেশে সুদী অর্থ দান করে দেয়ার যুক্তিটি কোন কোন ক্ষেত্রে আপত্তিকর ও ভ্রান্তধারণার জন্ম দেয়। আমাদের মনে রাখা আবশ্যক, যে কোন হারাম খাবার কিংবা হারাম অর্থ এক মু'মিন খেতে না পারলে অপর মু'মিন ভাইকে তা কেমন করে খেতে দেয়া যায়? মু'মিন ধনী কিংবা গরীব সেটা প্রশ্ন নয়। আসল কথা হলো যা কিছু হারাম জাতি, বর্ণ, ধনী, গরীব নির্বিশেষে সকল মু'মিনের জন্য হারাম।

ডক্টর জামাল বাদওয়ি একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ইসলামি স্কলার বাড়ী কেনা বা বাড়ী বানানোর মত আবশ্যকীয় কাজে সুদী ঋণ নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এ ব্যাপারে শিথিল ও নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তার মতে অত্যাবশ্যকীয়তার ব্যাপারে বর্তমান সমাজে এতো কঠোরতা আরোপ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা শুধুমাত্র কিছু বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। রিবা ও দারুল হারব এবং রিবা এবং অত্যাবশ্যকীয়তা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এই বই এর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে।

NOTES OF CHAPTER TWO

1. Reprinted by Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 1996.

2. 'The Message of the Qur'an'. Dar al-Andalus, Gibraltar. 1980. Fn. No. 35 to Qur'an:al-Rum:- 30:39.

3. During a panel discussion in a conference on Human Rights held in Kuala Lumpur, Malaysia, in December 1994, Prof. Falk used the term 'legalized theft' to describe predatory capitalism.

4. Translation and Commentary to the Holy Qur'an by Abdullah Yusuf Ali, Note 324 to verse 2:275

5. Cf. R. H.Tawny 'Religion and the Rise of Capitalism'. Pemguin 1926.

6. Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Oxford University Press. London 1934. p. 170.

7. The blind Egyptian Shaikh, Omar Abdul Rahman, was tried and convicted of waging jihad against USA. But, as a blind man he could not be the amir who, alone, is compeetent to declare jihad (declaration of war).

Secondly, when jihad is declared then that territory in which it is to be waged is designated dar al-harb (i.e. zone of war). Sheikh Omar never made a pronouncement to the effect that USA was dar al-harb. Thirdly, Muslims are prohibited from residing in dar al-harb. They must vacate it. But Sheikh Omar applied for and was granted US Immigrant Visa (Green Card), thus adopting residence in this country. Fourthly, there is no Friday congregational prayer in dar al-harb for obvious reasons of security. That the Sheikh did not recognize USA as dar al-harb was quite clear! He, himself, led the Friday congregational prayers in USA every Friday until he was imprisoned. He is thus innocent of this charge brought against him! But this elementary explanation in this footnote could not reach the jury which decided his guilt on the charge brought against him because the judge ruled that no experts on Islam could testify! What a travesty of justice!

8. I posed the question to him at a meeting we both attended at the invitation of ISNA (Islamic Society of North America) which was held in Indianapolis in June 1995.

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কুর'আনে রিবা নিষিদ্ধকরণ (হারাম ঘোষণা)

ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধীরে ধীরে কুর'আনের আয়াত নাযিল হয়ে রিবা হারাম হওয়ার চুড়ান্ড় ঘোষণা পৌছে গেছে।

রিবাকে হারাম ঘোষণার আয়াতগুলিকে প্রধানত তিনটি স্ড়রে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম স্ড়র - রিবার বিবিধ ধ্বংসাত্মক দিক আলোকপাত করে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতে তখনও রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি এবং বেশ নরম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এই আয়াত নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই ছিল রিবার কুফল সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষাদান করা।

দ্বিতীয় স্ড়র - এ স্ড়রে রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয় এবং সুদখোরদেরকে ভয় দেখানো হয়। পূর্বের আয়াতকে উলে্খ করার মাধ্যমে রিবার কুফল বিষয়ে শিক্ষাদান অব্যাহত থাকে। এ আয়াতে এমন সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যাতে করে মু'মিনগণ রিবা সৃষ্ট অর্থনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন, বিকৃত ও বিপর্যস্ড় অর্থ ব্যবস্থা ও অন্যান্য কুফল চিহ্নিত করতে পারে এবং রিবার (সুদের) প্রতি আপনা থেকেই তাদের মধ্যে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে তাদের মাঝে রিবা বা সুদী লেনদেন বর্জন করার মন মানসিকতা তৈরী হয়।

তৃতীয় স্ড়র - পূর্বের আয়াতের জোড়ালো বক্তব্য আরও ভয় ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখে রিবাকে হারাম করার মাধ্যমে চুড়ান্ড় ঘোষণা দেয়া হয়। এই আয়াতে রয়েছে–

০ রিবা নির্মূলে যুদ্ধের অনুমোদন দেয়া

০ ঋণের সুদ বা রিবা বাতিল করে দেয়ার নির্দেশনা

০ রিবার কুফল বিষয়ে শিক্ষাদান অব্যাহত থাকা

ইসলামের মূলনীতি হলো, কোন বিষয়কে হারাম ঘোষণা করার বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই অনুকূল মানসিকতা ও পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা শুর“ করা। কুর'আনে ধাপে ধাপে রিবা নিষিদ্ধ ঘোষণার পদ্ধতির সাথে মদ্যপান, জুয়া-পাশা খেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম ঘোষণার পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। [মদ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে শুধু এটুকুই বলা হয়েছিল যে: *খেজুর ও আঙ্গুরের মধ্যেও (শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে) তা থেকে তোমরা যেমন নেশাকর (নাপাক) দ্রব্য বের করে আনো, তেমনি তা থেকে উত্তম রিয্কও তোমরা লাভ করে থাক। নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে।* (সূরা নাহল, ১৬:৬৭)। কুর'আনের এই আয়াতে মদ যে অপবিত্র শুধু মাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। অতপর বলা হল এটা অন্যতম কবীরা গুণাহ। এর উপকার কিছুটা থাকলেও ক্ষতির পরিমাণ অত্যাধিক। তৎপরবর্তী আয়াতে সলাহ্ (সালাত) আদায়ের পূর্ব মুহুর্ত থেকে সলাহ্ আদায়কালীন সময় পর্যন্ড় মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা

করা হয়। সর্বশেষ আয়াতে মদ্যপান হারাম হওয়ার চুড়ান্ড় ঘোষণা দেয়া হয় এবং সে ঘোষণা জানতে পারার সাথে সাথে মু'মিনগণ যে মদ্যপান বর্জন করেছিলেন তা তাদের ঈমানী চেতনার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। অনুরূপভাবে রিবা সম্পর্কে প্রথমে এটুকুই বলা হয়েছিল যে রিবা (সুদ) খেয়ে কখনো মাল-সম্পদ বাড়ানো যায় না বরং যাকাত আদায়ে, মাল-সম্পদ বাড়ে (৩০:৩৯)। অতপর দ্বিতীয় পর্যায়ে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাওয়া হারাম ঘোষিত হয় (৩:১৩০)। তৃতীয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সকল প্রকার রিবা হারাম হওয়ার চুড়ান্ড় ঘোষণা দেয়া হয় (২:২৭৫-২৭৮)।]

রিবাকে হারাম ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা কুর'আনে রয়েছে। রিবা বিষয়ে কুর'আনের আয়াত নাযিলের এই পদ্ধতি থেকে গুর"ত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায় যে কিভাবে রিবার বির"দ্ধে ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রতিটি স্ড়রে রিবা যেভাবে জড়িয়ে আছে এ অবস্থায় হুট করে রিবা বয়কটের আন্দোলন পরিচালনা নিঃসন্দেহে এক ধরনের বোকামী। যা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে। বরং কুর'আনে যেভাবে ধাপে ধাপে সচেতন করে মানব-জাতিকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে চুড়ান্ড়ভাবে রিবা বয়কট আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানেও ঠিক একই ভাবে রিবা বয়কট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে, মানবজাতিকে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে যথাযথ শিক্ষাদানের ব্যাপক কর্মকান্ড হাতে নিতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সত্যিকার কারণ ও তার ইসলামি সমাধান বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষা অভিযান চালিয়ে রিবার বিরূদ্ধে ঘৃণাবোধ জাগ্রত করতে হবে। একটুকরা শুকরের মাংস বর্তমান মুসলিমের কাছে যেমন বমনেচ্ছার উদ্রেক করে 'রিবা' ভক্ষণ যে সেই একই রকম ঘৃণিত এবং হারাম এমনকি তার থেকে বেশী ধ্বংসাত্মক এ বিষয়টিই প্রথমেই প্রতিটি মুসলিমের অন্ড়রমূলে প্রবেশ করানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন পর্যন্ড় না আল্লাহ্ তা'আলার রহমাত মুসলিম জাতির উপর বর্ষিত হয় এবং সমাজ থেকে রিবা নির্মূল সম্ভব হয়।

স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন যেভাবে ধাপে ধাপে রিবাকে হারাম ঘোষণা করেছেন সে বিষয়টি ইসলামি আন্দোলনকারী এবং রিবা নির্মূল প্রত্যাশীদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যে কোন ইসলামি রাষ্ট্র যদি রিবা নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে সে বিষয়ে আইন-বিধান প্রণয়ন করার পূর্বেই সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

রিবা মুকাবিলায় কুর'আনী পদ্ধতি-

রিবাকে হারাম ঘোষণার প্রথম ও দ্বিতীয় স্ড়রের আলোচনা হয়েছে কুর'আনের আয়াত দিয়ে। তৃতীয় স্ড়রে রসুলুল্লাহ্ (স) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ রিবা বা সুদ নির্মূলের চুড়ান্ড় ঘোষণাকে নিশ্চিত করে। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *এভাবে জাহিলিয়াতের যুগের রিবা (সুদ) রহিত হয়ে গেল। আর রিবা সমূহের*

মধ্যে যে রিবা আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হলো আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের রিবা (সুদ) যা পুরোপুরিই রহিত হয়ে গেল। তিনি শুধু মুলধন ফেরত নিবেন।

ইব্নে আব্বাস এবং উমর ইবুনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রসুলুল্লাহ (স) এর ওফাতের পূর্বে সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা সূরা বাকারার ২৭৮-২৮১। এই আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর হুসিয়ারীর মাধ্যমে রিবা নিষিদ্ধ করেছেন এবং রিবা গ্রহণ ও প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (স)-এর পক্ষ থেকে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার সময়কাল থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। - বুখারী,

উমর বিন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) এর ইন্তিকালের পূর্বে সর্বশেষ নাযিল হয় রিবা নিষিদ্ধকারী আয়াত সমূহ। সে কারণে মু'মিনগণ এ সকল আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জেনে নেয়ার আগেই নবী (স) কে হারাতে হয়।* (ইব্নে মাজাহ্, দারিমী)[১]।

মূলত রিবা হলো মারাত্মক লুণ্ঠন ও শোষণের হাতিয়ার। রিবা মুসলিমের ঈমান বিধ্বংসী মারনাস্ত্র যা রসুলুল্লাহ্ (স) এর উম্মাহ্র উপর সরাসরি আক্রমন। রিবা বিষয়ক কুর'আনের আয়াত বার বার একটি অন্তর্নিহিত সত্যকেই নির্দেশ করে। আর সে সত্য হলো ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে সবচাইতে ভয়াবহ এবং মারাত্মক আক্রমন আসবে রিবার মাধ্যমে যা মুসলিমদের ঈমানী চেতনাকে প্রচন্ড প্রতাপে নাড়া দিয়ে রিবার প্রভাবে আচ্ছাদিত করে দিবে। যে আক্রমন হবে মুসলিমদের ঈমান (বিশ্বাস), স্বাধীনতা, ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক এবং বিপজ্জনক হুমকী।

রিবাকে হারাম ঘোষণার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'আলা রসুল (স) কে দিয়ে কেন তিন পর্বে রিবা নির্মূলের ঘোষণা দিলেন তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। রিবা নির্মূলের বিষয়টি মূলত ছিল রসুলুল্লাহ্ (স) এর মিশনের সর্বশেষ কর্মকান্ড। গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুসলিম উম্মাহকে রিবা নির্মূলের বিষয়ে বুঝিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা মুসলিমের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি রসুল (স) কে মেনে চলাও সমান গুরুত্বের দাবী রাখে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন[২]।

১ কোন কিছু হারাম ঘোষণার ব্যাপারে কুর'আনে যত সতর্কবাণী রয়েছে তার মধ্যে রিবা বর্জন ও নির্মূলের ব্যাপারে হুশিয়ার বাণী সর্বাধিক কঠোর ও ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর হুশিয়ারী সত্ত্বেও রিবা বর্জনের ব্যাপারটি মু'মিনদের ঈমান ও ইচ্ছাশক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল: *হে মু'মিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের কাছে যে রিবা বাকী রয়ে গেছে তা বর্জন কর যদি সত্যিকার মু'মিন হও। আর যদি রিবা ছেড়ে না দাও তাহলে শুনে নাও- আল্লাহ্ তা'আলা ও রসুল (স) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা।* (২:২৮১)।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন ভয়ানক চ্যালেঞ্জ শুনে যে কোন মু'মিনের অন্তরই নাড়া দেবে। আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে আঁৎকে উঠবে মু'মিনের হৃদয়-মন। আর এই ভয় থেকেই মু'মিন সত্য সঠিক পথ খুঁজে নেয়ার প্রয়াস পাবে। তাছাড়া তারা বোঝার চেষ্টা করবে কিভাবে নৈতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবজীবনের প্রতিটি ধাপে রিবা ভয়াবহ বিষ ছড়িয়ে মানুষের জীবনকে পঙ্গু ও দুর্বিসহ করে দেয়।

২ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা মেনে চলো (আনুগত্য কর) যদি মু'মিন হয়ে থাকো (সুরা আনফাল, ৮:১, আরো দেখুন ৪:৫৯, ২৪:৫৪)।

আল-কুর’আনে রিবা ও অন্যান্য বিধি বিধান সংক্রান্ড় আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয় আল□াহ তা‘আলার যিক্‌র (সার্বক্ষণিকভাবে আল□াহর স্মরণের মাধ্যমে আল□াহর আইন বিধান পালন, এবং সকল চিন্ড় চেতনায় আল□াহকে হাযির নাযির ভাবা) এর মাধ্যমে। মোট কথা সুদের বিষয়ে বুঝতে হলে মানব মনকে পূর্ব থেকেই নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করা প্রয়োজন। আর নূর হলো সত্য-সঠিক জ্ঞান-যার আলোকে মানুষ নিজের ও বিশ্বজগতের নিগুঢ় সত্য জানতে ও বুঝতে পারে। আর মানুষ সত্যকে জানতে বুঝতে পারলে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করতে পারে। ফলে সেই দূরদৃষ্টির আলো দিয়ে চিনে নিতে পারে সঠিক পথ এবং শুর“ করে বিশুদ্ধ কর্মপথে অগ্রসর হওয়ার যাত্রা। মু’মিনের অন্ড়র যখন হিদায়াতের নূর দ্বারা আলোকিত হয় তখন আল□াহ্‌র আইন বিধান পালনে মন মানসিকতা আপনিতেই তৈরী হয়ে যায়। অন্ড়রে হিদায়াতের নূরের অনুপস্থিতি আল□াহ্‌ ও রসুল (স) এর আইন বিধান পালনে বাধার সৃষ্টি করে। রসুল (স) এর নবুয়াতের প্রথম ছয় থেকে সাত বছর সময়কালে রিবা (সুদ) বিষয়ক আলোচনা করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি কেননা তৎকালীন সময়ে সমগ্র আরব জুড়ে ছিল ভয়াবহ সুদী কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রচলন। আল-কুর’আনে রিবা বিষয়ক সর্বপ্রথম আয়াত নাযিল হয় সূরা আর রূম এর ৩৯ নম্বর আয়াতে।

কুর’আনের ভাষায় রিবা বলতে যা বোঝায় তা হলো কর্জ বা ঋণ দিয়ে বিনা পরিশ্রমে বা বিনা ঝুঁকিতে শুধু সময়ের হিসেবে মুনাফা লাভের নামে সুদ খাওয়া। রিবার ক্ষতিকর দিকগুলি আলোচনা করে তৎকালীন মানুষকে সচেতন না করে হঠাৎ করে রিবা নিষিদ্ধ করলে অনেকে এর মর্ম, কারণ ও যুক্তি সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না, তাই আল□াহ্‌ তা‘আলা ধীরে ধীরে মু’মিনের হৃদয়ে হিদায়াতের নূর সৃষ্টির মাধ্যমে রিবার শোষণ ও ক্ষতিকর দিকগুলি অনুধাবন করিয়ে দেন এবং রিবা বর্জনের চুড়ান্ড় নির্দেশ পাঠান। রিবা বা সুদের ভয়াবহ ক্ষতির ব্যাপারে কুর’আনের আয়াত দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে সুদের প্রতি ঘৃণা জন্মানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। যাতে করে মানবজাতি সুদী লেনদেন বর্জন করে সততা, ন্যায় পরায়নতা, একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্ড়বমুখী আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। রিবা বিষয়ক কুর’আনে নাযিলকৃত প্রাথমিক আয়াতে রিবাকে হারাম বা নিষিদ্ধকরণের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যদিও ইসলামে সর্বপ্রকার রিবা (সুদ) হারাম। বর্তমান সমাজের মত তৎকালীন আরব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রিবার (সুদের) দুষ্ট ও বিষাক্ত ক্ষত, ক্যান্সারের মত ব্যাপক ও মারাত্মক আকারে ছড়ানো ছিল। এখানে উলে□খ্য যে, ইহুদি জাতিই সর্বপ্রথম রিবার (সুদের) প্রচলন ঘটায়। ইহুদি ব্যবসায়ীরা তাদের সুদী ব্যবসার মাধ্যমে সমাজে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল (৫:৬২-৬৩)। তথাপি রিবা সৃষ্ট অবৈধ, বেআইনী চরম নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড তৎকালীন সাধারণ মানুষের কাছে তো নয়ই এমনকি স্কলার, ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী ব্যক্তি ও গোষ্ঠিও তা সহজে বুঝতে পারেননি। যতদিন না ব্যক্তি ও সমাজে নৈতিক ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হয়, ততদিন অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন মূলক কর্মকান্ড মানুষের

চোখে সহজে ধরা পড়ে না, ফলে কুর'আনের আইন বিধান যে অবশ্য পালনীয় তার মর্ম তারা যথাযথ ভাবে বুঝতে পারেনা। কারণ জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) অন্ধকার মানুষের অন্ড়র এবং চোখে পর্দা (গিশাওয়া) ফেলে রাখে। যদি সত্য-সঠিক শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ণের মাধ্যমে অন্ড়র-মনে হিদায়াতের নূর পয়দা না হয় তাহলে চোখের সে আবরণ কখনই খোলা সম্ভব হয়না। অন্ড়রে হিদায়াতের নূর (আলো) সৃষ্টি হলে অন্ড়র ও চোখের পর্দা আপনাআপনিই খুলে যায় আর তখনই মানুষ হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে পারে যা পূর্বে কখনো বোঝা সম্ভব হতোনা। হিদায়াতের নূরের মাধ্যমে সৃষ্ট মজবুত ঈমানের বদৌলতে মানুষ বাতিলকে বর্জন করে হক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেকে সচেষ্ট রাখার চেষ্টা চালায়। তখন আর আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান পালন তেমন কঠিন মনে হয় না। আর কঠিন মনে হলেও আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে মানুষ তাঁর সীমা লংঘন করার সাহস পায়না।

আমরা এমনি এক যুগে জীবন যাপন করছি যে যুগের বর্ণনায় রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন - আদম (আ) সারা বিশ্বের শয়তানের নেতা যে ইবলিসকে দেখেছেন এবং যার জীবনকাল কিয়ামাত পর্যন্ড় প্রসারিত। সে ইবলিসকে আমরাও প্রত্যক্ষ করছি যে ইবলিস নিত্য নতুন ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সদা তৎপর। ইতিমধ্যেই মানবজাতির প্রতি ইবলিসের সর্ববৃহৎ ধ্বংসাত্মক আক্রমন পতিত হয়েছে। একই সাথে ইয়াজুজ-মা'জুজ মুক্তি পেয়ে ইবলিসের দোসর হয়ে ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যাবাদী, প্রতারক দাজ্জালও লোকচক্ষুর অন্ড়রালে থেকে অবিরাম আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী রিবার ধ্বংসাত্মক ছোবল দাজ্জালের আক্রমনকে আরও সফল রূপ দিয়েছে। রিবার আক্রমন চালানো হচ্ছে ছলচাতুরী ও বিশাল প্রতারণার মাধ্যমে যা সহজে বোঝা যায় না এবং দেখা যায় না। তাছাড়া প্রতারক দাজ্জালরাতো মানুষকে কল্পরাজ্যে বিচরণের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখেছে ভিডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি ইত্যাদির মাধ্যমে মিডিয়া সন্ত্রাস ছড়িয়ে। মানুষ আজ ঘোরের মধ্যে দিনাতিপাত করছে বলে রিবাসৃষ্ট দাজ্জালের বিষাক্ত আক্রমনের বিষক্রিয়া উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ইবলিস, ইয়াজুজ-মা'জুজ ও দাজ্জালের বিভ্রান্ড়ি ও প্রতারণা অনুধাবনের পূর্বশর্ত হলো মানব মনে নূরের (হিদায়াতের আলো) উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক জাগরণ (বাসিরহ)। এই নূর আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নি'আমাত, যার দ্বারা মানুষের আভ্যন্ড়রীণ জগত আলোয় উদ্ভাসিত হয়। যে আলোয় দৃশ্যমান হয় দূরের ও কাছের বহু জিনিষ যা নূরের অনুপস্থিতির কারণে একই জায়গায় সহাবস্থান করেও একজন দেখতে পায় আর অন্যরা তা দেখতে পায় না। এ বিষয়ে মুসা (আ) কে আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছিলেন খিযির (আ) এর মাধ্যমে যার বর্ননা রয়েছে সূরা আল কাহ্ফের ৬০ থেকে ৮২ নম্বর আয়াতে (১৮: ৬০-৮২)। কোন বিষয়ে বাস্ড়বতার গভীরে প্রবেশ না করে মানুষের পক্ষে কোন প্রশ্নের সঠিক সমাধান বের করা কখনও সম্ভব হয় না। মূলত মু'মিনের অন্ড়র নূরের আলো দ্বারা আলোকিত থাকে। মু'মিনের বাস্ড়ব জ্ঞানের মাঝে বিরাজ করে

আধ্যাত্মিক শক্তি। তাই বাস্ড়বতাই আধ্যাত্মিকতা (reality is spiritual)[১]। রিবা গঠিত অত্যাচার নিপীড়ন সাধারণত উপস্থাপিত হয় প্রতারণাময় সাধুতার মোড়কে ঢেকে ছদ্মবেশের মাধ্যমে। এই ছদ্মবেশী প্রতারনার জাল সাধারণ মানুষতো দুরের কথা যারা নিজেদেরকে বিশেষজ্ঞ ও স্কলার হিসেবে দাবী করেন তারাও বুঝতে ভুল করেন। আজকের মুসলিমদের জন্য যে বিশাল ও সুগভীর শিক্ষা রয়েছে। তা হল এই যে ভবিষ্যতে অনেক ধর্ম নিরপেক্ষ যারা প্রকৃতপক্ষে আল□াহ্ বিমুখ মুসলিমের উদ্ভব ঘটবে আর উচ্চ ডিগ্রীধারী পেশাদার শ্রেণী মুসলিম সমাজে উচ্চ পদগুলিতে আসীন থাকবেন। যারা বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় বিকৃত তথা সারা বিশ্বে রিবার উপস্থিতি অনুভব করতে ব্যর্থ হবেন আর তারা অনেকেই তখন যুক্তি দেখাবেন (আব্দুল□াহ্ ইউসুফ আলীর মত) যে ব্যাংকের মুনাফা রিবা নয়। প্রকৃতপক্ষে এমনও লোক থাকবেন যারা যুক্তি দেখাবেন যে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমান ইউরোপিয়ান পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আর এটা এ যুগের সবচেয়ে বড় সফলতা ও অর্জন। এ ধরণের উচ্চ ডিগ্রীধারী লোকেরা এটা বুঝতে এতটাই অক্ষম হবেন যে আধুনিক ইউরোপিয়ান রিবা ভিত্তিক অর্থনীতিই যে মানবজাতিকে শোষণের মোক্ষম হাতিয়ার যা আক্ষরিক অর্থেই মানবজাতির রক্ত শুষে নিচ্ছে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করবেন। আজকের মুসলিমদের জন্য এ শিক্ষাই অতি গুর"ত্বপূর্ণ যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কথিত মুসলিম পেশাদারেরা রিবার বিশ্বজনিন উপস্থিতি বুঝতে অক্ষম থেকেই যাবে যতক্ষণ না তাদের মাঝে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটে। আধ্যাত্মিক জাগরণ ও নৈতিক উন্নয়ণের ফলে যখন তাদের চোখের পর্দা উন্মোচিত হবে তখন সে সব পথভ্রষ্ট মুসলিমেরা তাই দেখবে যা অন্য সময় কখনই তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হতো না। রিবা ভিত্তিক বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া শির্ক ও কুফরের বিষয়গুলি যে ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে তার অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করা, তা অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার উন্নয়ন। এই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জাগরণই সবচেয়ে ত্যাগ ও সবরের বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ– যাতে থাকবে জ্ঞান, হিকমাত ও আধ্যাত্মিকতার সুষম সংমিশ্রণ। এটা অবশ্যই আল□াহ্ তা'আলার বিশেষ দয়ার উপর নির্ভরশীল। সে কালের প্রকৃত সুফী শায়খ ছিলেন আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আমাদের মাঝে আজো তিনি রয়েছেন আধ্যাত্মিক জগতের আল□ামা ইকবাল মডেল হিসেবে। বর্তমান মুসলিমদের জন্য চরম লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হলো সমকালীন বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্ড়রেই নৈতিক ও

১ আল□াহ্ তা'আলা মু'মিনদের অন্ড়রে ঈমান ও হিদায়াতের নূর দান করেন। এই নূরের মাধ্যমে আল□াহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে করে মু'মিনরা অন্ড়র্দৃষ্টির সাহায্যে দূরের ও কাছের বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তাই কুর'আন-সুন্নাহ্র পরে, আরো একটি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হলো আল□াহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য-সঠিক স্বপ্ন এবং মু'মিনের অন্ড়র্দৃষ্টি। যা নবুয়াতের অবসান ঘটা সত্বেও কিয়ামাত পর্যন্ড় বিদ্যমান থাকবে। তাই নবী (স) বলেছেন: *যে ব্যক্তি বেশী সত্যবাদী হবে তার স্বপ্নও বেশী সত্য হবে আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়াতের ছেচলি□শ ভাগের এক ভাগ*। (তিরমিযী ৪:২২৯৪)।

রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বুঝতে হলে মু'মিনের এই অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। এই ফেৎনার যুগে আধ্যাত্মিকতাকে চিনতে পারার লিটমাস পরীক্ষা নিহিত রয়েছে যে বিষয়ের সাথে তাহলো আধুনিক রিবা ভিত্তিক ধর্ম নিরপেক্ষ বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় শির্কের অবতারনা।

দ্বীনি শিক্ষা ও তার অনুশীলনের অবকাশ নেই। বর্তমানে এমন কোন ইসলামি শিক্ষা নীতিমালা ও বিষয়বস্তু গৃহীত হয় না যার মাধ্যমে ঈমানী চেতনা, আধ্যাত্মিক জাগরণ ও যথাযথ জাগতিক শিক্ষার সুষম সংমিশ্রণে জনশক্তি গঠিত হয়ে মহা দুর্যোগে নিমজ্জিত মুসলিম জাতিকে পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইসলামিক শিক্ষা আমাদের সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিতে পারে যা আমাদের অন্তরে ঈমানের আলোর বিকিরণ ঘটাবে। আধ্যাত্মিক জাগরণে সুষ্ঠু ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বকে সাত বছর ধরে ঈমান ও সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন রসুল (স)। অতপর তৎকালীন সমাজের মানুষের মাঝে রিবা বর্জনে মন-মানসিকতা তৈরী সম্পন্ন হলেই তবে রিবা বিষয়ে প্রথম আয়াত নাযিল হয়। মক্কায় নাযিলকৃত প্রথমদিকের সূরা আল-হুমাযাহ্য় আল্লাহ্তা'আলা রিবা বিষয়ে অপ্রত্যক্ষ ঈঙ্গিত দিয়েছেন,

রিবা চুড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণার পূর্বে রিবা সংক্রান্ত নাযিলকৃত আয়াত সমূহ

ধ্বংস প্রতিটি সামনে নিন্দাকারী ও পিছনে দোষ প্রচারকারী ব্যক্তির জন্য (যারা যে কোন প্রকার অপবাদ রটিয়ে বেড়ায়)। যে ব্যক্তি মাল-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং (বারবার) তা গুণে রাখে। সে মনে করে তার মাল-সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে (এবং তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে আর তার সম্পদ যা বাড়তেই থাকবে কখনই কমতে পারবে না। সে যতদিন বেঁচে থাকবে বিত্তবান থাকবে তাকে কেউই তার মাল কমাতে পারবে না)। কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাহ্ বা বিচুর্ণকারী স্থানের মধ্যে (যা তাকে পিষিয়ে ফেলবে)। (হে নবী) আপনি কি জানেন হুতামাহ্টা কি? (তা হলো) আল্লাহ্র আগুন, উত্তপ্ত, উৎক্ষিপ্ত যে আগুন (তার) অন্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে। নিশ্চয়ই তা (আগুন) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় তারা পরিবেষ্টিত হবে উঁচু উঁচু স্তম্ভে (যার মধ্যে তারা শ্বাসরূদ্ধকর অবস্থায় পতিত হবে)। (১০৪:১-৮)।

ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের সময় আরব সমাজে অর্থলোভী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক দোষ ত্রুটি বিরাজমান ছিল। আলোচ্য সূরায় তারই বিভৎসতা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলার চরম ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন একমাত্র রাজ্জাক বা রিয্কদাতা অন্য কেউই রিয্ক দাতা হতে পারে না। আল্লাহ্ই যার যার চাহিদা মত রিয্ক বন্টন করেন। কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে:

আর আমরা (আরবী ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অধিক মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ্ তা'আলা 'আমি' এর পরিবর্তে আমরা শব্দ ব্যবহার করেছেন) তাতে রিয্কের

ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং অন্য সকল সৃষ্টির জন্য। যাদের (কাররই) রিয্‌কদাতা তোমরা নও। (সূরা হিজর, ১৫:২০)।

তিনিই এই যমীনের উপর পাহাড়সমূহকে গেড়ে দিয়েছেন এবং তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে (সকলের) আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন চার দিন সময়ের ভেতর, রিয্‌ক অনুসন্ধানকারীদের জন্যে সব উপকরণ (রয়েছে যার যার চাহিদা মত) সমান সমান। (সূরা ফুস্‌সিলাত বা হা–মীম সাজদাহ্‌, ৪১:১০)।

যমীনের উপর বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিয্‌ক (পৌছানোর দায়িত্ব) আল্লাহ্‌র নিকটে নেই, তিনি (দুনিয়ার জীবনে যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, (তেমনি তার মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে রাখা হবে তাও তিনি জানেন। এসব বিষয় লিখা আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (সূরা হুদ, ১১:৬)। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বের সকল সম্পদ মানবজাতির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এ নির্দেশও রয়েছে প্রত্যেকেই যেন হালাল উপায়ে শ্রমের মাধ্যমে তার নিজ অংশ অর্জন করে নেয়।

আর অচিরেই তার সকল কর্মকান্ড (পরীক্ষা করে) দেখা হবে। অতপর তাকে তার পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩:৪০-৪১)।

এভাবে কম হলেও কুর'আনের দশটি আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা চাহিদামত রিয্‌ক বন্টনের এবং তাঁর ইচ্ছেমত রিয্‌ক বাড়ানো বা কমানোর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন (দেখুন- ১৩:২৬, ২:২৪০, ১৭:৩০, ২৮:৮২, ২৯:৬২, ৩০:৩৭, ৩৪:৩৬, ৩৪:৩৯, ৩৯:৫২, ৪২:১২)।

আর যদি আমরা যাকাত বা সাদাকা দেই তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধুমাত্র আমরা যা ব্যয় করেছি তারই প্রতিদান দিবেন তাই নয় বরং বহুগুণে বাড়িয়ে তা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন বলে মহান আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদা করেছেন (সূরা রূম-৩০:৩৯)।

অথচ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না যে প্রত্যেকের হালাল রিয্‌ক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা সরবরাহ করেন।[১]

এসব লোকগুলি সম্পদকে খুবই ভালবাসে। তারা তাদের জীবন ও চেষ্টা-সাধনা পুরোটাই উৎসর্গ করে দেয় প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাল সম্পদ (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারাম উপায়ে) আহরণ ও জমানোর চেষ্টায়। সে কারণে তারা (অবৈধ উপায়ে) ধনবান হতেই থাকে। তাদের একান্ড় ইচ্ছা যেন প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসিতার মধ্যে থেকে দুনিয়ার জীবন কেটে যায়।

১ যদি তোমরা শুক্র আদায় কর তাহলে আমরা অবশ্যই (আমাদের নি'আমাত) বাড়িয়ে দেব। আর তোমরা অস্বীকার (কুফরী) করলে (জেনে রেখো) আমার আযাব মারাত্মক কঠিন। (সুরা ইব্রাহীম ১৫:৭)।

আর রিয্কের ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে হালাল পন্থা অবলম্বণকে সেকেলে ধারণা বা বোকামী কাজ বলে মনে করা হয়। ফলে রিয্ক আহরণ ও বন্টনের দায়িত্ব -আজ নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে অধিকাংশ মানুষ। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য হালাল বা বৈধ বরাদ্দকে তারা যথেষ্ট মনে করে না।[১]

আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে শুধুমাত্র আল্লাহ্র দেয়া রিয্কই হালাল। আর হারাম পন্থায় যা কিছু মানুষ অর্জন করে তা কখনও আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক হতে পারে না। যে সকল সম্পদ প্রতারণা, চুরি, লুন্ঠন ইত্যাদি যেকোন হারাম উপায়ে অর্জিত হয় তা তার নিজেরই অর্জন। কেননা আল্লাহ্ নিজে পবিত্র তার সরবরাহকৃত মাল সম্পদও পবিত্র। আর প্রতারণা, চুরির মাধ্যমে যা কিছু অর্জিত হয় তা সবই 'রিবা' (সুদ)।

আল্লাহ তা'আলা এই সকল হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তি এবং অসৎ উপায়ে উপার্জিত তাদের সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আযাব[২]।

মক্কার প্রাথমিক যুগের অপর একটি সূরায় প্রতারণার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন:

ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয় (এবং প্রতারণা করে)। যারা অন্যদের থেকে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে কিন্তু নিজেরা যখন ওজন করে বা মেপে দেয় তখন

১ তাই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাদের নিজেদের বরাদ্দের সাথে অবৈধ উপায়ে অন্যের বরাদ্দকৃত রিয্ক ভোগ করার জন্য তাদেও মাঝে অদম্য আকাংখা সৃষ্টি হয়। ভাবখানা এমন যেন সারা দুনিয়ার মাল সম্পদ শুধু তাদেরই দখলে থাকুক যাতে করে তারা মহাজন সেজে অন্য সবাইকে শোষণ, নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের কেনা গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে। সে কারণে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে সালাহ্ কায়েম ও যাকাত আদায়ের জন্য আমি মাল-সম্পদ দান করেছি। যদি কোন আদম সন্ড়্রনের এক উপত্যকা পরিমাণ মাল-সম্পদ থাকে তখন সে নিশ্চয়ই কামনা করে যেন তার দ্বিতীয় উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ এসে যায়। আর যদি তার দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ এসে যায় তবে সে নিশ্চয়ই বাসনা করে, তার জন্য তৃতীয় উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ আসুক। আর আদম সন্ড়্রনের পেট মাটি ছাড়া কোন বস্তু ভরতে পারবে না।] হাদীসে কুদসী নং ১৯০, পৃ ১৫০ ইফাবা।

হে আদম সন্ড়্রন, তোমার কাছে এ পরিমাণ মাল থাকতে পারে যা তোমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট অথচ তুমি এ পরিমাণ চাও যা তোমাকে পথভ্রষ্ট ও বিদ্রোহী করে তুলবে। হে আদম সন্ড়্রন! যদি তুমি সুস্থ শরীরে রাত্রি পার কর, তোমার পরিবার ও পশুপালের ভিতর তুমি নিরাপদ থাক এবং একদিনের খাদ্য থাকে তবে বাড়তিটুকু অন্যজনের (সমস্ড় দুনিয়ার) জন্য ছেড়ে দাও। (হাদীসে কুদসী নং ১৯১)।

২ যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে দুনিয়াতেই তারা জান্নাতে বসবাস করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্ড়্র থাকে অশান্ড়। নানা কারণে তারা নিশ্চিন্ড়ে ঘুমাতেও পারে না। নিরাপত্তা খুঁজে ফেরে সর্বদা তাই তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের সম্পদকে পাহাড়া দেয়ার জন্য বিশাল অট্টালিকা তৈরী করে। তাদের যতই থাকুক না কেন আরো অধিক পাওয়ার লোভে তারা সদা ব্যস্ড় থাকে। ফলে আখিরাতের পাথেয় অর্জনে গাফিল (উদাসীন) থাকা অবস্থায়ই তারা ক্বরে চলে যায়। তারা বুঝতেই পারে না যে তাদের জীবন ধারাই মূলত বেফায়দা কাজে ব্যস্ড় রেখে তাদের জাহান্নামে যাওয়ার রাস্ড়্র উন্মুক্ত করে রেখেছে (তবে তারা তাওবা করে নিজেদের শুধরে নিলে আলাদা কথা)।

তাতে কম করে দেয়। তারা কি ভাবে না যে তাদের সকলকেই (একদিন) বিচারের জন্য কবর থেকে তুলে আনা হবে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩:১-৫)।

কুর'আনের বহু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস না করার জন্য মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন: *তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর, আর নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আল্লাহ্ মুহসিনীনদের (সৎকর্মশীলদের) ভালবাসেন।* (সূরা বাকারা, ২:১৯৫)।

আমরা এমন কত (অসংখ্য) জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদের প্রাচুর্যের দরুন অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। অতএব লক্ষ্য কর তাদের ঘরবাড়িগুলি শূণ্য হয়ে পড়ে আছে, যেখানে পরবর্তী তে খুব কম লোকই বসবাস করেছে। আর আমরাই (আরবী ভাষার ব্যবহারিক নিয়ম অনুযায়ী অধিক মর্যাদা প্রকাশার্থে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন আয়াতে 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন) হলাম সেসবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (সূরা কসাস, ২৮:৫৮)।

কুর'আনে বর্ণিত কারূণের কাহিনী, ধনসম্পদের কারণে অহংকারী ও আল্লাহদ্রোহী হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। আল্লাহ্ তা'আলা কারূণের সেচ্ছাচারিতার শাস্তি এমন কঠিনভাবে দিয়েছিলেন যে, মাটি তাকে তার মাল-সম্পদ সহ গ্রাস করে ফেলে। আর সে কাহিনী আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন:

নিশ্চয়ই কারূণ ছিল মুসা (আ) এর কওম বা জাতির একজন ব্যক্তি। কিন্তু সে তার জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো। আর আমরা তাকে এতো বেশী ধনভান্ডার দিয়েছিলাম (যা এমন ছিল যে) নিশ্চয়ই তার চাবিগুলির ভার বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টকর হতো। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল (হে কারূণ) আনন্দে আত্মহারা হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকা লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাকে যে মাল-সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর বানানোর চেষ্টা কর। তবে দুনিয়া হতেও তোমার নিজের অংশ নিতে ভুলে যেওনা। আর (মানুষের প্রতি) তুমি রহমাত বা অনুগ্রহ কর আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন রহমাত করেছেন। আর যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির অযুহাত অন্বেষণ করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। তখন সে জবাবে বলল, "এ সবকিছুতো আমাকে দেয়া হয়েছে আমার ঈল্‌মের (জ্ঞানের) কারণে"। সে কি জানতো না তার পূর্বে বহু লোককেই আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও জনবলের অধিকারী ছিল? আর অপরাধীদের কখনোই তাদের অপরাধ সম্পর্কে (আখিরাতে) জিজ্ঞেস করা হবে না। একদিন সে খুব জাঁকজমকের সাথে তার জাতির সামনে (অহংকারীর বেশে) বের হয়েছিল। যারা দুনিয়ার জীবনের সুখভোগ আকাংখা করতো তারা বললো হায় আফসোস, কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরকেও দেয়া হতো। সে নিশ্চয়ই বড় তাকদিরওয়ালা। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈল্‌মের অধিকারী ছিল তারা বলল, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্‌র (কাছে গচ্ছিত আখিরাতের) পুরস্কারই তাদের জন্য উত্তম। সবরশীল (ধৈর্যশীল) ছাড়া কেউ তা পেতে পারে না। অতপর আমরা তাকে সহ তার

প্রাসাদ যমীনে পুঁতে ফেললাম। তখন তার জন্য সাহায্যকারী দল ছিল না, আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। যারা গতকাল পর্যন্ড়ও তার মত (দুনিয়াবী) মর্যাদা আকাঙ্খা করেছিল তারা বলতে লাগল বড়ই আফসোস (আমরা ভুলে গিয়েছিলাম) আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্ক বাড়িয়ে দেন আর তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে তিনি চান রিয্ক সঙ্কীর্ণ করে দেন। আল্লাহ্ যদি দয়া না করতেন আমাদেরকেও তিনি মাটিসহ ধ্বসিয়ে দিতেন। আখিরাতের ঘরতো আমরা তাদের জন্য রেখেছি, যারা যমীনে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, আর পরিণামের চুড়ান্ড় কল্যাণ কেবল মুত্তাকীদের (আল্লাহভীর, পরহেজগার) জন্য। (সূরা কসাস, ২৮:৭৬-৮৩)। ইহুদিদের অপরাধ প্রবণতা বর্ণনা করতে যেয়ে কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে:

(ইহুদিদের চরিত্র হচ্ছে) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ড়, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওস্ড়াদ। এরা যদি কখনো (কোন বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো, কিংবা তাদের ফিরিয়েও দিতে পারো, যদি তুমি তাদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে (তুমি নিশ্চিন্ড় থাকো) এরা তোমার কোনোই অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফায়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়-বিচারকদের ভালবাসেন। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৪২)।

তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে, গুণাহ্ করা (আল্লাহ্র সাথে) বিদ্রোহ করা ও হারাম মাল ভোগ করার কাজে এরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে, এরা যা করে (মূলত) তা বড়োই নিকৃষ্ট কাজ। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৬২)।

(কতো ভালো হতো এদের) রব্বানীগণ (গুর) ও পন্ডিত ব্যক্তিরা যদি এদের এসব গুণাহ্ ও হারাম মাল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতো! (কারণ) এরা যা কিছু সংগ্রহ করেছে তা বড়োই জঘন্য। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৬৩)। রিবা বিষয়ক আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে মানুষকে শয়তানী কর্মকান্ড সম্পর্কে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি সতর্ক করে দিয়েছেন সে সকল শয়তানী কর্মকান্ডের পরিণতি সম্পর্কে। কেননা শয়তান ও শয়তানী কর্মকান্ড সম্পর্কে না জানলে মানুষের পক্ষে শয়তানকে হটিয়ে সে সকল কর্মকান্ড থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না।

রিবা বিষয়ে কুর'আনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত

শয়তানের চক্রান্ড়ে জড়িয়ে থাকা তৎকালীন আরব সমাজ যখন অর্থনৈতিক অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই শয়তানী কর্মকান্ডকে প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা রিবাকে অর্থনৈতিক নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করে এই অত্যাচারের বিরদ্ধে পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা দিলেন:

আর তোমরা যা কিছু সুদের উপর (এ ভেবে) দাও যে লোকদের সম্পদের বা অর্থের সাথে শামিল হয়ে (তোমাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে) আল্লাহর নিকট তা মোটেও বাড়েনা (সেকারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল অবৈধ ব্যবসাকে বয়কট করার নির্দেশ দিয়েছেন কেননা এটা ব্যবসা পদ্ধতি নয় বরং এটা হলো অর্থনৈতিক নিপীড়ন) বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা কিছু যাকাত (সাদাকা বা কর্যে হাসানা দাও)

মূলত তারাই সেসব লোক যারা (যাকাত সাদাকা দিয়ে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে নেয়) সমৃদ্ধশালী। (সূরা রূম, ৩০:৩৯)। (কর্‌যে হাসানা বিষয়ে দেখুন সূরা হাদীদ, ৫৭:১১)।

অর্থ-সম্পদ যখন মানুষের কোন চেষ্টা সাধনা ও শ্রম ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে আপনা আপনিই বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে সুদে-আসলে মিলে মূলধনে পরিণত হয়। আসল পরিমাণ অর্থের সাথে অতিরিক্ত এই অর্থ প্রাপ্তিই রিবা (সুদ) যা মূলত অন্যের উৎস থেকে প্রতারণার মাধ্যমে লুট করা সম্পদ। আর এটা এক ধরনের ডাকাতি। নিশ্চয়ই এ ধরনের প্রতারণা ও লুটতরাজের মাধ্যমে লেনদেন আল্‌াহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘৃণা করেন। এ ধরনের আর্থিক লেনদেনে আল্‌াহ্ তা'আলার রহমাত ও বারকাত কিছুই থাকে না। বরং যাকাত, সাদাকা ও কর্‌যে হাসানার মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক লেনদেন সুসংগঠিত হয় তা-ই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সে কারণে আল্‌াহ্ তা'আলা সূরা আর রূমের রিবা বিষয়ক আয়াতের ঠিক পূর্ববর্তী আয়াতেই মু'মিনদেরকে যাকাত, সাদাকা দানে উৎসাহিত করে বর্ণনা করেছেন:

অতএব (হে মু'মিনগণ তোমরা) আত্মীয়কে তার হক (পাওনা) পৌঁছে দাও, আর (হক পৌঁছে দাও) মিসকীন ও মুসাফিরকেও (পথিক)। এটাই উত্তম পন্থা তাদের জন্য যারা আল্‌াহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম। (৩০:৩৮)। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে মূলধন থেকে বেড়ে যাওয়া অতিরিক্ত অর্থ (টাকা-পয়সা) মূলত ছিনিয়ে নেয়া হয় অন্যের তহবিল থেকে। অন্যভাবে বলা যায় রিবা বা সুদ হল একজনের ক্ষতির বিনিময়ে অপরজনের লাভবান হওয়া। এ সকল লেনদেন কখনই ব্যবসা হতে পারে না। অবশ্যই ব্যবসার বিপরীতে রয়েছে এর অবস্থান। আল্‌াহ্ তা'আলা তাই ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর হারাম করেছেন রিবাকে (২:২৭৬)। আর নিশ্চয়ই ব্যবসায়িক লেনদেন হওয়া চাই সংশি্‌ষ্ট সকল ব্যক্তি ও দলের সমঝোতা ও সন্ে‍ড়াষের ভিত্তিতে (আন-নিসা ৪:২৯)।

কুর'আনের তাফসীরকারগণের মধ্যে মুহাম্মদ আসাদ রিবা বিষয়ক আয়াতগুলির চমৎকার তর্জমা ও তাফসীর করেছেন। তিনি যেভাবে 'রিবা'র সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করেছেন, রিবা সংক্রান্ড় পরবর্তী আয়াতগুলির সাথে তা মিলে যায়। যে আয়াতগুলিতে আল্‌াহ্ তা'আলা ইহুদিদের প্রতি লা'নাত করেছেন রিবার মাধ্যমে নিরীহ ও দুর্বলদের প্রতি প্রতারণা, যুলুম ও নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে। আল্‌াহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা নাযিল হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা রিবা জনিত জুলুম অত্যাচার চালানোর ফলে আল্‌াহ্ তা'আলা বলেন:

কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা সুদ খায় এবং মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের মাল-সম্পদ গ্রাস করে। সে কারণে এদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্যে আমরা কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (সূরা নিসা, ৪:১৬১)। এবারে আমরা তার তাফসীর থেকে সূরা আর-রূমের ৩৯ নম্বর আয়াতের তর্যমা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

আর (স্মরণ কর) যা কিছু তোমরা সুদের উপর দাও এই মনে করে যে অন্যের মাল-সম্পদ দ্বারা তোমার সম্পদ বাড়িয়ে নিবে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তা মোটেও বাড়ে না। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু দান-সাদাকা কর, তারাই সেসব লোক যারা তাদের সম্পদকে বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যেভাবে তিনি আর্থিক লেনদেনকে রিবা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা হলো,

(এটা কুরআনিক আয়াতের ধারাবাহিকতায় রিবা সম্পর্কিত বিষয়ের সর্বপ্রথম বর্ণনা।) ভাষাগত বা শাব্দিক অর্থের দিক থেকে রিবা বলতে বুঝায় যোগ করা, মূল অবস্থা থেকে কোন পণ্য বা অর্থের পরিমাণ অতিরিক্ত আকারে বেড়ে যাওয়া। কুর'আনের পরিভাষায় যেকোন বেআইনী উপায়ে একে অপরকে ঋণদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ মিশ্রণে মূলধনের পরিমাণ বা আকার বৃদ্ধি করাকেই রিবা বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং তৎকালীন আরব সমাজে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সে যুগের মুসলিম আইন প্রণেতাগণ (Jurists) রিবা বলতে সুদের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় মূলধনের সাথে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা অর্থ সম্পদকে বুঝিয়েছেন।

কোন্ কোন্ বিষয় রিবার আওতাভুক্ত এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকার কারণে মুহাম্মদ আসাদ বিষয়টি অতীব সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন:

"ইসলামি স্কলারগণ এখনও পর্যন্ত একমত হয়ে রিবার যথাযথ সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি। মূলত যে সংজ্ঞা রিবা বিষয়ক সকল প্রকার ধারণা, ব্যাখ্যা, রিবাখোরদের শাস্তি দেয়ার জন্য আইন-বিধান বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের সকল সংকটজনক অবস্থায় ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে এমন একটি সংজ্ঞা রচনা প্রয়োজন"।

মুহাম্মদ আসাদ নিজস্ব ব্যবহারের জন্য একটি সংজ্ঞা রচনা করেছেন। এই সংজ্ঞার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাকে তুলে ধরা। অবশেষে তিনি যতটুকু সফল হয়েছেন তা পূর্বের কোন তাফসীরকারের জন্যই সম্ভব হয়নি রিবাকে হারামের বিষয়ে কুর'আনের তাৎপর্য তুলে ধরতে। তার মতে আল-কুর'আনে রিবার নামকরণ করা হয়েছে 'অর্থনৈতিক নিপীড়ন'।

আমরা যদি মুহাম্মদ আসাদের কুর'আনের তাফসীরের সাথে বর্তমানকালের সুপরিচিত মাওলানা আবুল আ'লা মাওদুদী নামে অপর একজন তাফসীরকারকের তাফসীর তুলনা করি তাহলে অনুধাবন করা যাবে যে রিবা বিষয়ে মুহাম্মদ আসাদের এতটা গভীরে প্রবেশের রহস্য। রিবা বা সুদ বিষয়ে মাওলানা মাওদুদীর তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

লোকদের অর্থের সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে এজন্য তোমরা যে সুদ দাও, তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে

যাকাত দাও, মূলত এই (যাকাত) প্রদানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করিয়ে নেয়। (৩০:৩৯)।

মওলানা মওদুদী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সুদের প্রতিবাদে কুর'আন মাজীদে ইহাই প্রথম আয়াত। এতে শুধু এটুকুই বলা হয়েছে তোমরা তো সুদ দাও এই মনে করে যে, যাতে করে তোমরা অন্যের ধনমালের সাথে মিলিয়ে তোমাদের সম্পদ বাড়িয়ে নিতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদী ব্যবসায় আল□াহর নিকট মাল-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। আসলে মাল-সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হয়, যাকাত দানের মাধ্যমে। এই বৃদ্ধির পরিমাণের কোন সীমা পরিসীমা নেই। নিয়্যাত যত খালেস (একনিষ্ঠ) হবে এবং যতই গভীর ত্যাগ ও আল□াহর সন্ড়েষ লাভের আশায় কোন ব্যক্তি আল□াহর পথে মাল সম্পদ ব্যয় করবে, আল□াহ তা'আলা তত পরিমাণেই তার মাল-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন।

অপর এক তাফসীরবিদ মওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী সূরা আর রূমের ৩৯ নম্বর আয়াতের তর্জমায় বলেছেন: "আর যা কিছু উপহার দিয়েছিলে এই মনে করে যে অন্যের সম্পদের সাথে মিলে মিশে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আল□াহর কাছে তা বৃদ্ধি পায়না; বরং যা কিছু আল□াহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দরিদ্রের ভরণ পোষণের জন্য দান কর–তাই বহুগুনে বৃদ্ধি পায়"।[১]

১ হাদীসে কুদসীতে এ প্রসঙ্গে আবু সালামার বিন আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) এর বর্ণনায় রসুলুল□াহ্ (স) বলেছেন: *অতপর হে লোক সকল! তোমরা নিজের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাও। কারণ আল□াহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার নিকট কি কোন রসুল আসেনি, যে আমার বার্তা তোমার নিকট পৌছিয়েছে? আর তোমাকে আমি কি কোন মাল-সম্পদ দান করিনি এবং তোমার প্রতি আমি কোন অনুগ্রহ করিনি? অতপর তুমি তোমার জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছ? তখন সে ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু কিছুই সে দেখতে পাবে না। অতপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু তখন সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব যে ব্যক্তি পারে সে যেন নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে; যদিও তা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হয়, সে যেন নিশ্চয়ই তা করে। আর যার কাছে একটি খেজুরও নেই সে যেন ভাল কথার সাহায্যে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কারণ এ দ্বারাও সাওয়াবের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে।* (হাদীসে কুদসী নং ১৯৪, পৃ:১৫২) এবং সহীহ বুখারী ৩:১৩২৫।

মওলানা দরিয়াবাদী আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন তা আরো বিস্ময়কর! তার এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলোঃ আর যা কিছু তোমরা উপহার দিয়েছিলে [রিবা শব্দের অর্থ 'অতিরিক্ত এবং বৃদ্ধিকরণ' তবে এখানে রিবা বলতে বোঝায় যা কিছু আল□াহর রাস্ড়া ছাড়া অন্য রাস্ড়ায় ব্যয় করা হয়, এই ব্যয় শুধু মাত্র প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যেমন-কারোর বিয়ের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয় এই আশা করে যে ভবিষ্যতে তোমাদের আচার অনুষ্ঠানে আরো বেশী পরিমাণ যোগ হয়ে বর্ধিত অবস্থায় তোমাদের কাছে ফেরৎ আসবে] কিন্তু এটা আল□াহর দৃষ্টিতে

বৃদ্ধি পায় না [যদিও এধরনের ব্যয়ের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা নেই, তথাপিও এ ধরনের খরচে আল্লাহ্ তা'আলা না দিবেন কোন প্রতিদান এবং না করবেন কোন অনুগ্রহ] বরং যা কিছু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের দান কর (যেমন কোন গরীব লোকের থাকা খাওয়ার খরচ বহন কর) অতপর তাই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

রিবা (সুদ) ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদি-খ্রীষ্টান তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে যা ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়। সে সকল পরিবারের সদস্যদের মাঝে নৈতিক সম্পর্কের সাথে সাথে 'পরিবার ভিত্তিক সমাজ' এর চিন্তাধারার পতন ঘটেছে। এমনকি যুক্তরাষ্টের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান তার কন্যাকে ঋণ দিয়ে সুদের শর্ত আরোপ করেছিলেন। এভাবেই রিবা বা সুদ পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের চিন্তাধারাকেই বিলুপ্ত করে দেয়। যেখানে পূর্বে সামাজিকভাবে ব্যক্তি ও সামাজিক বিপর্যয়ে নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হতো সেখানে বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেদের উপরই নির্ভর করতে হয়। বিপদে সংকটে সাধারণত কেউ আর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না কেননা রিবার কারণে সামাজিক বন্ধন ও সমাজে একের প্রতি অপরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর রিবাযুক্ত বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককে আত্ম নির্ভরশীল হতে বাধ্য করার কারণে সুযোগ সন্ধানী কিছু অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে, যেমন বীমা কোম্পানীগুলি! প্রকৃতপক্ষে এই বীমা সংস্থাগুলি সুদ বা রিবার সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত রয়েছে। অবশ্যই সুদ বা রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ছাড়া বর্তমানে কোন বীমা কর্মকান্ড পরিচালনায় সক্ষম নয়।

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি হয়ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রিবা বা সুদের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশের আরো একটি প্রধান কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা নিজ নিজ প্রকৃত প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী সম্পদ সাদাকা করবে যাতে করে সমাজ থেকে অভাব ও দারিদ্র দূর হয়। পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেকে শুধু নিজের কথাই ভাবে তবে এটা সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ ও দুর্বল করে ফেলবে এবং এই সুযোগে হাঙ্গর সদৃশ রিবা সামাজিক সম্পদকে গ্রাস করে নিবে।

সুদী ঋণ আদান প্রদান ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে শুধু যে পরিবার ও সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে তা নয়, বরং এটা যাকাত সাদাকা প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষকে চরম গাফিলতির মাঝে নিমজ্জিত করে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে রিবাকে সাদাকার বিপরীতে তুলনামূলক বর্ণনা করেছেন। এ দু'টির তুলনামূলক বিচারে আমরা রিবা সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে যা বুঝতে পারি তাহলো আসলে রিবা শুধুমাত্র গ্রহণ করতে শেখায়, স্বার্থপরতা শেখায় এবং শেখায় শোষণ করার পদ্ধতি। রিবা কখনোই কিছু ত্যাগ বা কুরবানী করতে শেখায় না। অপরদিকে সাদাকা শুধুই দান করা শেখায় কেননা দুনিয়ার জীবনে সাদাকার বিনিময়ে কিছু আশা করা হয় না। দান-সাদাকা যাদের প্রয়োজন তাদের দিয়ে দেয়া হয় এবং বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করা হয় না যার

মাধ্যমে স্বার্থের কুরবানী ও ত্যাগের মহিমা প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে রিবার মাধ্যমে ঋণপ্রদানকারী, ঋণগ্রহণকারীর নিকট থেকে যে কোন উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ আদায় করে নেয়। মূলত ঋণদানকারী (Haves) এবং ঋণগ্রহণকারী (Have nots) এর মধ্যে একটি মানবিক, আত্মিক এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকা উচিত। কিন্তু ঋণদান যখন সুদী ব্যবসায় পরিণত হয় তখন আর ভ্রাতৃত্ব, দানশীলতা, সহমর্মীতা ইত্যাদি সুকোমল প্রবৃত্তিগুলির কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকে না।

রিবা বা সুদী ঋণ ব্যবস্থায় 'দেয়া' এবং 'নেয়া'র মাঝে বিশাল এক ফারাক বিরাজ করে। অথচ ইসলামি বিধান মতে যখন কারো প্রকৃত অভাব ও প্রয়োজনের উপস্থিতি ঘটে তখন যাকাত, কর্‌যে হাসানা ও দান সাদাকার মাধ্যমে দাতা এবং গ্রহণকারী উভয়েই লাভবান হয়, যে লাভ আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান না হলেও মু'মিনের অর্ন্তদৃষ্টি তা দেখতে পায়। আর 'দেয়া' বা দান-সাদাকা সমাজকে আত্মিক ও ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। রিবার মাধ্যমে ঋণ প্রদানকারী ক্রমাগতভাবে লাভবান এবং ঋণ গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় 'নেয়া'র মাধ্যমে ন্যায়নীতি ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিয়ে একটি পরিবারকে বিনষ্ট করে দেয় এবং সার্থান্বেষী মহলের সুবিধার্থে সমাজের অন্যকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হয়। আর রিবাসৃষ্ট অভাবের কারণে দরিদ্ররা অন্যায়, শোষণ এবং প্রতারণার শিকার হয়। রিবাযুক্ত ঋণের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে মানুষ কিছুটা উপকৃত হয় বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সুদের কিস্তি সহ আসল ঋণ পরিশোধ করতে করতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থানে পৌঁছে যায়। আর এভাবেই স্বার্থপরতার দুষ্ট সংক্রমণ ছড়িয়ে রিবা সমাজের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে দেয়।

রিবাভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিভিন্ন কৌশলে অর্থ ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ করে চলেছে। রিবা সামাজিক বন্ধনকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে সমাজে হাঙ্গর এবং সার্দিন মাছের ন্যায় সর্বগ্রাসী আক্রমনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রিবা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে পুঁজি বানিয়ে নিখুঁত প্রতারণার জাল বিস্তার করে চলেছে। লাতিন আমেরিকান রাজনীতিবিদ জুয়ান ডোমিনগো আলভোরাদো সর্বপ্রথম সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রসংগে 'হাঙ্গর এবং সার্দিন মৎস্য' বিষয়ক উপমা বর্ণনা করেন। এ কারণেই কার্ল মার্কস্ ক্ষুব্ধ হয়ে সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্যই কার্ল মার্কস্ তার এই বিকল্প চিন্তাধারা কে ভুল পথে প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি রিবা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান করা সত্বেও নির্বুদ্ধিতার কারণে অবাধ এবং মুক্ত বাজার নীতিকে ধ্বংস করে সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বস্তুত যা ছিল এক ধরনের রিবা পরিহার করে অন্য প্রকার রিবাকে প্রতিষ্ঠিত করারই নামান্তর। এই রিবাই পরবর্তীতে বিরাট ফ্যাসাদে (দুর্নীতি, হাঙ্গামা, বিশৃংখলা) পরিণত হয়েছে।

লেখকের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির শিক্ষক বার্ণাড কোর্ডের কথা, যিনি লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিতে অতিমাত্রায় ধ্বংসযোগ্য দিকগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, যেগুলি ছিল বাস্তবিকই রিবার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু রিবা বিষয়ে কোন জ্ঞান তার ছিল না। অন্যত্র মুদ্রা-অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষিকা মিসেস প্যাট্রিসিয়া রবিনসনের কথা উল্লেখ করা যায় যিনি ধৈর্যসহকারে বহুদিন এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও নজরদারী করেছেন কিন্তু হিদায়াতের নূর দ্বারা পরিচালিত অন্তর্দৃষ্টির অনুপস্থিতির কারণে তিনি সুদে টাকা ধার দেয়াকে কোনরূপ শোষণ বা অন্যায় বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি।

ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে রিবার প্রভাব

সূরা আর-রূমে রিবা ও ফ্যাসাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রিবা গোটা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে চলেছে। 'ফ্যাসাদ' আরবীতে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ হলো-নিরতিশয় মন্দ, নষ্ট, বিকৃতরুচি সম্পন্ন, পচন ধরা, গলিত, অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্থ, অনৈতিকভাবে কোন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া। এখানে উল্লেখ্য যে কুর'আনে সূরা আর-রূমের ৩৯ নম্বর আয়াতে প্রথম বারের মত রিবা (সুদ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। রিবার (সুদের) প্রভাবে মানুষ মূলত নিজের দুর্দশাকে নিজেই ডেকে আনে এবং তার অশুভ পরিণতির জন্য নিজেই দায়ী থাকে। এ সম্পর্কে সূরা আর-রূমের ৪১ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার মাধ্যমে আমাদেরকে নিজ হাতে উপার্জন করা ভয়ানক পরিণতির বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন:

মানুষের নিজ হাতে অর্জন করা অপকর্মের কারণে জলভাগ ও স্থলভাগে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যেন তাদের কৃতকর্মের কিছুটা পরিণতি ভোগ করাতে পারেন। যাতে করে তারা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে) যে সকল কাজ করে বেড়াচ্ছে তা থেকে ফিরে আসতে পারে। (সূরা রূম, ৩০:৪১)।

এ আয়াতের তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ফ্যাসাদ সৃষ্টির পরিণতি সম্পর্কে এই আয়াতে আমাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বর্তমান সমাজে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও কলুষতা যে রিবা'র প্রভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে তা অনুধাবন করতে আমাদের মোটেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তওরাতে রিবা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

সূরা আর-রূম ছাড়াও সূরা আন-নিসাতে (৪:১৬১) রিবা (সুদ) সম্পর্কে উদ্ধৃতি রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদি জাতিকে সরাসরি সুদী কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন যা তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সুদের মাধ্যমে বিনিয়োগ বা অর্থ লেনদেন করা একটি মারাত্মক অপরাধ। এই জঘন্য অপরাধে

ইহুদিদের সম্পৃক্ত থাকার কারণে এই গুণাহর বিষয়টি পুনর্ব্যাক্ত করা হয়েছে। নবী (স) মদিনায় হিযরত করার পর পরই তাঁর কাছে ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত এই সুদী ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ড় অহী নাযিল হয়।

মদিনার সমাজে রিবার প্রচলন ছিল অত্যাধিক। বাজারে ইহুদি ব্যবসায়ীরা সুদের কারবার করে বেশ প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল। তাছাড়া তখন মক্কা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রিবা'র (সুদ) দাপট ছিল প্রচন্ড। তথাপিও মদিনা মক্কার মত ততটা সমৃদ্ধশালী ছিল না। সে সুযোগে মক্কার ইহুদি ব্যবসায়ীরা মদিনাতে তাদের সুদী ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে নেয়। ফলে উৎপাদন, ভোগ্যপণ্য, কৃষিপণ্য সর্বক্ষেত্রেই এই সুদী-কর্মকান্ডের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে। মদিনা হিযরতের প্রাক্কালে এ বিষয়ে ইহুদি ধর্মযাজক আবদুলাহ বিন সালাম (রা) এর এই হাদীসটি উলেখযোগ্য:
তাবেঈ হযরত আবু বুরদা বিন আবু মুসা (রহ) বলেন: *একবার মদিনায় এসে আমি সাহাবী আবদুলাহ্ বিন সালাম (রা) এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন,* "তুমি এমন এলাকায় বাস করছ যেখানে রিবার প্রচলন অনেক বেশী। অতএব কেউ তোমার কাছে ঋণী থাকলে, সে তোমাকে এক ছড়া খড় কিংবা এক বস্ড় যব অথবা সামান্য একছড়া ঘাসও যদি উপহার দেয়, তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ তা রিবা" (সহীহ বুখারী)।

তওরাতে রিবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও ইহুদিরা আলাহ্ তা'আলার এ নিষিদ্ধ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুদী অর্থ ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। এ কারণে তারা তওরাতের আয়াতকে পরিবর্তন করতেও পিছপা হয়নি। ইহুদিরা তওরাতে বর্ণিত বিধান বিকৃত করে উপস্থাপন করার পর আলাহ্ তা'আলা সূরা আন-নিসা'য় বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে এই বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি এই বলেও হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও যারা এ ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তারা মূলত নিজের দ্বীন থেকেই বিচ্যুত হয়ে যায় এবং কুফরে লিপ্ত হয়, এভাবে যারা কুফরে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্ড়ি অপেক্ষা করছে।
যারা ইহুদি হয়েছে তাদের মধ্য থেকে তাদের নিজেদের যুলুম অত্যাচারের কারণে এবং তারা অনেককে আলাহ্র পথ থেকে বাধা দেয়ার কারণে এবং যেহেতু তারা রিবা (সুদ) খায় (যদিও) এদের তা থেকে (কঠোর ভাবে) নিষেধ করা হয়েছিল। আর এরা অন্যের মাল সম্পদ ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করে। তাদের মধ্যে কাফিরদের জন্যে আমরা কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি।
কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের দ্বীনের সুগভীর ইলম (জ্ঞান) রয়েছে ও মু'মিনরা যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান আনে (হে নবী) যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (কুর'আনুল মাজীদ) এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এসব মু'মিনগণ সলাহ্ কায়েম কারী, যাকাত আদায়কারী এবং আলাহ্ ও আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী। তারাই সেসব লোক যাদেরকে আমি মহা পুরস্কার দান করবো। (সূরা নিসা, ৪:১৬০-৬৩)।

এ আয়াতগুলি থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। রিবা-নির্ভর অর্থ ব্যবস্থা মানুষের কাছে যদিও বেশ লোভনীয় ও মনোহর মনে হয় । রিবাখোর বা সুদখোরেরা মনে করে যে সুদের কারণে তাদের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু রিবা বা সুদ খাওয়া কখনও কল্যাণকর হতে পারে না বরং এটি নীতি বিবর্জিত, অবৈধ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ। কারণ, সুদের মাধ্যমে সম্পদের যে বৃদ্ধি ঘটে তা মূলত প্রতারণা ও অপরের সম্পদ গ্রাসের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুদী-লেনদেন সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি ও চুরি এবং নৈতিকতাহীন চুড়ান্ত একটি প্রতারণার বিষয়। ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণদান সংস্থাগুলি যখন সুদী ঋণ দেয়, তখন নিজস্ব কোন চেষ্টা, শ্রম ও ঝুঁকী ছাড়াই সে সকল সংস্থাগুলি ঋণ গ্রহীতাকে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছিল সে টাকার সাথে সময় বাড়ার সাথে সাথে আপনিতেই বাড়তে থাকে। তাদের সে টাকার বৃদ্ধি ঘটে কিভাবে? এই বৃদ্ধি ঘটে ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে। খেটে খাওয়া মানুষের শ্রম এবং সাধারণ মানুষের মালামাল ও সম্পত্তি শোষণের মাধ্যমে। রিবা ভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থার কারণে গরীব আরও গরীব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত পথে চললে এবং যথাযথ নিয়মে যাকাত- সাদাকা করলে তার বিনিময়ে আখিরাতে বহুগুণে বর্দ্ধিত হারে প্রতিদান পাবার আশা করা যায়। সুদী ঋণের কিস্তি পরিশোধে ঋণগ্রহীতাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত তার রিয্ক থেকে যা ব্যয় করতে হয় তা ফিরে পাবার কোনই পথ থাকে না। উপরন্তু তার রিয্ক থেকে সুদের কিস্তি পরিশোধের কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বিয়োজিত হয়। আর ঋণগ্রহীতার রিয্ক থেকে বিয়োজিত হওয়ার কারণে তার যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতিই হচ্ছে ঋণদাতার মুনাফা। অপরদিকে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় যাকাত আদায় করে বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার রিয্ককে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।[১]

১ কাফিরদের শেখানো বুলির অনুকরণে বর্তমান সমাজে অনেকেই এমন কথা বলার ধৃষ্টতা দেখান যে, নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও 'বাকী'র খাতায় ফাঁকী (নাউযুবিল্লাহ)। বাকীতে পাওয়া যাবে বলে আখিরাতে বহুগুণে বর্দ্ধিত হারে এই প্রাপ্তি বোধ ঈমানী দুর্বলতার কারণে অনেকের মনেই কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেনা। তাই এই সকল দুর্বল ঈমানের মানুষগুলি রিবার মত জঘন্য গুণাহে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে।

ইহুদিদের কিতাবে এর আগে সরাসরিভাবেই এই রিবাযুক্ত বিকৃত অর্থ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছিল। কিন্তু সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে সে সকল আয়াতগুলি ইহুদিগণ বদলে দিয়েছিল। অতপর নিজেদের সুবিধামত বিধি বিধান নিজেরা রচনা করে আল্লাহ্র কিতাব বলে প্রচার করেছিল। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাকারার মাধ্যমে তাদের প্রতারণা প্রকাশ করে দুনিয়াবাসীকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ জেনেও সে সকল কাজ চালিয়ে যাওয়া সীমালংঘন এবং আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট বাণীকে বদল করা (সামান্য বৈষয়িক উন্নতির জন্য) মারাত্মক জঘন্য কাজ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে:

হে বনী ইসরাইল তোমাদের প্রতি আমার যে নি'আমাত দিয়েছি সে নি'আমাতের কথা স্মরণ কর। আর আমাকে দেয়া তোমাদের ওয়াদা তোমরা পূর্ণ কর আমিও তোমাদের

প্রতি দেয়া আমার ওয়াদা পূর্ণ করবো আর শুধুমাত্র আমাকেই ভয় কর। আর আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনো (এ কিতাব) তোমাদের কাছে যা আছে সে কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী। অতএব তোমরাই এই কিতাবের সর্বপ্রথম অমান্যকারী হয়োনা; (পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজেরা রচনা করে) তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াতকে বিক্রি করোনা; এবং আমার ক্রোধের কারণ হয়োনা। আর শুধুমাত্র আমাকেই ভয় কর। আর হক বা সত্যকে বাতিলের (মিথ্যার) সাথে মিশ্রিত করোনা এবং জেনেবুঝে সত্যকে ঢেকে দিয়ো না। আর তোমরা সলাহ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং র্ল্কুকারীদের (সলাহ আদায়কারীদের) সাথে তোমরাও র্ল্কু কর। তোমরা কি অন্য লোকদের সৎকাজ করার আদেশ দাও? অথচ নিজেরা ভুলে যাচ্ছ (সৎআমল করার গুর্ল্ত্ব)? তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব তিলাওয়াত কর না? (সূরা বাকারা, ২:৪০-৪৪)।

ইসরাইল জাতি বা ইহুদিদের জন্য রিবা সম্পর্কিত সঠিক নির্দেশাবলী যে তওরাতে ছিল তা নিম্নলিখিত আয়াতগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

যদি তোমাদের ভাই ইসরাইলীদের কোন রকম বিপদ উপস্থিত হয়, সে সময় যদি তোমরা তাদের অন্ন ও বাসস্থান দিয়ে সাহায্য কর তাহলে তাদের জন্য সে খরচের উপর সুদ (রিবা) চেও না। ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে সাবধান থেকো। তোমাদের ভাইদেরও তোমাদের সাথে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাদের কাছ থেকে কোন সুদ (রিবা) গ্রহণ করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। (তওরাত, লেবীয়, ২৫:৩৫:৭)

আরো তওরাতের হিজরত ২২:২৪-এ বলা হয়েছে:

আর যদি তুমি কোন গরীব প্রতিবেশীকে টাকা ধার দাও, তার প্রতি কঠোর হয়ো না, তার উপর সুদের (রিবা) বোঝা চাপিও না।

সবশেষে তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১৯-২০-এ রিবা প্রসঙ্গে এসে বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি করা হয়:

ইসরাইলী ভাইদের কাছ থেকে সুদ (রিবা) নিও না। যদি তুমি তাদের টাকা ধার দাও তো বিনা স্বার্থেই দেবে। তবে তুমি যদি কোন বিদেশীকে টাকা ধার দাও তার কাছ থেকে সুদ (রিবা) নিতে পারো। তোমার ভাইদের যখনই প্রয়োজন তাদেরকে বিনা সুদে (রিবা) টাকা ধার দাও হয়ত এ কারণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার সাথে থাকতে পারে।

তওরাতের এই বাণী থেকে যারা ইহুদি নয় তাদের কাছ থেকে সুদ নেয়া হারাম নয় বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে বলে তারা দাবী করে কুরআনের নির্দেশনা তাতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই ঘোষণা যে সম্পূর্ণ মনগড়া, মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তওরাতকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কোন

বাণীকে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করার কঠোর শাস্ড়ি সম্পর্কে কুরআনের আয়াতগুলি থেকে আমরা জানতে পারি।

অতএব তাদেরকে যা বলা হয়েছিল আমরা তাদের উপর তাই ন্াযিল করলাম, কিন্তু যালিমরা তা পরিবর্তন করে দিল এবং তার বদলে অন্যকিছু লিখে ফেলল, শেষ পর্যন্ড় আমরা এ সকল যালিমদের উপর আসমান হতে আযাব নাযিল করে পাকড়াও করলাম, আর তা ছিল তাদের অবাধ্যতার শাস্ড়ি। (সূরা বাকারা, ২:৫৯)।

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র দেয়া কিতাবে তিনি যে আদেশ নিষেধ নাযিল করেছেন তা হতে গোপন করে এবং তা দিয়ে সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থ ক্রয় করে, তারা নিশ্চিতই নিজেদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করে (আগুন খায়), ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে অতীব কষ্টদায়ক শাস্ড়ি। (সূরা বাকারা, ২:১৭৪)।

রিবা ভিত্তিক লেনদেন, সম্পদের প্রতি লোভ লালসা ও সম্পদ কুক্ষিগত রাখার প্রবণতা আল্লাহ্ তা'আলা মোটেও পছন্দ করেন না। মানুষের এ ধরনের বেশ কিছু কু আচরণ লক্ষ্য করে মক্কায় নাযিলকৃত সূরা আল-হুমাযাহ'য় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন এবং এসকল লোকদের জন্য ধ্বংস যে অনিবার্য তা ঘোষণা করেছেন:

ধ্বংস প্রত্যেক সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে দোষ প্রচারকারীর জন্য। যে মাল-সম্পদ জমা করে রাখে এবং বার বার তা গুনে গুনে দেখে। সে মনে করে তার মাল-সম্পদ (তার কাছে চিরকাল থাকবে তাই অন্য কেউ তো নয়ই আল্লাহ্ও তাকে দরিদ্র বানাতে পারবেনা) তাকে চিরস্থায়ী ধনী বানিয়ে রাখবে। কখনও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাহ্য়। আর আপনি কি জানেন সে হুতামাহটা কি? (সেটা হলো) আল্লাহর আগুন (যা) প্রচন্ড উত্তপ্ত, উৎক্ষিপ্ত। যা পৌছে যাবে (কুমন্ত্রণার উৎস) অন্ড়র সমূহে। নিশ্চয়ই (তাদের হুতামাহ্র মধ্যে ফেলে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে অবরম্বদ্ধ করে দেয়া হবে। এবং তাতে গেড়ে দেয়া হবে উঁচু উঁচু স্ড়ম্ভ (যেন তারা উঠে আসতে না পারে) এবং সেখানেই সে প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে যাতে তারা শাসরম্বদ্ধকর অবস্থায় পতিত হয়। (সূরা হুমাযাহ, ১০৪:১-৮)।

এখানে উল্লেখ্য যে কুর'আনুল কারীমে এ বিষয়ে ইহুদি সম্প্রদায়কে রিবা গ্রহণের কারণে সরাসরি দোষারোপ ও অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে আল-কুর'আনের অপর আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে:

(ইহুদিদের চরিত্র হচ্ছে) এরা (যেমন) মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ড়, (তেমনি) এরা হারাম মাল খেতেও ওস্ড়াদ। এরা যদি কখনো (কোন বিচার নিয়ে) তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার করতে পারো, কিংবা তাদের ফিরিয়েও দিতে পারো, যদি তুমি তাদের ফিরিয়ে দাও, তাহলে (তুমি নিশ্চিন্ড় থাকো) এরা তোমার কোনোই অনিষ্ট করতে পারবে না, তবে যদি তুমি তাদের বিচার ফায়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়-বিচারকদের ভালবাসেন। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৪২)।

তাদের অনেককেই তুমি দেখতে পাবে, গোনাহের কাজ, যুলুম, সীমালংঘন ও হারাম মাল (যথা ঘুষ, রিবা) ভক্ষণে দ্র“ত ধাবিত হয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলেছে। তারা যা করে চলেছে অবশ্যই তা অতীব নিকৃষ্ট কাজ। (সূরা মাইদাহ্‌, ৫:৬২)।

আল-কুর’আনে ইহুদি ধর্মযাজকদের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে:

তাদের ধর্মযাজকগণ ও শিক্ষিত সমাজ কেন তাদেরকে গুনাহের কাজ ও গুনাহ্‌র কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ থেকে বিরত রাখেনা? তাদের কর্মকান্ড ও তারা যা কিছু রচনা করে এসেছে তা খুবই নিকৃষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক। (সূরা মাইদাহ্‌, ৫:৬৩)।

আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদের কিতাব তওরাতেও রিবা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন যা আল-কুরআনে পুর্নব্যাক্ত করা হয়েছে। বস্তুত তারা আল্লাহ্‌ তা‘আলার নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে রিবাতে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের উপর প্রেরীত নবী মুসা (আ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মূলত সকল আসমানী কিতাবই একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত কাজেই সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য থাকতে পারে না। মুসা (আ) ছাড়া অন্যান্য নবীদের কাছে প্রেরীত কিতাবেও আল্লাহ্‌ তা‘আলা রিবাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ইহুদিরা সে সকল কিতাবের বিষয়বস্তু পাল্টে দিয়ে তাদের সকলের সাথেই কুফরী করেছে।

হযরত দাউদ (আ) এর উপর নাযিলকৃত (যাবুর) কিতাবে রিবা’র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

শুধুমাত্র বনী ইসরাইল জাতির জন্য নয় আল্লাহ্‌ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরীত অন্যান্য কিতাবেও রিবা’ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত দাউদ (আ) এর উপর নাযিলকৃত যাবুর কিতাবে যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে মুসা (আ) এর কাছে প্রেরিত তওরাতেও রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একই প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়। রিবা বা সুদ সম্পর্কে সেখানে বলা আছে– Psalm 15

ঈশ্বর যিনি চিরন্তন অদ্বিতীয়,   কারা তার কাছে আশ্রয় পাবার যোগ্য?

যারা সরল পথে চলে, যা সঠিক সেই কাজটি করে, যারা অন্তর থেকে সর্বদা সত্য কথা বলে;

যারা প্রতিবেশীদের সম্পর্কে মিথ্যা কলঙ্ক রটায় না, কারো কোন ক্ষতি করে না,

কখনো বন্ধুর নিন্দা করে না, যারা দুষ্টদের ঘৃণা করে, কিন্তু যারা ঈশ্বরভীর" তাদের শ্রদ্ধা করে,

যারা যে কোন মূল্যে নিজের প্রতিশ্র"তি রক্ষা করে চলে, যারা বিনা সুদে টাকা ধার দেয় এবং যারা ঘুষ খায় না।

যারা এ রকম আচরণ করে তাদের ভীত হতে হবে না (তারা অটুট বিশ্বাসীদের অন্ড়র্গত)।

দুল কিফ্‌ল এবং রিবা

আল্লাহ্ তা'আলা বনি ইসরাইলদের জন্য যুল কিফ্‌ল নামক একজন নবী পাঠিয়েছিলেন যিনি হেজকিল নামে তাদের নিকট পরিচিত। রিবা ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে উপদেশ দিয়ে গেছেন:

যদি সে মানুষ সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয়, যদি সে সর্বদা ঠিক কাজটি করে, যদি সে পরিমিত আহার করে, যদি সে ইজরাইলীদের প্রতি কোন ক্ষতিকর আচরণ না করে, প্রতিবেশী গৃহবধুদের প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, রজঃস্রাব চলাকালীন সময়ে নারীর নিকট গমন না করে, যদি সে কাউকে নিপীড়ন না করে, ঋণ পরিশোধে সর্বদা অগ্রগামী থাকে, অন্যায়ভাবে কারও কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে না নেয়, ক্ষুধার্থ মানুষকে অন্ন দেয়, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দেয়, যদি সে বিনা সুদে অর্থ ধার দেয় এবং সুদী কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয়, যদি সে মন্দ কাজ থেকে সর্বদা নিজেকে বিরত রাখে, বিচারকালে উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার করে, সর্বদা আমার আদেশ ও উপদেশ মেনে চলে সে মানুষই পুণ্যবান–সে মানুষ সত্যিই ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। (বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, হেজকিল, ১৮:৫-৯)।

বাইবেলের নতুন নিয়মে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা

বাইবেলের নতুন নিয়মেও রিবার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। রিবা প্রসঙ্গে উদাহরণ টেনে খ্রীষ্টানদের এই বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে কাঁচের ঘরে বসে অন্য কোথাও পাথর ছুঁড়ে মারা উচিত নয়। তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের অনুসারী ইহুদিদের রিবা বিষয়ক ধারণা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বরঞ্চ এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে:

তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো এবং তাদের মঙ্গল করো। (তোমাদের বিনিয়োগের উপর) কোন কিছুই ফিরে পাবার আশা না রেখে ধার দিয়ো। তাহলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমরা মহান ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টুদেরও দয়া করেন (যখন তারা দুষ্ট কাজ থেকে ফিরে আসে)। (ইঞ্জিল, লুক, ৬:৩৫)।

পরবর্তীকালে নতুন নিয়মে পরবর্তী উপাখ্যান থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তারা তাদের আদর্শ বা ধারণা থেকে শয়তানি প্রভাবে ক্রমশ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

একজন লোক বিদেশে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তার দাসদের ডেকে তার সমস্ড় সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিয়ে গেলেন। সেই দাসদের যোগ্যতা অনুসারে তিনি একজনকে পাঁচ হাজার, একজনকে দু'হাজার ও একজনকে এক হাজার টাকা দিলেন।

যে পাঁচ হাজার টাকা পেল, সে তা দিয়ে ব্যবসা করে আরও পাঁচ হাজার টাকা লাভ করলো। যে দু'হাজার টাকা পেল সেও একই ভাবে আরও দু'হাজার টাকা লাভ করলো। কিন্তু যে এক হাজার টাকা পেল সে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকাগুলি লুকিয়ে রাখলো।

অনেক দিন পর সেই মনিব এসে দাসদের কাছ থেকে হিসেব চাইলেন। যে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিল সে আরও পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসে বললো, আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। দেখুন আমি আরও পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছি। তখন মনিব তাকে বললেন বেশ করেছো। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ড় দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ড় বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেবো। এসো, আমার (সাথে) আনন্দে যোগ দাও। যে দু'হাজার টাকা পেয়েছিল সে এসে বললো আপনি আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়েছিলেন, দেখুন আমি আরও দু'হাজার টাকা লাভ করেছি। তখন তার মনিব তাকে বললেন বেশ করেছো। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ড় দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ড় বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেবো। এসো, আমার (সাথে) আনন্দে যোগ দাও। কিন্তু যে এক হাজার টাকা পেয়েছিল সে এসে বললো, কর্তা, আমি জানতাম আপনি ভয়ানক কঠিন লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেন নি সেখান থেকে ফসল তোলেন এবং যেখানে বীজ ছড়ান নি সেখান থেকে কুড়ান, এজন্য আমি ভয়ে মাটিতে টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই দেখুন আপনার জিনিষ আপনারই আছে। উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, দুষ্ট ও অলস দাস! তুমি তো জানতে যেখানে আমি বুনিনি সেখানে কাটি আর যেখানে ছড়াইনি সেখানে কুড়াই। তাহলে মহাজনদের কাছে টাকা রাখনি কেন? তা করলে তো আমি এসে টাকাও পেতাম এবং সংগে কিছু সুদও পেতাম.... (ইঞ্জিল, মথি-২৫:১৪-২৭)।

মথি কর্তৃক বিবৃত এই উপাখ্যানটি থেকে সুদের এই বিষয়টি ঈসা (আ) এর কাছে প্রেরীত কিতাবে রিবা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ধারণাটি উল্টে দিয়েছে। মহাজনের কাছ

থেকে প্রাপ্ত রিবা নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে না এমন ভাব বিবরণটিতে পরিদর্শিত হলেও এটি অবশ্যই রিবা। কেননা মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদ হস্ড়াত করাকে ব্যবসা বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। নতুন নিয়মে মথির বিবরণে যীশুর এই আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়ঃ

অতপর যীশু উপাসনা ঘরে (মসজিদ আল-আকসা) ঢুকলেন এবং সেখানে যারা কেনা-বেচা করছিল তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদল করে দেবার টেবিল....উল্টে দিয়ে বললেন....আমার ঘর শুধুই প্রার্থণার ঘর হওয়া উচিত, কিন্তু তোমরা এটাকে চোর-ডাকাতের আস্ড়ানা বানিয়ে ফেলেছ। (ইঞ্জিল, মথি-২১:১২-৩)।

সে সময় দু'ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। একটি লোকালয়ে ব্যবহৃত রোম সম্রাটের ছবি খোদাইকৃত মুদ্রা যা উপাসনালয়ে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, অন্যদিকে উপাসনালয়ে ব্যবহৃত ছবিবিহীন পবিত্র মুদ্রা, টাকা বদলকারীগণ এগুলি নানা ঠকবাজির সাহায্যে বদল করতো যা ছিল রিবার অর্ন্ড়ভুক্ত।

আল□াহ্ তা'আলার প্রদর্শিত পথ অনুসরণে ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদের সুদী লেনদেন থেকে ফিরে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। দুনিয়ায় মুসলিম শাসন বা দারুল-ইসলামের অস্ড়িত্ব যতদিন ছিল, ততদিন মুসলিমদের অধীনে থাকার দরুন ইহুদিরা সুদী কারবারে নিয়োজিত হতে পারেনি। স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের পর ইহুদিরা ইউরোপের নানা প্রান্ড়ে ছড়িয়ে যায় এবং সুদী কারবার শুরু করে। এতে খ্রীষ্টানরাও প্রভাবিত হয়, এভাবে এর বিস্ড়ৃতি ও কুপ্রভাব এতটাই প্রসার লাভ করে, যে কারণে প্রসিদ্ধ নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়ার 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নামক কালজয়ী নাটক রচনা করতে বাধ্য হন। এ বিষয়ে উলে□খ্য যে ফরাসী বিপ□বের প্রভাব সুদনির্ভর অর্থনীতিকে আরও অধিক পরিমাণে চাঙ্গা করে তোলে। বাইবেলের নতুন সংস্করণে রিবাকে আইনসিদ্ধ করার জন্য কিছু কিছু ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হলেও রোমান ক্যাথলিক উপাসনালয়গুলির রিবা বা সুদ বিরোধী ভূমিকা সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব রেখেছিল যা ফরাসী বিপ□বের মাধ্যমে পুরোপুরি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় এবং বাধ ভাঙ্গাঁ জোয়োরের মত রিবা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসী ও আমেরিকান বিপ□ব দ্বীন ও রাষ্ট্রিয় বিধি বিধান এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও আচরণের উপর এক যুগান্ড়কারী পরিবর্তন সাধন করে দেয়। ভন্ড মসীহ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মা'জুজ নামের যে দু'টি বৃহৎ অশুভ শক্তি তাদের অত্যাচার নিপীড়ন, শঠতা ও প্রতারণার মাধ্যমে এক ফ্যাসাদপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি করবে বলে কুর'আন ও হাদীসে যে ইঙ্গিত রয়েছে বিপ□ব দু'টির কারণে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ফ্যাসাদ তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ইয়াজুজ-মা'জুজ এর জুলুম সদৃশ এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা আজ গড়ে উঠেছে যা সচেতন ও আধ্যাত্মিক অর্ন্ড়দৃষ্টি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে সক্ষম। মধ্য যুগের ইউরো খ্রীষ্টান রাজ্যের সময় থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় পশ্চিমা সভ্যতার সময় পর্যন্ড় ইয়াজুজ মা'জুজ পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। ইউরোপ যে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে স্রষ্টা বিমুখ ও দুর্নীতিগ্রস্থ করেছে এটা কোন অজানা বিষয় নয়। কারণ এর প্রভাবে এমন সকল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে যেখানে আল□াহ্ তা'আলাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী না মেনে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বানানো হয়েছে যা সরাসরি শির্ক এর পর্যায়ভুক্ত। বিপ□ব দু'টির কারণে দ্বিতীয় যে বিপর্যয় ঘটেছে তা হলো সারা দুনিয়ায় রিবার ভয়ংকর ছোবলের বিস্ড়ার।[1]

বর্তমান দুনিয়ার রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, সম্পদ আর গোটা সমাজে প্রবাহিত হয় না। বরং শুধুমাত্র পুঁজিপতি ধনবানদের মাঝেই সম্পদ আবর্তিত হয়। ফলে পুঁজিপতি ধনীগণ ক্রমাগতভাবে ধনী হয়ে চলেছে আর দরিদ্ররা পরিণত হচ্ছে নিঃস্ব কাঙালে। সমকালীন ইতিহাসে যে শক্তিগুলির উত্থান ঘটেছে এবং যে শক্তিগুলি

১ কুর'আনুল কারীম এবং সহীহ হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হলো শেষ জমানায় যে সকল ঘটনা ঘটবে তার মাঝে রয়েছে পৃথিবীতে ভন্ড-মসীহ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মা'জুজের মুক্তিলাভ। মুক্তিলাভ করে তারা সারা দুনিয়ায় ক্রমাগত ভাবে অশুভ ক্ষমতা বিস্ড়ার করতে থাকবে। তারাই দুনিয়া শাসনের পরিকল্পনা করবে এবং সে পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করবে। সে সময় দাজ্জাল সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করবে ফলে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত হয়ে দাজ্জালের পরিকল্পনা অকপটে মেনে নিবে এবং তা বাস্ড় বায়ন করে চলবে। দাজ্জাল যে আধুনিক স্রষ্টা-বিমুখ ধর্ম নিরপেক্ষ এবং শির্ক-কুফ্র এর উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনাকারী এটা আজ দিবালোকের মত পরিস্কার। দ্বীনের বিধি বিধানের বিলোপ সাধন করে মানব রচিত আইন বিধান প্রনয়ন, রিবার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অত্যাচার নিপীড়নের ব্যাপক বিস্ড়ার, নৈতিক অবক্ষয়, যৌন অনাচার, আল□াহ্ বিমুখতা ও অন্যান্য ফেৎনা ফ্যাসাদ দাজ্জাল গঠিত বিশ্ব ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় বহন করে চলেছে।

ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে সে শক্তিগুলিই গোটা দুনিয়ায় রিবা ছড়িয়ে দিয়েছে। ইহুদিরা আজ সারা বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। ইহুদি জনগোষ্ঠী ব্যাংক নির্ভর অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে মূলত সুদী ঋণদানকেই প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

ইহুদিরা সর্বপ্রথম গোটা ইউরোপে তাদের সুদী কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠা করে। আর বর্তমানে তারা সুযোগ বুঝে এবং প্রয়োজনে আরো অধিক সুযোগ সৃষ্টি করে দুনিয়ার সর্বত্র সুদী ঋণদানের মাধ্যমে বিনাশ্রমে দরিদ্র ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সম্পদ শোষণ করে তাদের নিজেদের অর্থ সম্পদকে বাড়িয়ে নিচ্ছে। একটা সময় ছিল মানুষ হালাল হারামের বিধান মেনে চলত এবং সুদী লেনদেনকে ঘৃণা করতো। সুদী লেনদেন করা থেকে বিরত রাখত কিন্তু ফরাসী বিপ□বের পরে নীতিবোধ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সুদী কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বিস্ড়ার লাভ করে। পুরোপুরি সুদী অর্থ ব্যবস্থা জার্মানদের উপর এতটাই শোষণ নির্যাতন চালিয়েছিল যে, জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান হিটলার তখন ইহুদি নিধনে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন।

তথাপি রিবা-নির্ভর অর্থনীতি এবং তার প্রভাব ক্রমশ পাশ্চাত্য তথা সমগ্র বিশ্বে মোহজাল ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় ফলে মানবতা বিরোধী রিবাযুক্ত অর্থনীতি আন্ড়র্জাতিকভাবে সর্বত্র আজ জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসে আছে।

অর্থনীতিতে এই প্রকার অন্যায় আচরণের জন্য ইহুদিদেরকে কঠোরভাবে ঘৃণা করে মুসলিমদের সতর্ক করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে আয়াত নাযিল হয়:

আর তোমরা অন্যায়ভাবে তোমাদের পরস্পরের ধনসম্পদ ভক্ষণ করোনা এবং বিচারকদের সামনে এমন কোন তথ্য পেশ করোনা যাতে করে তোমরা অন্যের সম্পদের কোন অংশ জেনেশুনে বেআইনীভাবে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে। (সূরা বাকারা, ২:১৮৮)।

বস্তুত তওরাতে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ ও তওরাতের বাণী রদবদলের সময় থেকেই ইহুদিরা অনবরত রিবা ও নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এটি আরও চরম আকার ধারন করে যখন তারা নিজেদের মধ্যেও পরস্পর সুদী কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে গুইন্টার প্লাউট তওরাতে রিবা বিষয়ক নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন এক সময় ইহুদি যুগে ধর্মযাজকগণ সুদ নেয়ার বিপক্ষে প্রচারণা চালাতেন। সে সময় কোন ব্যক্তি সুদবিহীন ঋণ দিলে সে জান্নাতের নি'আমাত পেয়েছে বলে প্রশংসা করা হ'ত। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে সুদ গ্রহণ ও প্রদান বৈধ ঘোষণা করা হয়। এটা তওরাতের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে গুইন্টার মন্তব্য করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন্-নিসায় দুষ্ট ইহুদি কর্তৃক তওরাতে পরিববর্তিত রিবা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা পরিবর্তন সম্পর্কে মুসলিমদের হুশিয়ার করে দেন:

হে মু'মিনগণ তোমরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ (রিবা ও অন্যান্য প্রতারণার মাধ্যমে) অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না কেননা ব্যবসায়িক লেনদেন পরস্পরের বিশ্বাস ও সন্তুষের ভিত্তিতেই হওয়া আবশ্যক। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না (অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করে নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করো না)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম দয়ালু। (সূরা নিসা, ৪:২৯)।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আমরা একটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাই যে রিবা নয় বরং পারস্পরিক সৌহার্দ ও সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করে সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। রসুলুল্লাহ্ (স) রিবাকে হারামের চুড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে মানুষকে অর্থনৈতিক অবিচার ও নিপীড়ন মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা উপহার দিয়ে যান। এই অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ পুঁজিবাদী ধনীদের মাঝেই শুধু আবর্তিত হয়না বরং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সম্পদ (রিয্ক) গোটা সমাজে প্রবাহিত হয়ে দারিদ্র, অসহায়ত্ব প্রথাকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই অর্থ ব্যবস্থা ঘোষণা দেয় যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও প্রতারণার মাধ্যমে কোন লেনদেন ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং সমাজকে ব্যধিগ্রস্থ করে।

রিবার বিষাক্ত সংক্রমনে কলুষিত সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদ ক্রমশ বেড়ে গিয়ে বর্তমানে তা স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। ফলে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের পথে। এ ধরনের অশুভ কর্মকান্ডের পরিণতি হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

যে ব্যক্তিই অন্যায়, সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও যুলুমের সাথে এরূপ করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আগুনে নিক্ষেপ করে ঝলসে দেব এবং এ কাজ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খুবই সহজ। (সূরা নিসা, ৪:৩০)।

ইহুদিদের দ্বারা মুহাম্মদ (স) ও কুর'আনের রিবাকে হারাম ঘোষণা প্রত্যাখ্যান এবং নতুন উম্মাহ্‌র উদ্ভব

কুর'আনের বিধিসমূহ যেমন কিবলা পরিবর্তন, সিয়াম পালন বাধ্যতামূলক (ফরয), ইহুদিদের দ্বারা সৃষ্ট ও প্রচলিত রিবা ব্যবস্থা প্রত্যাখান, রিবা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়ার ফলে ইহুদিগণ ক্রমশ শঙ্কিত হতে থাকে।

মদিনায় হিযরতের পর আল-কুর'আনের আইন বিধান অনুযায়ী নবী (স) এর গৃহীত পদক্ষেপ, ইহুদি ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে সে সকল বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী করে তোলে। পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিমগণও জেরুজালেম মুখী হয়ে সলাহ্ আদায় করতেন। জেরুজালেম সকল মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নগরী যা খ্রীষ্টানদের কাছেও সমানভাবে পবিত্র এবং এই পবিত্র নগরীর দখলপ্রাপ্তি নিয়ে এর আগে বহুবার খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত তওরাতে উপবাস বা সাওম পালনের যে বিধান রয়েছে সে একই বিধান উল্লেখ করে নবী (স) প্রতি আয়াত নাযিল হওয়া। পূর্ববর্তী সময়ে তওরাতের বিধি অনুসারে এক সান্ধ্যকালীন সময় হতে পরবর্তী সান্ধ্যকালীন সময় পর্যন্ত সাওম পালন ও সেসময়ে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, পানাহার ও স্ত্রীগমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

ইহুদি নিয়ম অনুসারে তওরাতে লেবীয় (২৩:২৬-৩২)-র বর্ণনায় এখনও যে বিষয়ের সত্যতা মেলে তা হল তওরাতে মাসের নবম দিনে এক সান্ধ্যকালীন সময় থেকে অপর সান্ধ্যকালীন সময় পর্যন্ত পানাহার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখার অনুশীলন করতে বলা হয়েছে।

মদিনায় নবী (স) হিযরতের কিছুদিনের মধ্যেই হযরত মুহাম্মদ (স) কে নবী হিসেবে ইহুদিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বনি কাইনুকা গোত্রের ইহুদি র‌্যাবাই বা ধর্মযাজক হুসাইন বিন সালামের ইসলাম গ্রহণের পর পরই এই সত্য প্রকাশ পায়।

ইহুদি রব্বানী হুসাইন বিন সালাম (পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করেন এবং যিনি আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) নামে পরিচিত) উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মুহাম্মদ (স)

ই হলেন নির্দেশিত সেই নবী যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতে উল্লেখ করেছিলেন। সে নবী ইহুদি বংশীয় নন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইহুদিদের অবিবেচনা প্রসূত বিভিন্ন শয়তানি কর্মকান্ডের জন্য সে হক থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেছিলেন তাঁর বংশ হতে যেন পরবর্তী নবী রসুলদের জন্ম হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা দুষ্ট ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য তার এই দু'আ কবুল করেছিলেন। নিজেদের কৃতকর্মের জন্যই এই নবুয়্যাত ইহুদিদের হাতছাড়া হয়েছে এই নির্মম সত্যটি তিনি উপলব্ধি করে সপরিবারে মুহাম্মদ (স) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'আমার ওয়াদা যালিমদের জন্য নয়' শুধু এই একটি হুশিয়ার বাণীর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদি রাব্বি (ধর্মযাজক) ইব্নে সালামকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান করে দিয়েছিলেন।

যখন ইব্রাহীম (আ) কে তাঁর রব কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তাকে বললেন 'তোমাকে মানবজাতির নেতা করা হল'। তখন ইব্রাহীম বললেন, আমার সন্তানদের প্রতিও কি আপনার এই ওয়াদা? তিনি উত্তরে বললেন, "আমার ওয়াদা যালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়"। (২:১২৪)।

বেশীরভাগ ইহুদিই জুলুম নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেনি। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত সমূহে এর বৃত্তান্ত তুলে ধরেন:

অতপর তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতকে কুফরী (অস্বীকার) করে এবং অন্যায়ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নবী-রসুলদের হত্যা করে। এমনকি তারা তাদের অন্তর আবরণের মধ্যে সংরক্ষিত বলে দাবী করে। অথচ অন্যায় অবিচারের আধিক্যে আল্লাহ্ তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। আর এ কারণে তাদের খুব কম সংখ্যকই ঈমান আনবে। (৪:১৫৫)।

অতপর তাদের কুফরী এতটাই অগ্রসর হলো যে, মারইয়ামের উপর (জারজ সন্তান প্রসবের মত) জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ এনেছিল। (৪:১৫৬)।

আর তারা বলল আল্লাহর রসুল মারইয়াম বিন ঈসা মসীহকে আমরা হত্যা করেছি, অথচ না তারা তাকে হত্যা করেছে এবং না তাকে শুলে চড়িয়েছে বরং পুরো ঘটনাটা ছিল তাদের জন্য একটি গোলক ধাধা (কারণ শুলে চড়াবার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ) কে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছিলেন এবং প্রতারকদের একজনের চেহারা ইসা (আ) এর অনুরূপ করে দেন। ফলে হত্যাকারীরা তাকে চিনতে পারেনি এবং সঠিক ঘটনা না জানার কারণে যারা মতবিরোধ করেছিল তারাও এতে সন্দেহে পতিত হল)। অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া তাদের কাছে সঠিক কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটাই নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করতে পারে নি। (৪:১৫৭)।

বরং (আসল ঘটনা ছিল এই যে) আল□াহ্ তা'আলা শশরীরে তাঁকে তার নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন, আল□াহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়। (৪:১৫৮)।

(এ) আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবে না, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে ইসা মসীহ (আ) এর (সম্পর্কে আল□াহ্ তা'আলার এ কথার) ওপর ঈমান আনবে না। কিয়ামাতের দিন সে নিজেই এদের উপর সাক্ষী হবে। (৪:১৫৯)।

ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের জন্য এমন অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল ছিল। এটা এ কারণে যে, এরা বহু মানুষকে আল□াহ্ তা'আলার পথ থেকে বিরত রেখেছে। (৪:১৬০)।

যেহেতু এরা (লেনদেনে) রিবা বা সুদ গ্রহণ করে, যা সুস্পষ্টভাবে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা অন্যের মাল-সম্পদ ধোঁকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করে। তাদের মধ্যে (এ সব অপরাধে লিপ্ত) কাফিরদের জন্যে আমি তাই কঠিন আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (৪:১৬১)।

আবদুল□াহ বিন সালাম ইহুদি দম্ভকে উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করেন যখন তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে মুহাম্মদ (স) হলেন তাদের কিতাবে নির্দেশিত শেষ নবী এবং আরো উপলব্ধি করতে পারলেন সেই পরম সত্য কুর'আনের বিবৃত আছে:

যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা মুহাম্মদকে নবী রূপে চিনতে পারে, যেমনি চিনতে পারে নিজেদের সন্ড়নদেরকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করেছে। (সূরা বাকারা, ২:১৪৬)।

ইহুদিগণ এটা কখনও মেনে নিতে পারেনি যে আল□াহ্র প্রেরীত শেষ নবী বনী ইসরাইল বংশে না জন্মে একজন আরব বংশীয় হবে। মূলত তাদের অহমিকা ও মন্দ কাজের প্রতি দুর্বলতা সব সময়ই তাদেরকে বিপথে চালিত করে এসেছে। ইহুদিরা হলো সকল কুকর্মের হোতা। রিবাতে অবগাহন করা তাদের শয়তানি কাজ কারবারের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

যখন আবদুল□াহ বিন সালাম মুহাম্মদ (স) এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তখন তার সঙ্গে সঙ্গে নবী (স) কে তার অন্ড়রে লুকানো ভীতির কথাও জানালেন। তিনি ছিলেন ইহুদি রব্বানী বা ধর্মযাজক। তার অনুসারীদের তিনি যে শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন, ইসলাম গ্রহণে তারা তাকে মিথ্যেবাদী হিসেবে অপবাদ দিতে পারে, অথচ তিনি জানেন নিজ দ্বীনের সত্যকে উপলব্ধি করেই তিনি তাকে শেষ নবী (স) হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন। নবী (স) কিছু ইহুদি না আসা পর্যন্ড় অপেক্ষা করলেন, পরবর্তীতে কিছু ইহুদি আসলে তিনি তাদেরকে তাদের রব্বানী সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যুত্তরে তারা সকলেই বলল তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল, আমাদের প্রধান রব্বানীর পুত্র ও অন্যতম প্রধান রব্বানীগণের একজন বলে অভিহিত করলো।

মুহাম্মদ (স) বললেন তোমরা যদি দেখ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাহলে তোমরা কি বলবে? তারা সমস্বরে বলে উঠলো, ঈশ্বর যেন এটা না করেন। এটা কখনো সম্ভব নয়। সে মুহুর্তে আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বের হয়ে এলেন এবং তাদের জানালেন যে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রেরিত শেষ নবী মুহাম্মদ (স) কে স্বীকার করে নিয়েছেন, এতে উপস্থিত ইহুদিরা রেগে গেল এবং তারা জানালো তাদের এই রব্বী ছিল সবচেয়ে মিথ্যেবাদী, সবচেয়ে নিকৃষ্ট, এভাবে বিভিন্ন কথা বলে তারা তাকে অপমানিত করলো ও মুহাম্মদ (স) এবং কুর'আন এর প্রতি আরো বেশী অবিশ্বাস ও অনীহা প্রকাশ করে কুর'আন থেকে আরো দূরে চলে গেল।

অতপর শুধু মুখে কুর'আন ও মুহাম্মদ (স) কে অস্বীকার করাই নয় ইহুদিরা ইসলামকে নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল যা আজো বিরাজমান। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা দেন যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ:

নিশ্চয়ই আমরা (অধিক মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝাতে আরবী ভাষার প্রকাশ ভঙ্গী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন) মুসাকে কিতাব দান করেছি এবং ক্রমাগতভাবে নবী-রসুল পাঠিয়েছি। অতপর আমরা মারিয়ামকে প্রেরণ করেছি এবং পবিত্র রূহ (অর্থ আদেশ, ওয়াহী বা জীব্রীল আ) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। এরপরও (কি এমন হওয়া উচিৎ ছিল) যখনই তোমাদের (ইহুদিদের) কাছে তা (ওয়াহী, আদেশ) নিয়ে কোন রসুল এসেছে তোমরা তাদের সাথে অহংকার দেখালে, (তোমাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলাতে) তাদের অপছন্দ করলে, তাদের কতককে অমান্য করলে এবং কতককে মেরে ফেললে। আর তারা (ইহুদিরা) বলল আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত (সুরক্ষিত) রয়েছে। বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লা'নত (অভিশাপ) করেছেন তাই তাদের মাঝে কম লোকই আছে যারা ঈমান আনবে। আর তাদের কাছে যখনই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হলো যা তাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাবের (তওরাতের) সত্যায়ণকারী। এই কিতাব (কুর'আন) নাযিল হওয়ার পূর্বে তারা নিজেরাই অন্য কাফিরদের মুকাবিলায় সাহায্য ও বিজয় লাভের কামনা করতো। অথচ যখন তা (কুর'আন) তাদের কাছে আসলো তখন তা তারা চিনতে পেরেও তাকে (কুর'আনকে) অমান্য করলো। আর (যারাই কুর'আনকে অস্বীকার করে) সকল কাফিরদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নাত। তারা যার বিনিময়ে নিজেদের মন প্রাণকে বিক্রি করছে তা কতই না নিকৃষ্ট। শুধুমাত্র জেদের (গোড়ামীর) কারণে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা বিধি বিধান অমান্য করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই নবুয়াত দান করে অনুগ্রহ করেন। তাদের কুফরীর কারণে তারা গজবের উপর গজব দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব। (সূরা বাকারা, ২:৮৭-৯০)।

কিছুদিন পরেই ২য় হিজরীর সাবান মাসে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সলাহ্ আদায়ের দিক (কিবলা) জেরুজালেম থেকে মক্কায় কাবা ঘরের দিকে পরিবর্তিত হয়।

আর এভাবেই তোমাদেরকে আমরা বানিয়েছি মধ্যমপন্থী উম্মাহ (জাতি) যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের সাক্ষী হও আর রসুল (স) যেন তোমাদের সাক্ষী হন। পূর্বে আমরা যেদিকে কিবলা বানিয়ে ছিলাম এজন্য যেন জানতে পারি কে রসুল (স) অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়। (সূরা বাকারা, ২:১৪৩)।

যারা মুহাম্মদ (স) কে প্রত্যাখ্যান করল এবং জের‍ুজালেমকেই তাদের কিবলা হিসেবে অপরিবর্তিত রাখল তারা এই উম্মাহ্‌র বহির্ভূত। অভ্যন্তরীণ শক্তি সঞ্চয় করে সংঘবদ্ধ হয়ে তবেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহিঃশক্তির মোকাবিলা করা যায় এই শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ সময় রমাদান মাসে সিয়াম ফরজ করা হ'ল। তার পরপরই রিবা ব্যবস্থা প্রচলনের বিপক্ষে পুনরায় মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌ হুশিয়ার করে দেন।

আর তোমরা বাতিল পন্থায় (ঘুষ, রিবা ও অন্যান্য প্রতারণার মাধ্যমে) তোমাদের পরস্পরের মালসম্পদ গ্রাস করো না এবং এসকল মাল গ্রাস করার লক্ষ্যে তা নিয়ে বিচারকের সামনে পেশ করোনা যে, তোমরা অপরের অংশ (অন্যায় অবিচার) গুণাহের সাথে জেনে বুঝে ভোগ-দখল করার সুযোগ পাবে"। (সূরা বাকারা, ২:১৮৮)।

পরিশেষে ইহুদিদের রিবা বিষয়ক কর্মকান্ড ও অর্থনীতি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রেরিত বান্দা ও রসুল মুহাম্মদ (স) এর অনুসারী হয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ও নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করলো ইসলামের ছায়াতলে যে জাতি তা হল মুসলিম জাতি। যা সমগ্র মানব সমাজে রহমাতস্বরূপ। মুহাম্মদ (স) এর নেতৃত্বে মুসলিম জাতি রিবা যুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছে। মুসলিমগণই রিবা মুক্ত জীবন যাত্রার উত্তম মডেল হিসেবে সমগ্র মানবজাতির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিম জাতিকে হুশিয়ার ও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা রিবা বা সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার ধুম্রজালে মুসলিম জাতিকে ক্রমাগতভাবে বিভ্রান্ত করতে থাকবে।[১]

আর মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা কর তা দিয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করোনা। তারা যেন ফিৎনায় ফেলে আল্লাহর নাযিল করা হিদায়াত হতে তোমাদেরকে একবিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে, অতপর তারা যদি (তোমার বিচার ফায়সালা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা চান তাদের গুনাহ্‌র জন্য তাদেরকে আযাব-মুসিবাতে পাকড়াও করতে। নিশ্চয়ই অধিকাংশ লোকই ফাসিক। (৫:৪৯-৫০)।

কুর'আনুল কারীমে রিবাকে হারাম ঘোষণার (নিষেধাজ্ঞার) দ্বিতীয় ধাপ

দ্বিতীয় ধাপে রিবার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে কুর'আনের সূরা 'আলে ইমরান'-এ উল্লেখ রয়েছে এবং এটা (৩য় হিঃ) উহুদ-এর যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর নাযিল হয়েছিল। রিবার ফলে যে সব অন্যায় অবিচার ও অনৈতিক কর্মকান্ড

সাধিত হয় মূলত সেগুলি জানানোর মাধ্যমে রিবা নির্মূলে মানুষকে উৎসাহ দান করাই এই আয়াত নাযিলের মূল উদ্দেশ্য।

১ বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা বুঝতে পারছে না যে তারা রিবার সেই ধুম্রজালে আটকে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। মাইক্রেক্রেডিট এর বদৌলতে কত দরিদ্র পরিবার যে নিঃস্ব কাঙালে পরিণত হয়ে রাস্ড়ায় নেমেছে তার প্রকৃত হিসেব আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। শুধু যারা সচেতন তারা দেখতে পাবেন গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক এবং অন্যান্য NGO বা কথিত উন্নয়ন সংস্থাগুলি দরিদ্রদের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ শোষণ করে নিয়ে তৈরী করছে BRAC Tower, Grameen Tower। এ বিষয়ে কারোর প্রতিবাদের ভাষা নেই। কেননা যারা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখেন তারা তাদেরই সহযোগী। আর এরা যাদের শোষণ করে চলেছে সেই দরিদ্র জনগণের না আছে শিক্ষার জোর না আছে কণ্ঠের জোর। তারা নীরবে নিভৃতেই কেঁদে মরে। এটাই রিবার মাঝে লুকিয়ে থাকা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। রিবা ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাই এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্ড়ারের মূল চালিকা শক্তি।

হে লোকসকল তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা (বিনা পরিশ্রমে) সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে রিবা ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পার। আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরী আগুনকে ভয় কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মেনে চল যাতে তোমরা আল্লাহর রহমাত প্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৩০-৩২)।

একজন ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে কৌশলে কিংবা জোর পূর্বক বা ভীতি প্রদর্শন করে লগ্নীকৃত অংকের উপর পরিমাণ যাই হোক, দ্বিগুণ, তিনগুণ বা তারও অধিক সুদ আদায় করা অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ। রিবা বা সুদ আদায় ঋণগ্রহনকারীর প্রতি যে চরম অন্যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার সীমালংঘন তা কুর'আনুল মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে কুর'আন রিবা বা সুদ আদান প্রদানকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তাতে বলা হয় হারাম ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেউ যদি রিবাযুক্ত লেনদেন করতে থাকে, তারা যেন জেনে রাখে যে রিবা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং রিবা লেনদেন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। তাছাড়া আখিরাতেও রিবাখোরদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যে সময় এই রিবাকে নিষিদ্ধ করার আইন প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রণয়নের পূর্বে যে সমস্ড় সুদী লেনদেনের চুক্তি হয়েছিল, সেগুলি আইনত বৈধ বলে বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে রিবা প্রদান করতে হয়েছিল। তবে যে সকল ঋণচুক্তি রিবাকে হারাম ঘোষণা সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের পরে হয়েছিল সেখানে রিবা গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়।

অতীতের চুক্তিগুলিতে রিবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে এর ফলে তৎকালীন অর্থনীতি তে হঠাৎ করে এ নিয়ম জারী করলে তৎকালে প্রচলিত

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারতো। কাফির বা অবিশ্বাসীরা এবং শোষক শ্রেণী সে সুযোগে ঐ নিষেধাজ্ঞার বির“দ্ধে জনমত সৃষ্টি করার প্রয়াস পেত।

দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে বা নিষেধাজ্ঞা জারী করে রিবা বিলুপ্ত করা সম্ভব হতো না, এর জন্য আরো প্রয়োজন ছিল রিবা বিলুপ্তকরণ প্রক্রিয়ায় মানসিক প্রস্তুতি, আত্ম বিশে□ষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ণ। তখন প্রয়োজন ছিল এক আধ্যাত্মিক বিপ□ব যা মানুষকে ঈমানী চেতনায় বলিয়ান করতে সক্ষম। কেননা আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনমতকে সুসংঘটিত করে কাংখিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া যতটা সহজ হঠাৎ আইন করে তা পালনে বাধ্য করা ততটা সহজ নয়।

রিবা বিলুপ্তকরণের দ্বিতীয় ধাপটি এ কারণেই ছয় বছর পর্যন্ড় সময় নিয়েছিল। এটুকু সময়ের মধ্যে আমরা দেখি যে পুরাতন রিবাযুক্ত ঋণগুলিকে বৈধ কিন্তু নুতনভাবে রিবাযুক্ত ঋণ চুক্তি গুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আসলে যারা সুদখোর, তাদের-কে নৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করাই এর কৌশল ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের হৃদয় ও অনুভুতিতে আঘাত করে তাদের মানবিকতাকে বিকশিত করা যাতে তারা নিজ থেকেই এই সুদ-এর দাবী পরিহার করে এবং রিবা নির্মূলে এগিয়ে আসে।

এটা আশ্চর্যজনক যে উইলিয়াম সেক্সপিয়ার তার প্রসিদ্ধ নাটক ‘‘মার্চেন্ট অব ভেনিস” - এ দ্বিতীয় ধাপের ন্যায় চমৎকাররূপে রিবা’র বিরূদ্ধাচারণ করেছেন। শাইলক নামের এক ইয়াহুদি অর্থ লগ্নিকারী মহাজন ভেনিস শহরে সুদের রমরমা ব্যবসা করত। ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণের বিপরীতে বন্ধক প্রদান (ঋণগ্রহণের অংকের পরিমানের থেকে বেশী কোন সম্পদ) করতে হত এবং ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে এই বন্ধকী মালগুলি বাজেয়াপ্ত করা হত।

শাইলকের বির“দ্ধবাদী এনটনিও নামক একজন খ্রীষ্টান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি প্রকাশ্যে শাইলকের এই সুদ ভিত্তিক ঋণের নিন্দা করতেন।

একদা বন্ধুকে বিপদ থেকে পরিত্রানের জন্য এন্টনিওর কিছু অর্থের প্রয়োজন হল। শাইলক দেখল, এন্টনিওর বদলা নেবার এ এক অপূর্ব সুযোগ। সে কিছু অর্থ প্রদানের জন্য চুক্তি করল এই শর্তে যে এই টাকা নির্ধারিত দিনের আগে পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু এন্টনিওর যাবতীয় সম্পদ জাহাজীকরণ ছিল কোন প্রকার বন্ধক এক্ষেত্রে দেয়া সম্ভব ছিল না। এই ঋণের বিপরীতে কোন সুদ ধার্য করা সম্ভব ছিল না। শাইলক এই সুযোগটাই নিল ঋণচুক্তির শর্ত হ’ল সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে এন্টনিওর বুকের এক পাউন্ড মাংস শাইলককে দিতে হবে। নির“পায় হয়ে এন্টনিও এই শর্তে রাজী হয়। এভাবেই চুক্তিটি সম্পন্ন হয় কিন্তু ঘটনাক্রমে এই ঋণ শোধ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হল না ফলে শাইলকের এন্টনিওর বুকের মাংসপিন্ডর উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এন্টনিও কিছুদিন পর খবর পেল যে তার জাহাজ ডুবি হয়ে সে সবই হারিয়েছে। এন্টনিও তখন এই ঋণটি পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করল। তখন শাইলক আদালতে এন্টনিওর মাংসপিন্ড দাবী করে বসল। ইয়াহুদি অর্থ-লগ্নীকারী ব্যবসায়ী তার কোন ঋণ অপরিশোধিত থাকতে দিতে পারে না। এই ঋণের বিপরীতে কোন প্রকার বন্ধকও রাখা হয় নি বিধায় ঋণ গ্রহনকারীকে যে নাকি তার ব্যবসা প্রকৃতির বিরোধিতা করতো, তাকে দৃষ্টান্ড়মূলক শাস্ড়ি প্রদানপূর্বক প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হল। এন্টনিও তখন বুঝতে পারলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হলেন যে ইয়াহুদি অর্থলগ্নিকারক আসলেই তার সাথে কোনরূপ মস্করা করে নি। সে সত্যিই তার বুকের মাংস পিন্ড কেটে নিতে চায়।

এখানে সেক্সপীয়র পোর্শিয়া নামক এক উকিলকে নিয়োগ করলেন। শাইলককে তিনি অনেকভাবে বুঝালেন, তার মানবিকতাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করলেন এবং তাকে দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু শাইলক আইনত তার রিবার বিপরীতে একখন্ড মাংস পায় তাই সে তার সিদ্ধান্ড়ে হয়ে রইল অনড়। যেটা সেক্সপীয়ার অভূতসুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সমগ্র ব্যাপারটিকে, একখন্ড মাংসকে রূপকচিত্র ধরে। পোর্শিয়া উপলব্ধি করেছিল এই দাবী শাইলকের নৈতিকতা এবং অন্ড়রকে কলুষিত করে ফেলেছে।

অবশেষে পোর্শিয়া উন্নততর মুল্যবোধের জন্য আবেদন করলেন যা কিনা আল-কুর'আনের রিবা বিষয়ক আয়াতের দ্বিতীয় ধাপের প্রচেষ্টার ধরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হতে পারে সেক্সপীয়র কুর'আনুল কারীমের এ বিষয়টি সম্পর্কে পড়েছেন এবং সেটা থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা তিনি গ্রহণ করেছেন।

পোর্শিয়া প্রথমেই স্বীকার করলেন যে ঋণটি অপরিশোধযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং চুক্তি অনুসারে শাইলক মাংসখন্ড দাবী করতে পারে। এরপর তিনি শাইলককে দয়া প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন যে এন্টনিওর বন্ধুমহল তাকে উক্ত ঋণের আসলের ২০ গুণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছেন। পোর্শিয়ার এই মানবিক আবেদনের পরও শাইলক তার একখন্ড মাংসের দাবী থেকে একটুও নড়লো না। কেননা শাইলকের হৃদয় ছিল পাথরের চেয়েও শক্ত। কুর'আনুল মাজিদে ইহুদিদের পাষাণ হৃদয় সম্পর্কে স্পষ্ট উলেখ রয়েছে:

কিন্তু এরূপ নিদর্শন দেখার পরেও তোমাদের মন শক্ত হয়ে গিয়েছে। পাথরের মত শক্ত কিংবা তার চেয়েও অধিকতর শক্ত। কেননা কোন কোন পাথর এমনও হয় যে তা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়ে তা হতে জলধারা উৎসরিত হয়। আবার কোন কোনটি আলাহ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে পতিত হয়। (২:৭৪)।

রিবা মানুষের মনুষত্ব, আবেগ ও মনকে কঠোর করে ফেলে এবং নৈতিকতা ধ্বংস করে ফেলে সেক্সপিয়রের লেখা এই কাহিনীটি থেকে আমরা তা জানতে পারি। ইহুদি শাইলক যে ছিল সুদখোর মহাজন, চুক্তিবলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে অপরাগ ব্যক্তির

বুক থেকে এক পাউন্ড মাংস পাবার অধিকার লাভ করে। যেহেতু চুক্তিতে শুধুমাত্র এক পাউন্ড মাংসের কথাই উলে□খ ছিল, সেহেতু তাকে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরানো ছাড়া শুধুমাত্র মাংস গ্রহণ এবং নিখুঁতভাবে এক পাউন্ড মাংসই বের করে নেবার অনুমতি দেয়া হল। তাকে বলে দেয়া হলো যদি ওজনে এর কমবেশী হয় অথবা এক বিন্দু রক্তও ঝরে তাহলে সে তার সম্পত্তির সবটাই হারাবে।

লোভী শাইলক উপায়ন্ড়র না দেখে আগের প্রস্ড়াব অনুযায়ী মূলধনের ২০ গুন পর্যন্ড় অর্থ গ্রহণে রাজী হয় কিন্তু ততক্ষণে সে প্রস্ড়াবের সময় পার হয়ে যায় ফলে শাইলক সবটাই হারালো।

তবে সেক্সপিয়র রচিত খ্রীষ্টান এন্টনিওর মহানুভবতা ও খ্রীষ্টধর্মের অপার ক্ষমা ও করুণার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে তা দেখাবার প্রেরণায় শাইলক ক্ষমালাভ করে, ক্রীষ্টধর্মে দিক্ষিত হয়ে মেয়েকে তার ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে দিয়ে কাহিনীর সফল ও সুখের পরিসমাপ্তি টানা হয়।

‘মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ নাটকে ঋণ গ্রহণকারীর জন্য এই সুখকর পরিণতি সেক্সপিয়র চিত্রিত করেছিলেন, কিন্তু তার সাথে আজকের বাস্ড়ব জীবনে ঋণগ্রহণকারীর জন্য এ ধরনের সুযোগ লাভ করা খুব কঠিন। শাইলক এবং শাইলকরূপী বিশ্ব অর্থনীতি মানুষের মানবতাকে উপেক্ষা করে অবলীলায় তার রক্ত মাংসকে শোষণ করে চলেছে। প্রধান শাইলক হিসেবে আজকের ব্যাংকগুলিকেই অভিহিত করা যায়। [যেগুলি প্রায় সবই ইহুদি অর্থায়নে পুষ্ট। বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বাংলাদেশের সমস্ড় ব্যাংক ইহুদি প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমা ব্যাংকিং নিয়মনীতিতেই পরিচালিত।]

এবার পুনরায় কুর’আন ও রিবা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কুর’আনের দৃষ্টিতে মহা জ্ঞানী আল□াহ্ তা‘আলা রিবাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করণের প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সময় প্রদান করেছিলেন। অর্থনীতিতে রিবাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার প্রাক্কালে সাত বছরের সময় সীমা হিসেব করা হয় সে সময়ের মধ্যে মানুষ যাতে মানসিক ভাবে রিবা বা সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে সক্ষম হয় আর এ সময়ের মধ্যে পাওনাদারকে সুদ সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করার কথাও ঘোষণা করা হয়। অবশেষে এই প্রক্রিয়ারই পরিপূর্ণ রূপ দান কল্পে মুহাম্মদ (স) রিবার অশুভ প্রভাব ও রিবার ধরনের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্ড়ারিতভাবে আলোচিত হবে ইনশাআল□াহ্।

কুরআনিক বিধি অনুযায়ী রিবা নিষিদ্ধকরণের তৃতীয় ধাপ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে রিবা’র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন

এটি বিশেষভাবে উলে্খ্য যে নবী (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার প্রায় তিনমাস পূর্বে দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে সমবেত বিশাল জনসভায় মুসলিম জাতিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলেন রিবা (সুদ) বর্জন করার জন্য। তিনি বলেছিলেন:

আমি জানিনা এভাবে (আপনাদের) সবার সাথে আবার কথা বলার সুযোগ আমার হবে কি না।... দরিদ্রকে শোষণকারী, অনৈতিকভাবে, অবৈধভাবে সম্পদ বৃদ্ধিকারী রিবার সংস্পর্শ আপনারা ত্যাগ করুন। এখন থেকে রিবা বা সুদ বাদ দিয়ে ঋণদাতাগণ, কেবলমাত্র মূলধন ফেরত নিবেন। রিবা বা সুদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূলধন ফেরত নিলে ঋণদাতার যেমন কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি হবে না, অপরদিকে সুদ মওকুফ করায় ঋণগ্রহীতার উপর কোনোরূপ আর্থিক ক্ষতি ও ঋণ পরিশোধে বাড়তি চাপ পড়বে না। রিবা মওকুফ করলে ঋণগ্রহীতাকে শোষণ করার মত চরম গুনাহের কাজ থেকে ঋণদাতা মুক্ত থাকবেন। উপরন্তু তিনি (ঋণদাতা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে বিশেষ প্রতিদান পাবেন আর্থিকভাবে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য। জেনে রাখুন আল্লাহ্ তা'আলা রিবাভিত্তিক সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আজ হতে আমি (আমার চাচা) আব্বাস বিন আবদুল্লাহ্র পাওনা সমস্ত রিবা বাতিল ঘোষণা করছি। তাই তিনি কেবল তার মূলধন ফেরত নিবেন।

ইতিপূর্বে সূরা আলে ইমরানে রিবা প্রত্যাখ্যান করার বিধি নাযিল হয়েছিল। এই বক্তব্যের মাধ্যমে নবী (স) রিবা নিষিদ্ধকারী বিধি-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটালেন। এভাবে রিবা নিষিদ্ধ করণের তৃতীয় এবং সর্বশেষ ধাপ সম্পন্ন হ'ল।

বিদায় হজ্জের মাস দুয়েক পর রিবা নিষিদ্ধকারী সর্বশেষ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা রিবা সংক্রান্ত সকল বিধি নিষেধকে পরিপূর্ণতা দান করেন এবং মুসলিমদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সবরকম সুদ বা রিবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদী লেনদেনে সুদ বা সার্ভিস চার্জ এর পরিমাণ (হার) সামান্য হলেও তা থেকে বিরত থাকাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। আল-কুর'আনের সর্বশেষ নাযিলকৃত এই আয়াত ক'টির মাধ্যমে পূর্বেকার পাওনা সব রিবা (সুদ) মওকুফ করে দেয়ার ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ এর পর থেকে (মুসলিম) সমাজে নতুন বা পুরাতন (বাকী) কোনো সুদ বা রিবা আর থাকলো না। মুসলিমদের তাদের পাওনা মূলধন ফেরত নিতে বলা হয়েছে কিন্তু অতীতের (পূর্বেকার পাওনা) সব রকম সুদ (তা যত সামান্যই হোক) অথবা সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা যদি দরিদ্র হয় এবং ঋণ পরিশোধে (সত্যিকারভাবে) অপারগ হয়, তবে ঋণদাতাকে যেন তার পাওনা (মূলধন) মাফ করে দেয় সে পরামর্শ দেয়া হয়েছে কেননা এর প্রতিদানে উত্তম পুরস্কার রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তৎকালীন সমাজের অনেকে সুদকে ব্যবসার মতই মনে করত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রিবা (সুদ) এবং ব্যবসার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দিষ্ট করেছেন পরবর্তী আয়াত সমূহে:

যারা তাদের সম্পত্তি থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে মুক্ত হাতে ব্যয় করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার তাদের রবের পক্ষ থেকে। তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। (সূরা আল বাকারা, ২:২৭৪)।

যারা রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় জীবনযাপন করে তাদের অবস্থা এমন হবে যেন তারা শয়তানের শয়তানীর প্রভাবে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা বলে ব্যবসা ত রিবারই মত। অথচ, আল□াহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর রিবাকে করেছেন হারাম। অতপর যখন তার রবের পক্ষ থেকে তার কাছে উপদেশ এসে গিয়েছে, সে যেন রিবা ভক্ষণ বর্জন করে। তবে পূর্বে যা কিছু (রিবা খেয়েছে তা তো খেয়েই ফেলেছে) হয়েছে সে ব্যাপারটি আল□াহ্র উপরই থাকবে। তবে যে (রিবা ভক্ষণের) পুনরাবৃত্তি করবে, নিশ্চিতই সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল□াহ্ তা'আলা বর্ধিত করেছেন সাদাকার কাজকে আর আল□াহ্ কোন কাফির গুনাহ্গার ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। (২:২৭৫-৭)।

হে মু'মিনগণ তোমরা আল□াহকে ভয় কর এবং তোমাদের কাছে যে রিবা বাকী আছে তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হও। আর যদি (রিবা ছেড়ে না দাও) তা না কর, তাহলে জেনে রাখ আল□াহ্ এবং তাঁর রসুল (স) রিবা ভক্ষণকারীদের বির—দ্ধে চিরস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর যদি তোমরা তাওবা কর তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই প্রাপ্য (তা আদায় করার অধিকার তোমাদের আছে) এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (২:২৭৯)।

আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তার সচ্ছলতা (সামর্থ্য) আসা পর্যন্ড় (ঋণ পরিশোধের) সময় দেবে। তবে যদি তোমরা তোমাদের পাওনা (অভাবী ঋণগ্রস্থদের জন্য মওকুফ) সাদাকা করে দাও তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, তোমরা যদি তা জানতে। (২:২৮০)।

আর সেদিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ থেকে আত্মরক্ষা কর যে দিন তোমরা আল□াহ্র কাছে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (তার কর্মফল) পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে এবং কখনো তোমাদের কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। (২:২৮১)।

এখানে উলে□খ্য যে আল□াহ্ তা'আলা রিবা নিষিদ্ধ করণের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিকভাবে এ বিষয়ে মানুষকে সাবধান করার যে আয়াত, পরবর্তীতে আল□াহ্র ও তাঁর প্রেরিত নবী (স) এর তরফ থেকে এ ধরনের কবিরা গুণাহ্তে লিপ্ত সকলের বির—দ্ধে চিরস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মূলত রিবাকে হারাম ঘোষণায় যতটা কঠিন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে অন্যকিছু হারাম ঘোষণা করার বেলায় ততটা কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হয়নি।

আল□াহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রেরিত নবী (স) এর পক্ষ থেকে যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তা অবশ্যই মু'মিনদের জন্য বিরাট তাৎপর্য বহন করে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তারা (মু'মিনরা) নিজেরা মনে-প্রাণে রিবা বা সুদী কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করবে এবং রিবা ভিত্তিক ব্যবসা ও অন্যান্য সকল রিবা ভিত্তিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার ভয়াবহ

পরিণাম রোধের জন্য আজীবন সচেষ্ট হবে। রিবা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় প্রথমে সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতে হবে এবং রিবাকে সার্বিকভাবে বয়কট বা প্রত্যাখ্যান করে রিবার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ অব্যাহত রাখতে হবে। যাতে করে রিবার গ্রাসে পতিত শোষিত, নিগৃহীত সাধারণ মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা চালায় রিবা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছল মু'মিনদের দায়িত্ব হ'ল এই শোষিত, নিপীড়িতদের জন্য সর্বাত্মক সহমর্মীতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (রহ) এ বিষয়ে সর্বদা সঠিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতারণার ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা হুজুরাতে বর্ণিত আয়াতটি উলে্খ করতেন:

মু'মিনদের দু'টো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করে দিবে, তাদের একটি দল যদি আরেক দলের উপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে, তার বির ্দ্ধেই তোমরা লড়াই করবে যতক্ষন পর্যন্ড় সে দলটি (পুরোপুরি ভাবে) আল্লাহ্র বিচার-ফায়সালার দিকে ফিরে না আসে। যদি সে দলটি আল্লাহ্র (আইনের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে তখন তোমরা বিবাদমান দল দু'টোর মাঝে ন্যায় বিচার করবে, কেননা আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকদের ভালবাসেন। (৪৯:৯)।

হযরত ঈসা (আ), ইমাম আল-মাহ্দী এবং রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিলুপ্তি

এটা লক্ষনীয় যে রিবা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ (স) যে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন, তা যে মু'মিনদের অনুভূতিতে শুধুমাত্র আশার সঞ্চার করেছে তা নয়, বরং রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা নির্মূল করার জন্য শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। নবী (স) সর্বপ্রথমে নিম্নবর্ণিত হাদিসে কৃত্রিম (কাগজ, প্লাস্টিক এবং ইলেকট্রনিক) মুদ্রার বিলুপ্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:

মিকদাম বিন মা'দিকারিব একদা আল্লাহ্র রসুল (স) কে বলতে শুনেছিলেন: *সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন মানুষের কাছে শুধুমাত্র দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) মূল্য থাকবে।* (আহমাদ)।

যদি প্রচুর পরিমাণে আসল মুদ্রা বাজার দখল করে নিতে পারে, তবে কৃত্রিম মুদ্রা পূর্বোলিখিত ঘটনার মতোই (বাস্পের মত) অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রকৃত পক্ষে আসল অর্থের প্রচলন হতে পারে তখনই, যখন প্রচুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত স্বর্ণের ভান্ডার আবিস্কার হয় এবং তা অনিয়িমিত ভাবে অর্থাৎ বাজারের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে কাগুজে মুদ্রা অকার্যকর হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহ্ (স) এই ঘটনাকে বিস্ড়রিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমি রসুল (স)-কে বলতে শুনেছি: *ফোরাত নদীর অববাহিকা অচিরেই সোনায় ভরে যাবে, কিন্তু সে এলাকার অধিবাসীরা তা ভোগ করতে পারবে না*।(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

উবাই বিন কাব (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *শীঘ্রই ফোরাত নদী হতে তার মধ্যস্থিত স্বর্নের পাহাড় বের হয়ে আসবে। এ কথা শোনামাত্র লোকজন সেদিকে ছুটতে শুরু করবে। এই স্বর্ণ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এ যুদ্ধে একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে এবং এই ঘটনার পরই কিয়ামাত সংঘটিত হবে*। (সহীহ মুসলিম ৭:৭০১২)।

আবু হুরাইরা (রা) আরো বলেছেন, তিনি রসুল (স)-কে বলতে শুনেছেন: *একসময় যমীন (ভূ-গর্ভ) বিশাল আকারের কলিজার টুকরা সদৃশ সোনা ও রূপা উদ্গীরণ করবে*। (সহীহ মুসলিম)।

রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা (সুদ ভিত্তিক কর্মকান্ডই) এমন যে তা আপনিতে অর্থ ব্যবস্থায় দুর্নীতি ডেকে আনে এবং সেই দুর্নীতিকে লালন-পালন করে। যার ফলে সমাজের কিছু দুর্নীতিবাজ লোক ছাড়া অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং শোষিত ও নিপীড়িত হয়। এ প্রসঙ্গে ইব্নে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *রিবা বা সুদী কর্মকান্ড এত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে (সাধারণ) মানুষের মধ্যে অর্থাভাব দেখা দিবে (মানুষের অর্থ সম্পদ এমনিভাবে ফুরিয়ে যাবে যে সে চরম দারিদ্রে পতিত হবে*। (ইব্নে মাজাহ্, বায়হাকী, আহ্মাদ)।

[এ প্রসঙ্গে একটা বাস্তব উদাহরণ,

আমাদের এক বন্ধু ও তার স্ত্রী যখন তাদের প্রথম সন্তানের আগমন উপলক্ষে সম্ভাব্য খরচ বাবদ ১৯৯০ সনে প্রতি মাসে চার হাজার বাংলাদেশী টাকা করে জমানোর সিদ্ধান্ত নেন। সুদী ব্যবস্থার ব্যাংকিং এর মধ্যে জড়াবেন না ভেবে প্রতি মাসে জমানো টাকা ব্যাংকে না রেখে তারা ঘরের মধ্যে আলমারীতে গচ্ছিত রাখতেন। আটমাস পর তাদের ৩২,০০০ টাকা সঞ্চয় হয়। সন্তানের জন্য সঞ্চিত সেই ৩২,০০০ টাকা খরচ না করে তারা একটি খামে ভরে রেখে দেন। শিশুটির ১৫ বছর বয়সে সেই ৩২,০০০ বাংলাদেশী টাকা এখনো আলামারীতে আছে। বাংলাদেশী টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন হতে দেখে তারা মার্কিন ডলার কিনে রাখার কথা ভাবলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, যে টাকায় তারা ১৫ বছর আগে (১৯৯০ সালে) ১০০০ মার্কিন ডলার কিনতে পারতেন বর্তমানে সে টাকায় মাত্র ৫০০ মার্কিন ডলার কেনা সম্ভব। আলমারীতে থেকেই তাদের টাকা বাস্পের মত উড়ে গিয়ে অর্ধেক হয়ে গেল। এভাবে ঘরে নিরাপদ স্থানে রাখার পরও তাদের অর্ধেক টাকা লুন্ঠিত হ'ল সবার অজান্তে। তাদের এই ৫০০ ডলার পরিমান টাকা কে লুন্ঠন করল, কিভাবে লুন্ঠন করল? এই লুন্ঠনের মূল কারণ হ'ল রিবা ভিত্তিক বিশ্ব অর্থ

ব্যবস্থা। রসুল (স) এর ভবিষদ্বাণী এভাবেই বাস্তব রূপে প্রকাশিত হবে যখন কাগুজে টাকার মূল্য থাকবে না।

অপর এক বন্ধু মাস ছয়েক আগে অফিসের কাজে দিল্লী গিয়েছিলেন। হোটেলের বিল পরিশোধের সময় হিসেবে ভুল করে তিনি ১০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ২০০ মার্কিন ডলার পরিবর্তন করে প্রতি ডলারে ৪৪ ভারতীয় রুপী পান। বিকেলে ফিরতি পথে দিল্লী এয়ারপোর্টে এসে দেখেন তাঁর কাছে ৪৭০০ ইন্ডিয়ান রুপী রয়ে গিয়েছে। রূপীর পরিবর্তে তিনি আবার মার্কিন ডলার নিতে চেষ্টা করলেন, কারণ অফিস তাঁর কাছে মার্কিন ডলার ফেরত চাইবে। রুপী বদলাতে গিয়ে তিনি মহা বিপাকে পড়লেন। কারণ তিনি দেখলেন ভারতীয় ৪৭ রুপীর পরিবর্তে ১ মার্কিন ডলার পাওয়া যাবে। সেই সাথে বিনিময় চার্জ হিসেবে তাঁকে আরো ১০০ রুপী অতিরিক্ত দিতে হবে। ৪৭০০ রুপীতে তিনি সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা এই ৬ ঘন্টা সময়ের ব্যবধানে তাকে ৪০০ ইন্ডিয়ান রুপী হারাতে হল। এটাই হলো আইন সিদ্ধ চুরি বা legalised theft? যার অপর নাম রিবা।]

বিশ্বব্যাপী সাধারণ নিরীহ মানুষ এভাবেই আইন সিদ্ধ চুরি এবং আরো বিভিন্নভাবে রিবার বেড়াজালে আটকে পড়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ হারাচ্ছে পুঁজিবাদী রিবা-ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কাছে। তবে আশার বাণী হলো রসুল (স) ভবিষদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, একটা সময় আসবে যখন এই রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সাধারণ নিরীহ মানুষের হাতে সম্পদ ফিরে আসবে।

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *ইমাম মাহ্দী (রহ) এর আবির্ভাবের পর মানুষ তাঁর কাছে এসে সাহায্য চাইবে। তখন তিনি (ইমাম মাহ্দী) সাহায্যপ্রার্থীকে যতটুকু বহন করতে পারবে ততটুকু সম্পদ তার আঁচলে ঢেলে দিবেন।*

আবু হুরাইরা (রা) রসুল (স) কে বলতে শুনেছেন: *যতদিন না প্রাচুর্য এবং উপচে পড়া সম্পদের আগমন ঘটবে ততদিন ক্বিয়ামাত ঘটবে না। এমন সময় আসবে যখন মানুষ যাকাতের অর্থ নিয়ে ঘুরতে থাকবে কিন্তু যাকাত গ্রহণকারী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।* (সহীহ মুসলিম)।

জাবীর (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *ক্বিয়ামাতের পূর্বে এমন একজন খলিফা আবির্ভূত হবেন যিনি বিনা হিসেবে সম্পদ বিতরণ করতে থাকবেন।* (সহীহ মুসলিম, ৭:৭০৫১)।

আবু হুরাইরা (রা) আরো বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *যে সত্বার হাতে আমার জীবন, সেই সত্বার কসম, মারিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) একজন ন্যায় বিচারক হিসেবে তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন (খ্রীষ্ট ধর্মের অবসান ঘটাবেন), শুকরগুলিকে হত্যা করবেন (ইহুদি ধর্মের অবসান ঘটাবেন) এবং জিযিয়া বিলোপ করবেন। আর তখন হিংসা, বিদ্বেষ, পারস্পরিক ঘৃণার অবসান ঘটবে।*

তারপর তিনি এমনভাবে সম্পদ বিতরণ করতে থাকবেন যে, তাতে সকলের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে এবং সাদাকা গ্রহণ করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন দুনিয়া এবং তার সকল সম্পদের চেয়ে একটি মাত্র সিজদাই উত্তম হবে। (সহীহ বুখারী ৪:২০৭৬, পৃ: ১০২ ও মুসলিম)।

ইমাম মাহ্দী (আ) এর আবির্ভাবের অল্প দিনের মধ্যে প্রকৃত মাসীহ হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। তিনি ভন্ড মাসীহ দাজ্জালের বির‍ুদ্ধে ইমাম মাহ্দীকে সাহায্য করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতপর ইয়াজুজ ও মা'জুজের সর্বশেষ (সংস্করণের) পতনও আল‌্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় সম্পন্ন হবে।

এ প্রসঙ্গে ইব্নে আব্বাস (রা) এর রিবা এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত মন্তব্যটি উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন, প্রাথমিকভাবে যে সত্তর হাজার দাজ্জালের অনুসারী হবে তারা সকলেই ইহুদি, তারা সকলেই থাকবে রিবায় আসক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ের রিবা বা সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারই দাজ্জালের প্রথম সংস্করণ আবির্ভাবের সূচনা নির্দেশ করে।

দাজ্জালের মৃত্যু ও আল‌্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায়ে ইয়াজুজ মা'জুজের পতন নাস্তিক দুনিয়ার অবসান ঘটাবে। ইমাম আল-মাহ্দী ও হযরত ঈসা (আ) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বিজয়ে সুদনির্ভর শয়তানি সাম্রাজ্য খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। সেটাই হয়ত সম্পূর্ণভাবে রিবা নির্মূলের শেষ ধাপ এবং সকল বিষয়ে আল‌্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

শেষ যামানায় ইয়াজুজ-মা'জুজ এবং দাজ্জালের অপশক্তির পরিসমাপ্তি, ইসলামের পনর‍ুত্থান এবং পরিশেষে ক্বিয়ামাত সবই পর্যায়ক্রমে ঘটবে। অবশ্যই যারা এই দুষ্ট চক্রের সময় জীবন অতিবাহিত করবেন, তাদেরকে রিবা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মুকাবিলা করতে হবে এবং ধ্বংসাত্মক রিবার মায়াজাল ছিন্ন করতে হবে। তবে রিবা ব্যবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করে খুব অল্প সংখ্যক লোকই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আবু সাইদ (রা) হতে বর্নিত, রসুলুল‌্লাহ্ (স) বলেছেন: *আল‌্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'হে আদম'। আদম (আ) বলবেন, 'লাব্বাইক ওয়া সদাইক (আপনার ডাকে আমি হাজির, হে আমার রব, আপনার আদেশ পালনে আমি সদা প্রস্তুত) ওয়াল খায়ের ফী ইয়াদাহু (সকল কল্যাণ আপনার দু'হাতে)'। তখন আল‌্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'জাহান্নামীদের উঠিয়ে আন।' তখন আদম (আ) বলবেন, 'কতজন জাহান্নামী?' উত্তর দেয়া হবে, 'প্রতি হাজার লোক হতে নয়শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামী'। শিশুরা তখন রূপান্তরিত হবে সাদা চুলওয়ালা বৃদ্ধ বয়সে। আর প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর দেখবে লোকেরা মদ্যপান না করেই নেশাগ্রস্থ মাতালের মত দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং জেনে রাখ, আল‌্লাহ্ তা'আলার আযাব (শাস্তি) অত্যন্ত কঠিন।' একথা শুনে সাহাবীগণ অত্যন্ত শংকিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রসুলুল‌্লাহ্ (স) "আমাদের মধ্যে কে সেই পরম তাকদীরের অধিকারী (হাজারে একজন) যিনি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন?" রসুলুল‌্লাহ্ (স) বললেন, "সুসংবাদ হ'ল যে নয়শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ-মা'জুজ হতে আর একজন (যে নাজাত পাবে, সে) হবে তোমাদের মু'মিনদের*

মধ্য থেকে।” রসুলুল্লাহ্ (স) আরো বলেন, “সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আশাকরি সকল জান্নাতীদের মধ্যে অর্ধেক হবে তোমাদের (উম্মতে মোহাম্মাদীদের) মধ্য থেকে”। কাফিরদের মাঝে তোমাদের উদাহরণ হলো কালো ষাড়ের গায়ে একটুকরা উজ্জ্বল সাদা লোম অথবা গাধার পায়ের লোমহীন একটি গোলাকার চিহ্ন। (বুখারী)।

NOTES OF CHAPTER THREE

1. Muhammad Asad, 'The Message of the Qur`an'. Darul Andalus. Gibraltar, 1980. p. 622.

2. Ibid. fn. 35 to verse 30:39

3. Ibid.

4. For a detailed statement by Asad in which he defines and describes riba, see the quotation of his which we have used as the foreword of this book.

5. Abul 'Ala Maududi, 'The Meaning of the Qur'an'. Islamic Publications Ltd. Lahore. 11th. Edition. 1994. Vol. 3 p. 209.

6. Ibid. Vol. 3 p. 216. fn. 59 to verse 30:39

7. Abdul Majid Daryabadi, 'The Holy Qur'an'. with English Translation and Commentary'. Taj Company, Karachi, 1st. Edition, 1971. Vol. 2 p. 399

8.Ibid. p. 399-A fns. 187-90

9. There is an interesting work by Stephen Passameneck, 'Insurance in Rabbinic Law' in which he explores Jewish religious response to insurance in the context of the prohibition of riba. Edinburgh Univ. Press, 1974. We have not, ourselves, made an adequate study of the subject of insurance in the light of the shari'ah, and, as a consequence, we are not as yet able to evaluate its legal status (in Islam) in a definitive way.

10. Aad comments as follows: "The subject of the usury connects logically with ....the subject of charity because the former is morally the exact opposite of the latter: true charity

consists in giving without an expectation of material gain, whereas usury is based on an expectation of gain without any corresponding effort on the part of the lender."

11. W. Gunther Plaut ed., 'Modern Commentary on the Torah'. Union of American Hebrew Congregations. New York. 1981.

12. Ibid. p. 1501

13. Ibid. p. 1501

14. Imam al-Bakhari, Sahih..Bk. 60 Ch. 8

15. Muhammad Haykal, 'The Life of Muhammad', trans. by Isma'il Faruqi. American Trust Publications 1976. p. 486

16. F.R. Ansari, 'The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society'. World Federation of Islamic Missions, Karachi, 1973. Vol. 2 p. 372

17. Ibid.

18. Ibid.

চতুর্থ অধ্যায়ঃ হাদীসে রিবা বা সুদ নিষিদ্ধকরণ

রিবা সম্পর্কে নবী কারীম (স) এর কঠোর বাণী

মুসলিম উম্মাহ ও সমগ্র মানবজাতির উপর রিবা'র মারাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয়নবী (স) সম্ভবত তার এই কঠোরতম উক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেনঃ *রিবার (সুদের) গুনাহে সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করে (এবং যৌন সম্ভোগ করে)*। (ইব্‌নে মাজাহ্‌, বাইহাকী)।

(লেখক কিছু লোককে চেনেন যারা সুদী কর্মকান্ডের মাধ্যমে অঢেল সম্পদ সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু এই হাদীসের কঠোর বাণী তাদের অন্তরকে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করেনি বরং এই উক্তি তাদের রাগ ও অসন্তোষই বৃদ্ধি করেছে।)।

আবদুল্লাহ বিন হান্‌যালা (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেনঃ *রিবার মাত্র একটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রাও (একটি পয়সাও) যদি কেউ জেনেশুনে খায়, তবে তা ছত্রিশবার যিনা করা অপেক্ষা বেশী জঘন্য*। (আহমাদ)।

বায়হাকী বিন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেনঃ *যে ব্যক্তির দেহের গোশ্‌ত হারাম মালে পুষ্ট, তার জন্য জাহান্নামই সবচাইতে উপযুক্ত স্থান*।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌ (স) কে বলতে শুনেছিঃ *মিরাজের রাতে আমি এমন কতগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়ে এসেছিলাম, যাদের পেট ছিল একটি বিশাল ঘরের মত, আর সে পেটগুলি ছিল সাপে ভরপুর, যা বাইরে থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রীল (আ) এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর*। (আহমাদ, ইব্‌নে মাজাহ্‌)।

আবু হুরাইরা (রা) আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল (স) বলেছেনঃ *আল্লাহ্‌ তা'আলা চার (ধরনের) ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না– মদ্যপানে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি, রিবা বা সুদখোর ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণকারী এবং পিতামাতার অবাধ্য ও তাদের প্রতি অমনোযোগী ব্যক্তি*। (মুসতাদরাক আল-হাকীম, কিতাবুল-বুয়ু')।

সামুরা বিন যুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ *আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, দু'ব্যক্তি এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা যেতে যেতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং অপরজন নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানের লোকটি যখন*

ফিরে আসতে চায়, তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খন্ড নিক্ষেপ করে তাকে পুনরায় নদীর মাঝখানে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর ছুড়ে মারে, আর সে স্বস্থানে ফিরে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে? তিনি বললেন যাকে রক্তের নদীতে দেখলেন সে হলো একজন রিবাখোর (এভাবেই তার শাস্ড়ি চিরকাল চলতে থাকবে)। (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৫০ পৃ:২৭)।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে যা মিশরের একটি সমাধিক্ষেত্রে সত্তরের শেষভাগে ঘটেছিল এবং মিশরীয় শেখ মারহুম আব্দুল হামিদ কিস্ক জনসমক্ষে সে ঘটনার বয়ান বিস্ড়রিতভাবে পেশ করেছিলেন, অবশ্য পরবর্তীতে মিশরের সরকার তাকে ঘটনা প্রকাশে নির্লজ্জভাবে বাধা দেয় এবং চুপ থাকতে বাধ্য করে। ঘটনাটি হলো-

একজন মিশরীয় কবর খননকারী যে সব সময় কবর খুঁড়ে রাখত না। মাঝে মাঝে একটি পাতাল কুঠুরীতে খোঁড়া কবরে মৃত লাশ জমা করে রাখত। সে সময় মিশরে এ ধরনের সমাধিস্থকরণ প্রক্রিয়া অনুমোদিত ছিল। পাতাল কুঠুরীতে লাশ রাখার পর পরবর্তী লাশ না আসা পর্যন্ড় সে কুঠুরীর দরজা বন্ধ রাখা হতো।

শেখ কিস্ক এর বর্ণনানুযায়ী একজন কবর খননকারী একটি মৃতদেহ রাখার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে কুঠুরীর দরজা খুলে কুঠুরীর ভিতর ভয়ঙ্কর কতগুলি সাপ দেখে ভয়ে তাড়াতাড়ি তা বন্ধ করে পালাল। এ ধরনের আরও কিছু পাতাল কুঠুরী ছিল। সে একটু সাহস সঞ্চয় করে পরবর্তীতে আর একটি কুঠুরীর দরজা খুলে দেখলো সেখানেও প্রচুর সাপ রয়েছে। সুতরাং আবারও সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাল, তবে যেহেতু এটাই তার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়, তাছাড়া তার হাতে সময়ও বেশী ছিল না। সে নিরূপায় হয়ে ইচ্ছার বির"দ্ধেই নিজেকে জোর করে পেশাগত কাজে ফিরিয়ে আনল। এভাবে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ খুলে একই দৃশ্য দেখার পর, তার ভয় এবার প্রচন্ড রাগে পরিণত হলো। সেই সাপগুলির উদ্দেশ্যে সে বলে উঠলো, 'তোমরা আমাকে আমার কাজ করতে দাও, আমাকে লাশ দাফন করতে দাও।' সাপগুলি তার কথা বুঝতে পেরে দ্র"ত সেখান থেকে চলে যাবার পর লাশ দাফন করা হলো, কিন্তু দাফনের কাজ শেষ করার সাথে সাথেই সাপগুলি দরজা বন্ধ করার আগেই তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়লো। ফিরে আসার সময় কবর খননকারী সাপগুলিকে মৃত ব্যক্তির উপর আছড়ে পড়া, ছোবল মারা এবং হাড় কড়মড় করে চিবানোর আওয়াজ শুনতে পেল।

এ ধরণের ভয়ঙ্কর ঘটনার নিশ্চয়ই কোন কারণ ও তার ব্যাখ্যা আছে এই ভেবে কবর খননকারী ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি ও তার পরিবার সম্পর্কে জানার কৌতুহল হলো। লোকটি খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, মৃত ব্যক্তি ছিল একজন সুদী মহাজন। টাকা ধার দেবার বিনিময়ে সুদ নিয়ে সে তার ধনরাজি পুঞ্জিভূত করে হারাম উপায়ে নিজের তাকদীর ফিরিয়ে নিয়েছিল! এ কারণেই জাহান্নাম থেকে আগত সর্পকুল আল্লাহ তা'আলার

নির্দেশে তার কবরে শাস্ড়ি প্রদান করার জন্য অবস্থান করছিল। এই কাহিনী হতে বোঝা যায় আল□াহ্ তা'আলার শাস্ড়ি কতই না ভয়ঙ্কর!

রিবা সম্পর্কে নবী (স) এর থেকে উদ্ধৃত হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই রিবা সৃষ্ট চরম অবিচারের বির"দ্ধে ক্রোধের তীব্রতা বোঝা যায়। আর তাই এর থেকে বেঁচে থাকার জন্য এত তাকিদ দেয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বরঞ্চ যারা এই নিষিদ্ধ রিবার সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের প্রতি আল□াহ তা'আলা ও তাঁর প্রেরীত রসুল (স) এর তরফ থেকে অত্যন্ড় দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি।

জাবির বিন আবদুল□াহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: *আমি রসুলুল□াহ্ (স) বলতে শুনেছি, যদি কেউ মুখাবারাহ পরিত্যাগ না করে, তাহলে সে যেন শুনে রাখে আল□াহ্ এবং রসুল (স) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা', যাইদ বিন সাবিত (রা) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুখাবারাহ কি? তিনি বললেন, "তোমরা যে অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ফসলের শর্তের বিনিময়ে জমি চাষ করাও"*। (আবু দাউদ)। (এ ধরনের ইজারা চুক্তির বা বর্গাচাষের ক্ষতিকর দিক হলো, এটা প্রতারণার মাধ্যমে শ্রমকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করার দিকে টেনে নিয়ে যায়)।

পূর্বে উপস্থাপিত উপমা ও হাদীসগুলি পড়ে রিবাতে নিয়োজিত থাকার ভয়াবহ বিভীষিকা সম্পর্কে পাঠকদের চোখ খুলে যাওয়ার কথা। রিবা বা সুদী লেনদেন মানুষকে ক্রমশ দাসত্বের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় অনেক মালিকের চাষযোগ্য জমিতে শুধু গায়ে খাটার জন্য সস্ড়ায় কৃষক নিয়োগ করা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থাকে মুখাবারাহ বলা হয়। এই পদ্ধতির বদৌলতে একজন চাষীর জীবনে স্থায়ী দারিদ্র নেমে আসে এবং তার নিজস্ব কোন জমি থাকবে একথা সে চিন্ড়াই করতে পারেনা এবং এটাই রিবা। যা মানুষকে চরম দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়। সত্যিকার মুসলিম দেশে এ ধরনের প্রথা কোনক্রমেই থাকা উচিত নয় এবং বাস্ড়বিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে কৃষিজমির উপর ভূস্বামীদের স্বত্তাধিকার জোরপূর্বক হলেও কেড়ে নিতে হবে এবং বদলে দিতে হবে এসকল কুকীর্তি ও কুপ্রথাকে।

নবী (স) এর বক্তব্য ও বাণী থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবা সম্পর্কে অত্যধিক গুর"ত্ব দিয়েছেন এবং এ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রিবা মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম ক্ষতিকর, যা বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি বস্তুত শির্‌ক বাদে অন্যান্য ভয়াবহ বিষয়গুলি রিবার গুনাহ্‌র তুলনায় তুচ্ছ বলেই মনে হয়।

নবী কারীম (স) ও রিবার বিভিন্ন রূপ

ব্যাপক অর্থে যদিও সুদী ঋণ এবং সুদী লেনদেন জনিত যেকোন সুদের কারবারকেই রিবা বলে কুর'আন মাজীদে চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাপি এ সম্পর্কে বিস্ড়্রিত ব্যাখ্যা ও বিবরণের ভার নবী কারিম (স) উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। প্রকারান্ড়ে রিবার দায়ভার কাদেরকে বহন করতে হবে সে বিষয়ে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটিই বড় প্রমাণঃ-

রসুল (স) লা'নাত বা অভিশাপ দিয়েছেন: *রিবা বা সুদ গ্রহণকারী, রিবা প্রদানকারী, রিবা (সুদ) লেখক এবং রিবার সাক্ষ্যদানকারী দ্বয়ের প্রতি এবং বলেছেন এরা সবাই সমান গুনাহ্গার*। (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯৪৮, পৃ:৫২৫)।

এ ধরনের একই ব্যাখ্যা সম্বলিত আবু জুহাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আরও একটি হাদীস পাওয়া যায়-

তিনি বলেন রসুলুল্লাহ্ (স) এক মহিলাকে লা'নাত করেছেন, কেননা সে অন্যের দেহে উলকি দাগাতো এবং নিজের দেহে দাগ দিত। তাছাড়া রসুল (স) কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রিবা খাওয়া (গ্রহণ) ও খাওয়ানো (প্রদান) নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন (প্রাণীর) ছবি অংকনকারীর উপর। (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৫১, পৃ: ২৮)।

আবু মাসউদ আনসারী (রা) এর বর্ণনায় নবী (স) বলেছেন: *কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচারিনির ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম*। (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৮৬৪, পৃ:৪৯৮)।

[আইশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: *আবু বকর (রা) এর একটি গোলাম ছিল। "সে তাঁর জন্য রোজগার করতো এই উপার্জন তিনি খেতেন। একদা সে গোলাম, আবু বকর (রা) কে কিছু খাবার খাওয়ালেন যা ছিল তার গণনার উপার্জিত অর্থ দিয়ে ক্রয় করা। একথা শুনামাত্র আবুবকর (রা) তাঁর গলার ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পেটের সমুদয় বস্তু বমি করে ফেলে দিলেন*। (মেশকাত, ৬:২৬৬৬, পৃ:১০)।]

প্রতিবারই যখন একজন মুসলিম বাড়ী, গাড়ী, ফার্নিচার ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যাংক হতে গৃহীত সুদী ঋণের কিস্ড়ি শোধ করার উদ্দেশ্যে চেক লিখেন বা টাকা জমা দেন, তখন তার সাবধান হওয়া উচিৎ যে তিনি রিবার ধ্বংসাত্মক আলিঙ্গনে জড়িয়ে আছেন। আর এই রিবার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও দলকে আল্লাহ্র রসুল (স) অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং তিনিও রসুল (স) কর্তৃক অভিশপ্ত দলেরই একজন।

কোন মুসলিম সুদযুক্ত ঋণ দ্বারা যতবার যত কিছুই করে সে রিবায় নিয়োজিত হয় এবং গুনাহ্র বোঝা বহন করে চলে। তিনি যদি তাওবা না করেন এবং রিবা হতে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ব্যতীত ইন্ড়িকাল করেন, জাহান্নামের আগুনই হতে পারে তার অন্ড়িম পরিণতি!

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রসুল (স) কে বলতে শুনেছি রিবার গোণাহের সত্তরটি রূপ বা প্রকারভেদ রয়েছে। এই সত্তর রূপের গুনাহর ক্ষুদ্রতম গুনাহ্ হলো নিজের মাকে বিয়ে করা (নিজের মায়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের মত ঘৃণ্য কাজকে উপস্থাপন করতে এ ছিল রসুল (স) এর ভদ্রোচিত ও মার্জিত ভাষা আসল কথা হল এই গুনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমান)। (সুনান ইব্নে মাজাহ্)।

প্রকৃতপক্ষে এই সত্তর প্রকার রিবার অধিকাংশই হয়তো আজ বিদ্যমান।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান ইসলামি আ'লীম ও স্কলারগণের উপর যে দায়িত্ব এসে যায় তা হলো বিভিন্ন রিবার রূপ গবেষণা ও অনুসন্ধান করে দেখা এবং হাদীসের বর্ণনার সাথে বর্তমান অর্থনৈতিক লেনদেনে কি ধরনের রিবার উপস্থিতি রয়েছে তা তুলে ধরা। যা আমাদের রসুল (স) এর সময় অপ্রকাশিত থেকে গেছে। অথবা এমনও হতে পারে, সে যুগে সে সকল লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ প্রকাশের প্রকৃত সময় ছিল না, আর থাকলেও তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল যা সময়ের প্রেক্ষাপট ও বাস্ড়বতার সাথে সাথে পরিস্ফুট হয়ে চলেছে। বিশেষ করে এমন সময় যে সময় ইয়াজুজ, মা'জুজ এবং ভন্ড আল মাসিহ আল দাজ্জাল তাদের অশুভ শক্তি ও মায়াজাল বিস্ড়ারে সক্রিয় হয়ে চলেছে। এ বিষয়ে মুহাম্মদ আসাদ তার ইসলামি জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সৃজনশীল ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন, তিনি বিষয়টিকে বিশে□ষণ করেছেন এভাবে-

কুর'আনে রিবার ধারণা ও প্রচলন সম্পর্কিত দন্ডবিধি সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও চুড়ান্ড়। অথচ প্রতিটি মু'মিন মুসলিম এই সুদী কর্মকান্ডের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে যা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেবে। ফলে উপযুক্ত শব্দ ও অর্থনৈতিক সংজ্ঞায় এ বিষয়টিকে তারা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে পারবে।

রসুল কারীম (স) বর্ণিত রিবার কয়েকটি রূপের বিবরণ:

১. বাকীতে লেনদেন (বায়' মুয়াজ্জাল)- কিছু কিছু বিষয়ের উপর নবী (স) বাকীতে লেনদেন বর্জন করতে বলেছেন কারণ সেখানে রিবা'র উপস্থিতি রয়েছে।

উসামা বিন যাইদ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেছেন: *আমি রসুলুল□াহ্ (স) কে বলতে শুনেছি বাকীতে লেনদেন রিবার আওতাভুক্ত। অন্যত্র তিনি বলেছেন নগদ বেচাকেনায় কোন রিবা নেই*। (বুখারী/মুসলিম)।

উদাহরণস্বরূপ পশু ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বলা যেতে পারে। যেমন একটি পশুর সাথে আরেকটি পশুর বিনিময়।

সামুরা বিন জুনদুব (রা) এর বর্ণনায়: *নবী (স) বাকীতে পশুর বিনিময়ে পশু বিক্রয় নিষেধ করেছেন*। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইব্‌নে মাজাহ্‌)।

কারণ এ ধরনের লেনদেনে একটি অনিশ্চয়তা কাজ করে। যে পশু ক্রয় বা বিক্রয় করা হলো সে পশুটি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা মারা যেতে পারে, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে ক্রয়-বিক্রয়কারী দু'পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য এমনকি ঝগড়াবিবাদও লেগে যেতে পারে, যার পরিণতি অত্যন্ড় ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করার সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কারণ, পরবর্তীতে বাকী গ্রহণকারী তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করার সামর্থ হারিয়ে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে, তা হল ল্যাটিন আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ জমিদাররা স্থানীয় ইন্ডিয়ান কৃষকদের ঋণ নেয়া ও বাকীতে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে কৃষকরা যখন ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ে তখন তা পরিশোধের জন্য তাদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। এভাবেই ল্যাটিন আমেরিকার কৃষি-অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, যা সম্ভব হয়েছিল আকালের সময় ক্ষুধার্ত কৃষকদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণের মাধ্যমে, যাকে তাদের ভাষায় ল্যাটিফান্ডিয়া নামে অভিহিত করা হয়। ল্যাটিন আমেরিকার এই কৃষি অর্থনীতি ছিল মূলত প্রকাশ্য দাসত্বকে আড়াল করে সুপ্ত দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচ বছর নিউ ইয়র্ক থাকাকালীন সময়ে লেখক যতগুলি বিবৃতি শুনেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বক্তব্য হলো নিউজার্সির মরিসটাউন জেলে অবস্থানকারী একজন আফ্রো-আমেরিকান ট্রেসি রিগস্‌ এর উক্তি সে তাকে বলেছিল –"বাকী লেনদেন, দাসপ্রথায় ফিরিয়ে আনার প্রথম ধাপ"।

রিবার প্রভাব নিজ থেকেই ব্যক্তির উপর একটি আলাদা আবহ ও পরিমন্ডল তৈরী করে ফেলে। ব্যক্তিগত ভাবে গৃহীত ঋণ গ্রহণের পরিণতি ভাল বা মন্দ উভয় পর্যায় হতে পারে। এটিকে কল্যাণের পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা একটা চাপের মুখে থাকতে হয়। খারাপ পর্যায়ে গেলে অর্থাৎ অপরিশোধিত ধারের জন্য নিজে থেকেই শাস্ড়ি (মানসিক অশান্ড়ি) ভোগ করতে হয়। এই বিষয়গুলি সর্বগ্রাসী।

বায়' মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা

বাকীতে কোন কিছু লেনদেন করাকে বায়' মুয়াজ্জাল বলে। কোন দ্রব্য বর্তমান অবস্থায় ক্রয় করে পরবর্তী কালে মূল্য পরিশোধ করা হল বকেয়া বা বাকীতে লেনদেন। বাকীতে লেনদেন সর্বদা রিবা হয় না। আমাদের নবী (স) নিজেও বাকীতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। তবে সে সময়ের বাকীতে লেনদেন বা বায়' মুয়াজ্জাল আর বর্তমান সময়ের বাকীতে ক্রয়ের মধ্যে বেশ কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে, সেগুলি হলো-

(১) কোন দ্রব্য বাকীতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। [সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য কর–ন] বর্তমানে বাড়ী, গাড়ী বা কোন কিছু বাকীতে ক্রয় করার জন্য উক্ত বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়, এবং এটাই রিবা।

(২) বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণের নিরাপত্তা বিধান – বাকীতে কোন কিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোন কিছু বন্ধক রাখা হতো যা উক্ত লেনদেনের নিশ্চয়তা প্রদান করতো। ঋণ পরিশোধের পূর্বেই ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত বন্ধকীকৃত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাকীতে কেনা পণ্যের মূল্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো আবার ক্রেতাও ঋণ মুক্ত হয়ে যেতো।

(৩) বাকীতে ক্রয়কৃত বিষয়সমূহ সর্বদিক থেকে ঝামেলামুক্ত ছিল, অর্থাৎ পরিশোধের সময় কোন প্রকার অজুহাত, জটিলতা বা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

উপরোক্ত লেনদেন রিবা'র প্রভাবমুক্ত। এ ধরনের বাকীতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে নবী (স) এর অনুমোদন রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনিন আইশা (রা) বলেছেন: *রসুলুল্লাহ্ (স) কোন এক ইহুদির নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন*। (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৩৩ পৃ:১৮; সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯৬৯ পৃ:৫৩৩)।

আইশা (রা) আরো বলেন: *রসুল (স) ওফাত কালে ত্রিশ 'সা' যবের বিনিময়ে এক ইহুদির কাছে তাঁর কোর্তা (জামা) বন্ধক ছিল*।

কোন কিছু বাকী নেয়া মানে ঋণগ্রস্থ হওয়া। কাজেই খুবই বিপদগ্রস্থ না হলে বা নিতান্ড় প্রয়োজন না হলে কোন মুসলিমেরই ঋণ নেয়া উচিত নয়। ছোটখাটো প্রয়োজনে লোকের কাছে হাত পাতা কিংবা ঋণ গ্রহণ করা একটি বিরক্তিকর, অস্বস্ড়িকর ও ভীতিজনক ব্যাপার। নিতান্ড় প্রয়োজনে যদিও ঋণ নেয়ার অনুমোদন ইসলামে রয়েছে তবে ঋণ অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় অপরিশোধিত অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়। যদি কোন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি একসাথে ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়, তাহলে যে পরিমাণে সম্ভব তা পরিশোধ করে ঋণের বোঝা কমানো উচিত এবং চুক্তিতে উলেখিত সময়ানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করা উচিত। এ বিষয়ে তওরাতে বলা হয়েছে সাত বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। তবে তওরাতে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে উলেখিত বিবরণের অসামঞ্জস্য ও দ্বৈতনীতি ধরা পড়ে। নীচে তওরাতে উদ্ধৃত অংশগুলি বিচার করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে:

প্রতি সাত বছর অন্ড়র ঋণের হিসেব করা উচিত, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পাওনা ঋণ প্রয়োজনে মওকুফ করা উচিত (তাদের নিকট অপরিশোধিত ঋণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়, যদিও তার পাওনা রয়েছে) আপন নিকট আত্মীয় পরিজন ও

প্রতিবেশীদের জন্য ঈশ্বরের তরফ থেকে এই অভিপ্রায়। (তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৫:১)।

তুমি ঋণ পরিশোধে তাগাদা করতে পার যদি তারা বিদেশী হয় (যারা ইহুদি নয়); কিন্তু অবশ্যই নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে পাওনা ছেড়ে দেয়া উচিত। (তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৫:১)।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই বলা রয়েছে: *তোমরা নিজেদের ছাড়া বহু জাতিকে (অ-ইহুদিকে) ঋন প্রদান করবে ও তাদের উপর প্রধান্য বিস্ত্মর করবে কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঈশ্বর একমাত্র তোমাদেরকেই মনোনীত করেছেন*। (তওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৫:৬)।

ইতিপূর্বে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলি কখনো মুসা (আ) এর কাছে প্রেরীত তওরাতের অংশ হতে পারে না। কারণ দ্বৈত নীতি অবলম্বনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। যেভাবেই তওরাতের এই অংশগুলি লিপিবদ্ধ হোক না কেন, তা যে শয়তানের প্ররোচনায় হয়েছে তা বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয় না। যে সকল পথভ্রষ্ট লেখকরা তওরাতের মূল অংশ বদলে দিয়ে নিজেদের মনগড়া কথা পুর্নলিখনের কাজগুলি করেছে তারা খোদ শয়তানকেই সাথী ও পথপ্রদর্শক রূপে পেয়েছিল। এসকল ভুতুড়ে লেখকরা যা লিখেছে তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে ইহুদিদেরকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনা প্রকাশ করার দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে দলিল ইহুদিদের জন্য আত্মসংহারক। এই বিকৃত তওরাতের অনুসরণকারীরা প্রকৃত ইব্রাহীম (আ) এবং মুসা (আ) এর দ্বীন থেকেই বিচ্যুত হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) এবং মুসা (আ) এর কাছে সত্য দ্বীন সহ কিতাব নাজিল হয়েছিল তা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য ফলে তাদের প্রকৃত আদর্শ ও দ্বীনের অস্তিত্বের আজ বিলুপ্তি ঘটেছে। কুর'আনুল কারীম এবং নবী (স) এর সহীহ হাদীস শিক্ষা ব্যতীত তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবে প্রকাশিত সত্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না। বস্তুত সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির উপর যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে প্রকাশিত সত্যকে মানুষের মাঝে তুলে ধরার। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামি স্কলারদের ইব্রাহীম (আ) এবং মুসা (আ) এর প্রতি নাযিল করা অবিকৃত তথ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। তাঁদের প্রতি নাযিল করা সঠিক তথ্য রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ কুর'আনে। [এ কারণেই মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে কুর'আন ঘোষণা দেয়: *তোমরাই (মুসলিমরাই) সর্বোত্তম নির্বাচিত জাতি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হলো) তোমরা সমগ্র মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তোমরা নিজেরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। (তোমাদের পূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি তারা যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যে কতইনা উত্তম হতো। তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদার রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক (অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির)*। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)।]

২. কোন দ্রব্যাদি বাকীতে ক্রয় করলে পরবর্তীতে ক্রয়মূল্য থেকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। দেরীতে মূল্য পরিশোধের কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার যে পদ্ধতিতে লেনদেন হয় তাকে রিবা-আন-নাসিয়াহ্ বলে।

উসামা বিন যাইদ (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন, *আন্-নাসিয়াহ্ ছাড়া কোন রিবাই হতে পারে না*। (বুখারী)।

রিবা আন-নাসিয়াহ্ তৎকালীন মক্কায় সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে যে নীতি ও ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহলো, যেহেতু বিক্রিত মালের মূল্য পেতে অপেক্ষা করে থাকতে হবে তাই প্রকৃত মূল্যের চেয়েও অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়ার অধিকার বিক্রেতার। যদি ঋণী ব্যক্তি সময়মত ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে বাড়তি সময় চাইতো সে ক্ষেত্রে তাকে আরো অতিরিক্ত অর্থ যোগান দিতে হতো। এই সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের পাওনা অর্থের পরিমাণও বাড়তে থাকতো।

এভাবে পুঁজি বা সম্পদের বৃদ্ধি সময়ের মেয়াদ বাড়ানোর সাথে সাথে স্ফীত হতে থাকাকে কুর'আন স্বীকৃতি দেয় না। সময়ের ব্যবধানেই যদি মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে অর্থ নিজেই উপার্জনকারী হয়ে দাঁড়ায় বিনা পরিশ্রমে বা বিনা ঝুঁকিতে। এই ধারণার বিপরীতে যদি অর্থ সুদের মাধ্যমে লগ্নি করার অনুমতি দেয় তাহলে অর্থ নিজে নিজে বাড়তেই থাকে, ফলে সময়ের সাথে সাথে কিছু লোক সম্পদ বাড়িয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে এবং যাদের পদতলে থাকে সাধারণ জনগণ। উপরন্তু আইন বিধান যখন সুদী ঋণ লেনদেনের অনুমতি দেয় তখন সময় অর্থের সমতুল্য হয়ে দাড়ায়। তখন দালাল যেভাবে বেশ্যাদের শ্রমের বিনিময়ে বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে তেমনি ঋণদাতাও ঋণগ্রহীতার ঘাড়ে চেপে বসে তারই শ্রমে পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলে। এ ধরনের রিবা যখন অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে তখন ধনী শোষক গোষ্ঠি সাধারণ মানুষের শ্রমদ্বারা প্রতিপালিত হয়। অর্থই তখন সকল ক্ষমতার উৎস হয়ে দাড়ায়। অর্থ সম্পদ যেহেতু পুঁজিবাদীদের চারদিকেই আবর্তিত হয় শ্রমের মর্যাদা তখন ক্রমশই কমতে থাকে। যার পরিণতিতে শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিবাদীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়ে পড়ে আর এভাবেই বিশ্বমানবতার উপর দাসত্বের শৃংখল স্থায়ীভাবে চেপে বসে। ফলে অর্থই হয়ে দাঁড়ায় আসল চালিকা শক্তি। মানুষের শ্রম ও মর্যাদা ক্রমশ ভুলুণ্ঠিত হতে থাকে ও পুঁজির উপরই সমস্ড় সমাজ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা বর্তমান দুনিয়ায় মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের ক্ষুধাকে উপজিব্য করে পুঁজি গঠন সম্প্রসারিত হয় আর সাধারণ মানুষ ক্রমশ অদৃশ্য দাসত্বের দিকে এগিয়ে চলে।

বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় ও বাড়তি মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে বর্তমান পুঁজিবাদ অর্থনীতিতে যে কোন ধ্বংসাত্মক পরিণতিই ডেকে আনতে সক্ষম।

এক্ষেত্রে বির—দ্ধবাদী কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন সময়ের ব্যবধানে টাকা বৃদ্ধি পায় (সুদের কারণে) সময়ের ব্যবধানে সম্পত্তির মূল্যমানও তো বৃদ্ধি পায়। সত্যিকার অর্থে

মুদ্রাস্ফীতির কারণে কোন দ্রব্যের দাম বাড়াকে ঐ দ্রব্যের মূল্যমান বৃদ্ধি নির্দেশ করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি দামী জিনিসের মূল্যমানও অধোমুখী হয়ে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দাম বাড়া কাগুজে মুদ্রার মূল্যমান কমে যাওয়া এমনকি তা পতনের ইঙ্গিত দেয়। আসলে কাগুজে মুদ্রা প্রচলন ও ব্যবহার এক ধরনের রিবা। কারণ এই সম্পদের অধিকারী শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রকৃত সম্পদের (কাগুজে মুদ্রা) উলে□খযোগ্য অংশ হারাতে পারে। তাছাড়া কাগুজে টাকার মূল্যমান কমতে থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।

মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়)

সারা বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকগুলি অশুভ অর্থনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে রিবাকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে কৌশলে বরং রিবাকে বৈধতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । সরল প্রাণ মুসলিম জনগণকে সুদী-ব্যাংকিং এর বিকল্প হিসেবে তারা যা উপস্থাপন করছে তা মূলত রিবারই ছদ্মরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা মুরাবাহা নামক একটি পরিভাষা কৌশলে ব্যবহার করে এবং ত্র“টিপূর্ণভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু বাস্ত্মবিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রচ্ছন্নভাবে ধোঁকা দিয়েই এ ধরনের লেনদেন করা হয় যা নিশ্চিতভাবেই রিবার প্রভাব মুক্ত নয়। এই মুরাবাহা প্রকল্পের আওতায় কোন দ্রব্য ব্যাংক নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং বেশী মূল্যে তা বাকীতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু এ ধরনের লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে আগেই সমঝোতা হয়ে থাকে সেহেতু এ ধরনের লেনদেন হালাল।

যদি কোন ব্যাংক বাজার থেকে ১৫০০ ডলার (৮ লক্ষ টাকা) দিয়ে একটি গাড়ী নগদ ক্রয় করে এবং সে বাজারেই নগদ ২৫০০ ডলার (১০ লক্ষ টাকায়) গাড়ীটি বিক্রয় করে তবে এই লেনদেনটি হবে সন্দেহজনক। কারণ যদি বাজারে ৮ লক্ষ টাকায় গাড়ীটি পাওয়া যায় তাহলে কে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে সেই একই গাড়ী কিনতে যাবে? সেক্ষেত্রে যদি কোন ক্রেতার বাজারদর সম্পর্কে ধারণা না থাকে এবং সে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে ২ লক্ষ টাকা বেশী আদায় করা হয়, এ ধরনের প্রতারণাও রিবার অন্ত্মর্ভুক্ত।

আনাস বিন মালিক (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *একজন মুসতারসালকে (বাজারদর সম্পর্কে যে জানেনা এমন ক্রেতা) ঠকানো রিবার আওতাভুক্ত*। (বায়হাকী)।

যদি কোন ক্রেতা বাজার দর সম্পর্কে জানার পরও ২৫০০ ডলার (১০ লক্ষ টাকা) দিয়ে সে গাড়ীটি ক্রয় করে তাহলে বুঝতে হবে এ ধরনের অস্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ কিংবা কোন অন্ত্মর্নিহিত কারণ আছে। নয়তো ক্রেতা মানসিক ভারসাম্যহীন। সেক্ষেত্রে লেনদেনটি অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

অপরদিকে ব্যাংক যদি গাড়ীটি নগদ ১৫০০ ডলার (৮ লক্ষ টাকা) দিয়ে কিনে ২৫০০ ডলারের বিনিময়ে (১০ লক্ষ টাকায়) বাকীতে বিক্রি করে তবে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ কারণ এখানে সময়ের উৎপাদক (ঋণ দানের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ) ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের লেনদেনে সময়ের সাথে সাথে টাকার পরিমাণও বেড়ে যায়। তাই এই ব্যবস্থায় শুধু টাকাই টাকা উৎপাদনে সক্ষম হয়ে যায়।

যে সমস্ড় পথহারা অজ্ঞ মুসলিমগণ কৌশলে উপস্থাপিত মুরাবাহাকে হালাল বলে মনে করে তাকে আকড়ে ধরে আছে তাদের আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাওয়া উচিত। কারণ তারা মুহারাবাকে হালাল বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে প্রতারণা করছেন, এই কাজে তাদের কোন কল্যাণ আমরা দেখছি না।

তাদের যুক্তি অনুযায়ী এটা রিবা নয় কারণ এ ধরনের লেনদেনে তারা ঝুঁকি নিয়ে থাকে বলে তারা দাবী করে, যে দাবী একান্ড়ই ভিত্তিহীন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিক্রেতা যখনই বাকীতে কোন কিছু লেনদেন করে সে যতটা সম্ভব ঝুঁকিমুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। যেমন বাকী ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন কিছু বন্ধক রাখতে হয়। যাতে করে সময়মত ঋণ আদায়ে অক্ষম হলে বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করে বিক্রেতা তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। সুতরাং এ ধরনের লেনদেনে ব্যাংকের কোন ঝুঁকিই থাকেনা। বরং ঋণ বা মূল্য পরিশোধে ক্রেতার দায় বা চাপ থাকে বেশী। পক্ষান্ড়রে বিক্রেতা সময়ের মেয়াদে, বিনা পরিশ্রমেই অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয় শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে।

আসলে ইসলামি শাসনভুক্ত সমাজে শুধুমাত্র সুদযুক্ত ঋণ প্রদানই নয় বরং সকল ধরনের ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের রাস্ড়াই বন্ধ থাকা উচিত। যাতে করে বিনা ঝুঁকি বা বিনা পরিশ্রমে পুঁজি গঠন করা কারোর পক্ষে সম্ভবপর না হয় এবং অর্থ সম্পদ শুধুমাত্র পুঁজিবাদীদের চারপাশেই আবর্তিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৩. কোন ব্যক্তি বা দলকে দিয়ে কৃত্রিমভাবে অতিরিক্ত মূল্য হাঁকিয়ে নিলাম ডাকার প্রক্রিয়াও রিবার অন্ড়র্ভূক্ত। কেননা কৃত্রিমভাবে মূল্য বাড়িয়ে নিলাম ডাকার মাধ্যমে মুক্ত বাজারকে দুর্নীতিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এ ধরনের রিবাকে 'ঘারার' বলা হয়।

আবদুল্লাহ্ বিন আওফ (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন: *নাযিশ (নিলাম ডাকায় নিয়োজিত ব্যক্তি) রিবার (গ্রহণের দায়ে) কারণে অভিশপ্ত*। (বুখারী)।

৪. মুক্তবাজারে কৌশল অবলম্বন করে কৃত্রিম বা প্রতারণামূলক মূল্য বৃদ্ধি করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসগুলি উল্লেখযোগ্য-

আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফ (রা) বলেছেন: *এক ব্যক্তি বাজারে কিছু পণ্য প্রদর্শন করে পণ্যের মূল্যের ব্যাপারে মিথ্যা কসম করলো (যে দাম ছিল সে দামের থেকে বাড়িয়ে বলে মিথ্যা কসম করল) তখন ওয়াহী নাযিল হলো-"নিশ্চিতই এরাই তারা যারা আল্লাহ্র*

সাথে সম্পাদিত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথগুলিকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, তাদের জন্য রয়েছে অতীব যন্ত্রণাদায়ক আযাব" (৩:৭৭)।

ইব্‌নে আবু আউফ (রা) আরো বলেন: *(নাজিশ) ব্যক্তি হলো অভিশপ্ত রিবাখোর।* (বুখারী)।

আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ (স) বর্ণনা করেছেন: *একজন মুসতারসাল (যে বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ)-কে ঠকানো রিবা।* (বায়হাকী)।

আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল (স) কে বলতে শুনেছেন: *তোমরা ব্যবসায়ে কসম খাওয়া হতে বিরত থাক। কেননা কসম পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু বারকাত কেড়ে নেয়।* (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯৮১, পৃ: ৫৩৬)।

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন: *রসুলুল্লাহ্ (স) এর কাছে কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে আসা হলো, তিনি তাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বুঝলেন তা ভিজা। অতপর তিনি শস্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন এগুলি এমন হলো কি করে? সে বলল বৃষ্টির পানি পড়ে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কেন ভেজা শস্যগুলি উপরে রাখলে না, যাতে লোকেরা সহজেই দেখতে পেত? শুনে রাখ, যে প্রতারণা করে তার বিষয়ে আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই।* (মুসলিম)।

হাকীম বিন হিযাম (রা) সুত্রে নবী (স) বলেন: *ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে আলাদা হবার পূর্ব পর্যন্ত খিয়ার (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ) থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের বেচা-কেনায় বরকত হবে। আর যদি বেচা-কেনার সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তার বরকত কমে যাবে।* (মুসলিম, ৪:৩৭১৫, পৃ: ৪৫৩)।

ওয়াথিলা বিন আল-আসকা (রা) রসুলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছেন: *কেউ যদি ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ না করে বিক্রি করে তাহলে সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধে নিপতিত হবে আর ফিরিশতারা অনবরত তাকে লা'নাত করতে (অভিশাপ দিতে) থাকবে।* (ইব্‌নে মাজাহ)।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রকৃত মুদ্রাকে কাগুজে মুদ্রায় প্রতিস্থাপনের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে জালিয়াতি, প্রতারণা, চুরি ও আত্মসাৎ মূলক কর্মকান্ড জড়িয়ে রয়েছে তা আশাকরি পাঠক সমাজ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। প্রকৃত বা আসল মুদ্রার নিজস্ব একটা মূল্য বা মুদ্রার মান তার নিজের মধ্যেই থাকে যেমন স্বর্ণমুদ্রা। পক্ষান্তরে কাগুজে মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য থাকে না। বাজার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি গুলি কাগুজে মুদ্রার মাঝে যে মূল্য ছাপিয়ে দেয় সেটাই তার প্রকৃত মূল্য। কাগুজে মুদ্রার বাজার দর নির্ভর করে সে মুদ্রার প্রতি মানুষের আস্থা এবং বাজারে তার চাহিদার উপর যা প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এই প্রকৃত মুদ্রার বদলে কৃত্রিম মুদ্রা হিসেবে কাগুজে মুদ্রা প্রতিস্থাপিত হলে (হোক তা আমেরিকান ডলার) এই মুদ্রার মান ক্রমাগত কমতেই

থাকে। ফলে কাগুজে মুদ্রা থেকে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে জনগণ প্রতারণা বা বঞ্চনার শিকার হয়। এ বিষয়টিও রিবার অন্তর্ভুক্ত। (আল-কুর'আন-৭:৮৫, ১১:৮৫, ২৬:১৮৩)।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার মত ক্যান্সারসম বিষবৃক্ষের অস্তিত্ব দারুল ইসলামে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ (অটোমান) ওসমানিয়া খিলাফতের কথা উলেখ করা যেতে পারে। সে সময় বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষভাবে বাজার পুলিশ, কর্মচারী ও বিচারক নিয়োগ করা হতো। যারা প্রত্যক্ষভাবে বাজারে কোন প্রকার প্রতারণা, অনিয়ম দেখলে সাথে সাথেই তা রোধ করার লক্ষ্যে রায় দিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা নিতো। এভাবেই মুক্ত সুবিচারমূলক ও স্বচ্ছ বাজারের পরিবেশ সবসময় বজায় থাকতো।

সত্যিকার মুসলিম শাসন ব্যবস্থা যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দারুল ইসলামের সেই অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে ইনশাআলাহ্।

৫. মজুদদারীর ভিত্তিতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা এবং মুক্ত বাজারকে অস্থিতিশীল ও কলুষিত করা।

মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত, রসুল (স) বলেছেনঃ *মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি পণ্য গুদামজাত করে সে গুনাহগার*। (মুসলিম, ৪:৩৯৭৭ পৃ: ৫৩৫)।

উমর (রা) হতে বর্ণিত, রসুল (সা) বলেছেনঃ *যে ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য আনে তাতে তার বরকত নাযিল হয়। কিন্তু সে যদি মূল্যবৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত সেসকল পণ্য জমা বা মজুদ করে রাখে সে অভিশপ্ত*। (ইব্‌নে মাজাহ্, দারিমী)।

ইব্‌নে উমর (রা) রসুল (স) হতে বর্ণনা করেছেনঃ *যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখে সে আলাহকে পরিত্যাগ করলো এবং আলাহও তাকে পরিত্যাগ করেন*। (রাযিন)।

মজুদদারীর মাধ্যমে অনৈতিক ও অবৈধ আর্থিক লাভ অর্জিত হয় তাই সেটা রিবা।

৬. মুক্তবাজার ও স্থিতিশীল অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা থাকে, কিন্তু বাজার কুক্ষিগত করে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হলে বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে যায় যারা তাদের খেয়াল খুশীমত মূল্য নির্ধারণ করে এবং এতে ক্রেতাসাধারণ প্রতারিত হয়। এটি রিবা। বিশেষ করে এ ধরনের রিবা ইসলামের শত্রুদেরকে আরও শক্তিশালী করে তোলে কারণ সে ক্ষেত্রে প্রতারণামূলকভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ লাভে সচেষ্ট থেকে মুসলিম তথা সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধেই একটি চরম সংকট তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনা অতীব ভয়ংকর। এদের পরিকল্পনা হলো বাজার থেকে অন্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে একচেটিয়াভাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে তাদের দাসে পরিণত করতে পারে।

৭. কিস্ড়িতে ক্রয়-বিক্রয়। বর্ধিত হারে যে মূল্য পরিশোধ করা হয় কিস্ড়ি বা বিলম্বে পরিশোধ করার জন্য।

৮. অনুমাননির্ভর ফাটকা কারবার। এ ধরনের লেনদেন অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদি অনুমিত হয় যে কোন দ্রব্য বা পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে তা আগে থেকে কিনে মজুদদারীর মাধ্যমে অপেক্ষা করা এবং পরবর্তীতে দাম বাড়লে বিক্রি করে দেয়া। অথবা এর উল্টোটা যদি ঘটে যেমন যদি অনুমিত হয় যে পণ্যের দাম কমে যেতে পারে তখন পণ্য যথাসম্ভব বিক্রি করে দেয়া ও দাম কমলে তা কিনে আবার মজুদ করা। এ ধরনের ফাটকাবাজি ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হল রিবা। এখানে কোন শ্রম ব্যয় করতে হয় না এবং তা জুয়ারই নামান্ড়র মাত্র।

ধূর্ত ও কিছু কিছু চালবাজ লুণ্ঠনকারী ধনী শোষক গোষ্ঠী আছে যারা ফাটকা বাজারে প্রভু সেজে বসে আছে। বাজার দর ও তার সার্বিক অবস্থা তাদের নখদর্পনে থাকে। এরা হয় খুবই চৌকষ। লেনদেনের ব্যাপারে বাজারের ভেতরের খবর এরা সংগ্রহ করে, কোন্ জিনিসের দাম বাড়তে পারে, কোন্টির দাম কমতে পারে, সে অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এরা অভাবনীয় লাভ করে। সুতরাং এই লেনদেন শুধু অনুমান নির্ভর ফাটকাবাজী নয় বরং তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। অনুমান নির্ভর লেনদেন হারাম কারণ এটি জুয়া খেলারই রূপান্ড়রিত সংস্করণ মাত্র। কারণ, এ ধরনের লেনদেনে উৎপাদন বা শ্রমের প্রচেষ্টা জড়িত থাকে না বরঞ্চ থাকে ধোঁকাবাজি ও ভাঁওতাবাজি। ভাবতে অবাক লাগে যে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে এ ধরনের অনুমান নির্ভর ধোঁকাবাজি লেনদেনের প্রকোপই প্রচন্ড। বলতে গেলে বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শতকরা ষাট ভাগ লেনদেনই ফাটকাবাজী বা অনুমান নির্ভর লেনদেন। এই অবৈধভাবে নিরীহ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে মুনাফা অর্জন, বর্তমান পুজিঁবাদি বিশ্বে এখন অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। সকলেই এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আগাম ও আভ্যন্ড়রীণ তথ্যের ভিত্তিতে ফাটকাবাজী ব্যবসা হলো নির্ভেজাল রিবা। যখন ফাটকাবাজীর ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে, আর রিবাখোররা আভ্যন্ড়রীণ আগাম তথ্য লাভের সুবিধা ভোগ করে, তখন এর পরিণতিতে কৃষক, শ্রমিক ও দিনমজুরের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শিল্প-কারখানা ও কৃষি জমি থেকে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা হাত বদল হয়ে ফাটকাবাজদের হাতে জমা হতে থাকে। পরিশেষে এই ফাটকাবাজরা কৃষক-মজুরের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ তুলে দেয় রিবাখোর ধড়িবাজ লুণ্ঠনকারীদের হাতে। কঠোর শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ এভাবে আভ্যন্ড়রীণ তথ্যফাঁস এবং একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের কারণে হাত বদল হয়ে ফাটকাবাজীর মাধ্যমে রাতারাতি পৌঁছে যায় কথিত মুক্তবাজার নিয়ন্ড়, সুদখোরদের হাতে।

৯. অনেক সময় অনুমান নির্ভর বা ফাটকাবাজী লেনদেন আশানুরূপ ফল লাভ করে না বরং বিব্রতকর অবস্থার সূচনা ঘটায়। মূল্য বা দাম যেহারে বাড়বে বলে আশা করা

হয়েছিল, তেমন হারে বৃদ্ধি হয় না। ফাটকাবাজরা কখনোই চায়না তাদের বিনিয়োগ কোন ঝুঁকি বা ক্ষতিকর লেনদেনে আটকা পড়ে যাক। এ ধরনের ঝুঁকি এড়াতে তারা পণ্য দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট দাম দিয়ে নেবার প্রতিশ্র“তি দিয়ে ঐ পণ্যের বিনিময়ে অফেরৎযোগ্য কিছু অর্থ বায়না করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এতে করে সে উপযুক্ত অবস্থা দর্শনের সুযোগ লাভ করে। যদি আকাংঙ্খিত সময়ের মধ্যে দাম বেড়ে যায় তখন সে সুযোগ গ্রহণ করে এবং তা বিক্রি করে তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জন করে নেয়। যদি দাম না বাড়ে সেক্ষেত্রে সে সেই সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এতে করে অবশ্য তার বায়নার টাকাটা মার যায়।

মুক্ত বাজারে জিনিসের দাম বাড়া বা কমা শুধুমাত্র বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যার মূল চালিকা শক্তি আল্লাহ তা'আলার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সম্পদের প্রসারণ ও সংকোচনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতেই ন্যস্ড় রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদের বন্টন ও পুন বন্টনের ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখেন। সেক্ষেত্রে এ ধরনের বায়না করে অনুমান ভিত্তিক ব্যবসার সুযোগ তৈরী করা ও দাম নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টার অর্থই হলো আল্লাহ্র ক্ষমতার উপর হস্ড়ক্ষেপ করা। এজন্য এটি হারাম।

১০. ঘুষ এবং দুর্নীতি – ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঘুষ গ্রহণ, ঘুষ প্রদান, বা ঘুষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজনকে প্রতারিত করে অপরজনকে সুযোগ করে দেয়া রিবার অন্ড়র্গত। রিবা অনেক সময় পৃষ্ঠপোষকতা ও ঘুষের রূপ ধারন করে যা অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর অপক্ষমতা বিস্ড়ারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। সৌদী সরকার মনোনীত এক ইসলামিক স্কলারের কথাই ধর“ন না কেন, যাকে সৌদী সরকার পাঁচশত হাযার ইউ এস ডলার পুরস্কার দিয়েছে। এই পুরস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি নিজ স্বত্তা বিক্রি করে দিয়ে বন্দিত্বকেই বরণ করে নিয়েছেন। ফলে তিনি নিজের এবং তার সকল পদক্ষেপ নিরপেক্ষতার অতল গহ্বরে ডুবে গিয়ে তার আন্দোলন ব্যর্থতার রূপ নিয়েছে। তারা আর ইসলামের শত্র“দের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আর এটাই শত্র“দের বিজয়। ইসলামের শত্র“রা এভাবেই দুনিয়ায় বিজয়লাভ করে চলেছে। সত্যিকার ভাবে এই সাফল্যের পেছনে মূল লক্ষ্য যা ছিল তা হলো–

যে সকল বিষয় এই বিজয়কে সহজতর করে দেয়, তা হলো যখন যে ব্যক্তিত্বকে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা চায়, তখন তারা মানব মনের স্পর্শকাতর দিকগুলির উপর হস্ড়ক্ষেপ করে। যাদের ধনলিপ্সা রয়েছে তাকে ধনসম্পদ দিয়ে, যার উচ্চ ডিগ্রী দরকার তাকে উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ পাঠিয়ে, যার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব তাকে তা সরবরাহ করে তাদের নৈতিকতা ও বিবেককে কিনে নেয়া হয়। এভাবে মানুষের প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে তা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বকে কিনে নেয়া এবং কর্ম ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়ার কৌশল থিওডর হারজেল ইহুদিবাদ (Zionism) এর কান্ডারী তার The Jewish State (ইহুদি রাষ্ট্র) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, সংকটের

সময়ে আমরা প্রত্যেকে এক একজন বিপ্লবী মজুর, বিপ্লবের পক্ষের অধীনস্ত কর্মচারী। আর যখন আমাদের উত্থান ঘটে, তাৎক্ষণিক ভাবে উত্থান ঘটে আমাদের ধনভান্ডারের প্রচন্ড প্রতাপ।

১১. পিরামিড স্কিম- মানুষের লোভের আতিশয্যকে পুঁজি করে গত চার-পাঁচ দশক ধরে চালু হয়েছে পিরামিড স্কিম নামে প্রতারণার নতুন প্রকল্প। যার প্রভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে চলেছে বিশ্বের বহুলোক। এক ধরনের কু-চক্র গোষ্ঠি সরল অথচ অতি লোভী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভাওতা দিয়ে 'পিরামিড' স্কিমের নামের আড়ালে অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছে। অনেকেই সরলতা, নির্বুদ্ধিতা ও লোভের কবলে পড়ে পিরামিড স্কিমের ফাঁদে আটকা পড়ে সম্পদ হারা হয়েছে।

এ 'পিরামিড' স্কিম কিছু বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়। সাধারণত তারা প্রচলিত পেনশন স্কিমের চেয়ে উচ্চহারে মুনাফা (সুদ) ঘোষণা করে এবং জমাকৃত টাকা থেকে অল্প কিছুদিন উচ্চহারে মুনাফা দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে অনেক নির্বোধ, লোভী, অজ্ঞ মানুষ তাদের সঞ্চয় এই স্কিমে জমা রাখে । এ ধরনের উচ্চ লভ্যাংশের টোপ দেখিয়ে তারা জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করে অর্থ জমা করতে থাকে। তাদের এই লভ্যাংশের হার বেশী হওয়ার কারণে দ্রুত তা প্রচার পায় ফলে মানুষের রক্তে লালসার ঢেউ উথলে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ বেশী মুনাফা লাভের আশায় তাদের সারা জীবনের পরিশ্রমের সঞ্চিত সম্পদ লোভাতুর হয়ে এখানে বিনিয়োগ করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে। এই বিনিয়োগে তাদের অর্থ পিরামিডের ন্যায় প্রসার বা উচ্চতা লাভ করবে এমন একটি ধারণার জন্ম নেয়। এই সকল স্কিম কয়েক বছর চালানোর পর প্রচুর অর্থ জমা হলে বিনিয়োগ আদায়কারী প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয় এবং সম্পূর্ণ ডুব মেরে উধাও হয়ে যায় অথবা আইনের আশ্রয়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে সেখান থেকে কেটে পড়ে। ফলে বিনিয়োগকারীরা মুনাফা তো দুরের কথা মূলধনই চিরতরে হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের স্কিম রিবা। প্রায়শই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এই ঘটনার জ্বলন্ত উদাহরণ আলবেনিয়া। যা একটি মুসলিম প্রধান দেশ!

১২. লটারী– আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে সারা দুনিয়া জুড়ে বেসরকারী পর্যায়ে তো বটেই এমনকি সরকারও জাতীয় লটারীর নামে টাকা সংগ্রহ করে চলেছে। লটারী মানে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়া। পিরামিড স্কিমের সাথে এ সকল লটারী প্রকল্প অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এখানেও মানব মনের অদম্য লোভ, অলীক ইচ্ছা ও স্বপ্নকে উপজীব্য করে প্রতারণা করা হয়। গরীব ও মধ্যবিত্ত থেকে যখন কেউ লটারীর পুরস্কার জিতে নিয়ে হঠাৎ করে অকল্পনীয় রকম বড়লোক হয়ে যায়, তখন তা সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় যা অত্যধিক লোভাতুর প্রভাব বিস্তার করে। হঠাৎ বড়লোক হবার নেশায় সবাই নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে আর লটারীর টিকিট কিনে সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করে।

বাস্তবিক অর্থে লটারীর টিকিট বিক্রয়ের অর্থ থেকে খুব সামান্য অংশই পুরস্কারের জন্য ব্যয় করা হয়। এই শ্রমবিহীন অর্জিত অর্থ পেয়ে কিছু লোক উপকৃত হয় এবং একই সাথে প্রচুর অর্থ এজেন্টদের কাছে চলে যায়। সাধারণত সরকার কোন কল্যাণমূলক কাজের নামে লুন্ঠনকারীদের ছত্রছায়ায় আবেদনময়ী প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে, যাতে করে বাইরে থেকে এর উদ্দেশ্য মহৎ বলে প্রতীয়মান হয় তবে এটা আসলে অভিনব পদ্ধতিতে মানুষকে শোষণ করার একটি কুটকৌশল। এ ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে পড়ে তা অবশ্যই প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং এ ধরনের কর্মকান্ড অবশ্যই রিবা।

এছাড়াও বর্তমান যুগে আরো অনেক প্রকার কর্মকান্ডই রিবার আওতায় পড়ে যায় যা ব্যবসায়ী মহল তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। তাছাড়া নতুন নতুন ক্ষেত্রে অভিনব রূপে রিবার আত্মপ্রকাশ ঘটে চলেছে। মুসলিম উম্মাহ্কে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে এবং যথাসম্ভব এই সকল কর্মকান্ড পরিহার করার উপায় ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। আর এই সকল কর্মকান্ড এড়িয়ে চলার জন্য সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যাংক ঋণ এবং রিবা আল-ফাদ্‌ল

অর্থ বা মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানে ব্যাংক হতে সুদী ঋণ নেয়ার রূপ ধারন করেছে। এটি রিবার অন্তর্ভূক্ত। এ ধরনের রিবাকে রিবা আল-ফাদ্‌ল বলা হয় যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নবী (স) বলেছেন, দুই প্রকার মূল্যবান ধাতু (সোনা এবং রূপা) এবং চার প্রকার পণ্যদ্রব্যের (গম, বার্লি, খেজুর ও লবন) এ ধরনের পণ্য বিনিময় বা লেনদেনের ক্ষেত্রে একইরকম। পণ্যসমূহের লেনদেন যদি হাতে হাতে এবং পরিমাণে সমান না হয় তবে তিনি তা নিষেধ করেছেন। এই আইনের যে কোন প্রকার লংঘনই রিবা।

উবাদা বিন সামিত (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ *স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রোপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণ লবণের বিনিময়ে সমান সমান এবং হাতে হাতে (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলি যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয় (একজাতীয় পণ্য না হয়) তোমরা যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়।* (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯১৮ পৃ:৫১৫)।

(এ হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী হাদীসটি লক্ষ্য করুন।)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনায় রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন: *সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা রিবায় (সুদে) পরিণত হবে। আর গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী সমান দোষে দোষী হবে।* (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯১৯, পৃ:৫১৫)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত: *রসুলুল্লাহ্ (স) জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের আমিল (তহশীলদার) নিযুক্ত করলেন। সে জানীব নামের উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে রসুল (স) জিজ্ঞেস করলেন, খয়বারের সকল খেজুরকি একই শ্রেণীর? সে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসুলুল্লাহ্ এরকম নয়। আমরা দু'সা এর পরিবর্তে এ খেজুর এক 'সা' এবং তিন 'সা' এর পরিবর্তে দু'সা ক্রয় করে থাকি। একথা শুনে রসুল (স) বললেন এরকম করবে না। নিম্নমানের খেজুর নগদ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে। তারপর ঐ দিরহাম দিয়ে নগদ মূল্যে জানীব খেজুর ক্রয় করবে এবং এরূপ করবে ওজন ক্ষেত্রেও।* (বুখারী, ৪:২০৫৬ পৃ:৮৮; ও মুসলিম, ৩৯৩৬ পৃ: ৫২০)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: *একদা বারনি জাতীয় খেজুর নিয়ে বিলাল (রা) রসুলুল্লাহ্ (স) নিকট আগমন করলেন, রসুল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কোত্থেকে এনেছ? বিলাল (রা) বললেন আমাদের কাছে কিছু নিম্নশ্রেণীর খেজুর ছিল, আমি তা থেকে দু'সা' দিয়ে এক 'সা' বারনি খেজুর কিনেছি। রসুল (স) কে খাওয়ানোর জন্য। রসুলুল্লাহ্ (স) বললেন, সাবধান! সাবধান! এতো নিশ্চিত রিবা (সুদ) এরূপ করোনা। বরং যখন তুমি উত্তম খেজুর ক্রয় করতে চাও, এটা বিক্রি করো এবং এর মূল্য দ্বারা উত্তম খেজুর ক্রয় করো।* (মুসলিম ও বুখারী, ৪:৩৯৩৮, পৃ:৫২১)।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: *রসুলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে কিছু খেজুর বিলাল (রা) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আমাদের খেজুর অপেক্ষা এই খেজুরতো খুবই উত্তম, কোথা থেকে আনলে এগুলি? তিনি বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্ আমাদের দু'সা' খেজুর এই (উত্তম) জাতের এক 'সা'র বিনিময়ে বিক্রি করেছি। রসুল (স) বললেন, আহ্! এতো প্রত্যক্ষ রিবা (সুদ)। এ ফেরৎ দিয়ে দাও,* অতপর *আমাদের খেজুর বিক্রি কর এবং এ জাতীয় খেজুর আমাদের জন্য ক্রয় কর।* (মুসলিম, ৪:৩৯৩৯)।

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রা) বলেছেন: *রসুলুল্লাহ্ (স) সা'দ গোষ্ঠীর দুই সাহাবী (রা)-কে গণিমতের (যুদ্ধের পাওয়া সম্পত্তি) সমস্ড় সোনা ও রূপার চাকতি বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন। তারা তিন চাকতির বিনিময়ে চারটি বিক্রি করলেন। রসুল (স) তখন বললেন তোমরা রিবা গ্রহণ করেছ এ বিক্রি বাতিল করে দাও।* (মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক)।

[আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত: *রসুলুল্লাহ্ (সা) দুই সা'দকে বলেছেন, "সমানে সমান ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না। একটি অপরটি কম বেশী করবে না। সমান সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না এবং একটি*

অপরটির চেয়ে কমবেশী করবে না। আর একজনেরটি নগদ এবং অপরজনেরটি বাকীতে বিক্রি করবে না।" (বুখারী, ৪:২০৩৭, পৃ:৭৭)।]

মালিক বিন আওস বিন হাসান আল-নাসারি বর্ণনা করেছেন: *আমার এক শত দিনারকে দিরহামে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বললেন, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ আমাকে ডেকে পাঠালেন। (সোনা ও রূপার সাথে সোনা ও রূপার বিনিময়ের ব্যাপারে) আমরা পরস্পরে এ ব্যাপারে সম্মত হলাম। সে আমার কাছ থেকে সোনা হাতে নিয়ে সেটা উল্টে পাল্টে দেখলো এবং বললো ঘাবাহ থেকে আমার স্টোর কিপার আসা পর্যন্ড় অপেক্ষা কর। উমর বিন খাত্তাব তা শুনে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর কসম, টাকা না পাওয়া পর্যন্ড় তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। অতপর তিনি বললেন, রসুল (স) বলেছেন, সোনার বদলে রূপার বিনিময় রিবা, যদি না তা নগদ লেনদেন হয়, গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় রিবা, যদি না তা হাতে হাতে লেনদেন হয়। খেজুরের পরিবর্তে খেজুর বিক্রয় রিবা যদি না তা নগদ লেনদেন হয়, বার্লির বিনিময়ে বার্লি বিক্রয় রিবা যদি না তা নগদ লেনদেন হয়, এবং লবণের বদলে লবণ বিক্রয় রিবা, যদি না তা নগদ লেনদেন হয়।* (মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক)।

মালিক বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত: *তিনি একবার এক শত দিনারের বিনিময়ে সারফ (স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়কে সারফ্ বলে) এর জন্য লোক খুঁজতে লাগলেন। তখন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম, অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সারফ্ করতে রাজী হলেন এবং আমার থেকে স্বর্ণমুদ্রাটি (দিনার) নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার কর্মচারী ঘাবাহ (নামক স্থান) হতে ফিরে আসা পর্যন্ড় তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঐ সময়ে উমর বিন খাত্তাব আমাদের আলোচনা শুনছিলেন এবং তিনি বলে উঠলেন আল্লাহর কসম তার (তালহার) মুদ্রা গ্রহণ না করা পর্যন্ড় তোমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারবেনা। কেননা রসুল (সা) বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ বিক্রি রিবা। নগদ নগদ না হলে গমের বদলে গম বিক্রি রিবা। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব এবং খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি রিবা।* (সহীহ বুখারী, ৪:২০৩৪, পৃ:৭৫-৭৬)।

আবু সলিহ আয-যাইয়্যাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: *আবু সাঈদ খুদরী (রা) কে বলতে শুনলাম, দিনারের বদলে দিনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান হলে বিক্রি করা অনুমোদিত)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইব্নে আব্বাস (রা) তো তা বলেন না? উত্তরে আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি তাঁকে (ইব্নে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটা নবী (স) থেকে শুনেছেন নাকি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, এর একটিও আমি দাবী করছি না। আপনারাই তো আমার চেয়ে নবী (স) কে বেশী জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা বিন যাঈদ (রা) জানিয়েছেন, নবী (স) বলেছেন, বাকীতে বিক্রি ছাড়া রিবা নেই সেটা ব্যাতীত যখন এই লেনদেন নগদ নগদ হয়না (অর্থাৎ যখন দেরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়।* (সহীহ বুখারী, ৪:২০৩৮, পৃ:৭৮)।

উপরোক্ত হাদীসগুলি বুঝতে অনেককেই কিছুটা জটিলতার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এমনকি তাদেরও, যারা নিউইয়র্কে ইসলাম বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তবে ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে হাদীসগুলির ভাবার্থ বেশ সহজ। যদি কোন ব্যক্তি অপর কাউকে একটি সোনার দিনার ধার দেয়, তাহলে টাকা পরিশোধের চুক্তি হবে সম পরিমাণের একটি দিনার, তার থেকে একটি সোনার দিনারের বেশী হওয়া উচিৎ নয়। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য আমাদের যেভাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক কিনতে হয়, সেভাবেই যে বাজারে প্রকৃত মুদ্রা (স্বর্ণ মুদ্রা) বিক্রি হয়, জনগণকে সেখান থেকেই তা কিনতে হবে। ইউ এস ডলার দিয়ে যেভাবে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক কিনতে যাই সেভাবেই যে বাজারে প্রকৃত মুদ্রার বেচাকেনা হয় সেখান থেকে দিরহাম দিয়ে সোনার দিনার কিনতে পারা উচিৎ। অথবা চাইলে বড় আকারের সোনার কয়েন (পয়সা) দিয়ে এক আউন্স ওজনের ছোট আকারের সোনার মুদ্রা কিনতে পারা উচিৎ ছিল। (যেভাবে পাঁচটা ২০ ডলারের নোট দিয়ে ১০০ ডলার রূপান্ড়র করা যায়, তবে ব্যতিক্রম হল কাগুজে মুদ্রা নিজেই রিবার আওতাভূক্ত।) এ ধরনের অর্থ যেখানে কেনা বেচা করা যায় রিবা এড়ানোর জন্য সেখানে নগদ লেনদেন এবং পরিমাণে সমান সমান এই দুটি শর্ত অবশ্যই পুরণ করতে হবে।

তবে কাগুজে মুদ্রার মান সর্বদা সমান হয় না। তাছাড়া সকল প্রকার কাগুজে মুদ্রাই রিবার অন্ড়র্ভুক্ত। এক্ষেত্রে কাগুজে মুদ্রার মানের উপর ভিত্তি করে সমমানের সোনার ছোট-বড় চাকতি ব্যবহার করে লেনদেন সম্পন্ন করা গেলে রিবাকে এড়ানো সম্ভব হতো।

সবচেয়ে গুর ত্বের সাথে যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো সমজাতের পণ্য লেনদেনের পরিমাণ হতে হবে সমান সমান এবং লেনদেন হতে হবে নগদ নগদ। সোনা, রূপা, খেজুর বেচা কেনার বেলায় উট বেচা কেনার নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন: *উমর বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, "একটি দিনারের বদলে একটি দিনার, একটি দিরহামের বদলে একটি দিরহাম এবং এক সা এর বিনিময়ে এক সা। আর নগদ অর্থ (মুদ্রা) বাকীতে বিক্রি করোনা*। (মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক)।

হাসনান বিন মুহাম্মদ ইবন আবি তালিব বলেছেন: *আলী ইবন আবি তালিব বিশটি উটের বিনিময়ে আবু উসারফির নামক উটটি (বাকীতে) বিক্রি করেছেন*। (মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক)।

নাফি (রহ) বর্ণনা করেছেন: *আবদুল াহ ইবন উমর (রা) একটি মাদী উটের বিনিময়ে চারটি উট কিনেছেন এবং এমন ব্যবস্থা করলেন যেন উট চারটি তাদের মালিকের কাছে পৌছে দেয়া হয়*। (ইমাম মালিক)।

এর কারণ এই ছিল যে তৎকালীন সময়ে উট লেনদেনের জন্য মুদ্রার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হত না, তবে মাঝে মাঝে খেজুর বিকল্প মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত।   সেজন্য

চারটি উটের বাচ্চার পরিবর্তে একটি পুর্ণবয়স্ক উট বিনিময় হলেও এক পেটি খারাপ মানের খেজুরের সঙ্গে এক পেটি উৎকৃষ্ট মানের খেজুর বিনিময় সম্ভব হতো না।

হাদীসগুলির উদাহরণ এমন হতে পারে, ব্যাংক থেকে আমেরিকান ডলারে ঋণ নিয়ে আমেরিকান ডলারেই সে ঋণ পরিশোধ করতে হলে এই ঋণ বৈধ। এ ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সোনা, রূপা, গম ইত্যাদির মতই বিনিময়ের শর্ত হবে সম পরিমাণ লেনদেন। নবী (স) এর হাদীস অনুযায়ী যে কোন ধাতু বা পণ্যের বিনিময়ে সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ের পরিমাণ সমান সমান। হাদীস অনুযায়ী ব্যাংকের সুদ যা কাগজ, প্লাস্টিক বা ইলেকট্রনিক মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা সম্পূর্ণ হারাম।

নবী (স) লেনদেনের মাধ্যম বলতে মূল্যবান ধাতু হিসেবে সোনা, রূপা এবং গম, বার্লি, খেজুর এবং লবন এ সকল পণ্যদ্রব্যের কথা বলেছিলেন, সুতরাং এগুলিই বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। যা মানুষ আজ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে রসুল (স) এ সকল পণ্য বিনিময় মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে যাননি। তাই কাগুজে মুদ্রা সেই আঙ্গিকে নিষিদ্ধ। এর সপক্ষে মুওয়াত্তায় উদ্ধৃত ইমাম মালিক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে। *সোনা, রূপা অথবা ওজন পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রিত ভোগ্যপণ্য ব্যাতীত রিবা নেই*।

অর্থাৎ যদি ব্যাংক থেকে কাগুজে মুদ্রায় ১০০০ ইউ এস ডলার ঋণ নেয়া হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১০০০ ইউ এস ডলারই পরিশোধ করতে হবে। এর অতিরিক্ত পরিমাণ ডলার পরিশোধই হবে রিবা। এক্ষেত্রে ধরা যাক ব্যাংক, চুক্তিবলে ৬% সুদ হিসেবে ১০০০ ইউ এস ডলার ফেরৎযোগ্য বলে ধরে নিল, এক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য বিষয়টি ঠিক হলেও পরিমাণগত দিক দিয়ে সমান সমান হল না, কাজেই এটি নিশ্চিত রিবা। কারণ ইউ এস ডলার, অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়। ইউ এস ডলার কিংবা অন্য যে কোন কৃত্রিম বা কাগুজে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে হালাল কিনা, সেটা অবশ্যই প্রশ্নের বিষয়। এর জবাব হলো কাগুজে কিংবা অন্য যে কোন কৃত্রিম মুদ্রা নিজেই নির্ভেজাল রিবা। তাই তা হারাম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মুদ্রা হল যে মুদ্রার নিজের মান নিজের মধ্যেই নিহিত সে মুদ্রাই বিনিময় মাধ্যম হতে পারে তার পরিবর্তে কোন কৃত্রিম বা কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা যাবে না।

এক্ষেত্রে অর্থ বিনিময়ের জন্য আমরা কি করতে পারি? অবশ্যই কৃত্রিম মুদ্রাকে প্রকৃত মুদ্রায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে হবে। তথাপি মুসলিমরা বর্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন, তা হলো প্রকৃত মুদ্রা বিনিময়ের প্রচলন ফিরিয়ে আনতে হলে যে কোন ভাবেই স্বর্ণ খুবই অপরিহার্য। আর ইসলামের শত্রুদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার অধিকাংশ স্বর্ণ পারলে সমুদয় স্বর্ণের (কাঁচা সোনা এবং মুদ্রা) সরবরাহ যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।[১]

ব্যাংকের লভ্যাংশ এবং রিবা–কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী।

শেখ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী মিশরের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি স্কলার, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিউ-ইয়র্ক পরিদর্শনে যান। অতপর সেখান থেকে ফিরে এসে রায় দেন যে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত লাভ রিবা নয়। কারণ ব্যাংক যে সুদ দেয় তা পুঁজি বিনিয়োগ করে যে মুনাফা পায় তা তারই অংশ যাকে বলা হয় লভ্যাংশ। সুতরাং, কোম্পানীতে যে ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ দেয়া হয়, তার সঙ্গে ব্যাংকের দেয়া সুদকে তিনি এক করে ফেলেন। সত্যিকথা বলতে কি ব্যাংক হল একটি অর্থ লগ্নীকারি প্রতিষ্ঠান। তার কাজই হল সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দেয়া। সাধারণ আমানতকারীর কাছ থেকে অল্প সুদে অর্থ জমা রেখে, সে অর্থই বেশী সুদে ধার দেয়াই ব্যাংকের প্রধান কাজ। ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের হারের মাঝে পার্থক্য যা থাকে ব্যাংক তাকেই মুনাফা হিসেবে দাবী করে এবং তার সবটুকু অংশই নিজের পকেটস্থ করে। ব্যাংক সাধারণত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে না। কেননা বিনিয়োগের মূলনীতি হলো, যখন ব্যবসায় লাভ হয় তখন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ অনুপাতে লাভের অংশ পাবে। আবার লোকসান বা ক্ষতি হলে বিনিয়োগ অনুপাতে সে ক্ষতিরও অংশীদার হবে। কিন্তু এ ধরনের কোন প্রমাণ ব্যাংকের বেলায় পাওয়া যায় না কারণ ব্যবসায় ক্ষতির বিষয়কে সামনে রেখেই ব্যাংক সুদে টাকা ধার দেয়ার মত বিনিয়োগকেই নিরাপদ ও অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

১ পূর্বোলি খিত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে নিয়ম পদ্ধতির উপর ক্রয় বিক্রয় হালাল-হারাম অবস্থা নির্ভর করে। সমজাতীয় পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। আবার নিয়ম-পদ্ধতি বদলিয়ে নিলে তা হালাল। ইসলামের শত্রুরা কিংবা মোটা বুদ্ধির মুসলিমরা মনে করতে পারে কেনা-বেচার নিয়ম -পদ্ধতি যা-ই থাকুক শেষ ফলতো একই হয়ে যায়। তাহলে আর সমস্যা কোথায়? কিন্তু না উভয় নিয়মের চূড়ান্ত ফলাফল একই রকম মনে হলেও এতে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। নিয়ম পদ্ধতি মেনে না চললে প্রকৃতপক্ষে নিম্নমানের পণ্যের মালিক তার পন্যের ন্যায্য দামতো পায়ই না এমনকি তা জানার সুযোগও রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া নিম্নমানের পণ্যের সাথে উচ্চমানের পণ্যের সরাসরি বিনিময় প্রতারণার সুযোগ করে দেয় এবং বিক্রেতা নিজের পন্যের মূল্যমান জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এটি হারাম। তবে ভিন্ন জাতীয় পণ্যের অসম বিনিময় যেমন এক জাতীয় পন্যের সাথে অন্য জাতীয় পণ্যের কম বেশী বিনিময় পদ্ধতি হালাল। তবে এক্ষত্রে শর্ত হলো পরস্পরের বিনিময় অবশ্যই হওয়া চাই নগদ নগদ।

যে ব্যাখ্যা শেখ গাজ্জালী দিয়েছিলেন, তা হয়ত তিনি দিয়ে থাকতে পারেন যেভাবে ব্যাংক পরিচালিত হয় সে বিষয়ে তার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে। যদি ব্যাংক নিজের উদ্যোগে ঋণ দেয়া ছাড়া সকল প্রকার ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে অর্থ বিনিয়োগ করতো তাহলে ব্যাংক বাজারে বিশাল রকমের লাভের প্রভাব ফেলতে পারত। ফলে দ্রব্যমূল্য উলে খযোগ্য হারে কমে যেত। অথচ ব্যাংকগুলি বিনিয়োগে আগ্রহী নয়, কেননা বিনিয়োগ এক ধরনের ব্যবসা। অন্য ব্যবসার মত বিনিয়োগেও ক্ষতি বা লোকসানের ঝুঁকি থাকে এবং ঝুঁকি পর্যায়ক্রমে ক্ষতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

মিশরের সরকার নিযুক্ত মুফতী শেখ তানতাওয়ী, যিনি বর্তমানে মিশর সরকার কর্তৃক শেখ আল আজহার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তিনিও বলেছেন যে ব্যাংকের লাভ রিবা নয়। তার এই ফতোয়া ১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মিশরের পত্রিকা আল-আহরাম এ প্রকাশিত হয় যে মিশরের ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ, ব্যাংক সার্টিফিকেট এবং সঞ্চয়ী হিসাব

হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ রিবা নয়। এসকল উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামে হালাল বলে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন।

এসকল ব্যাংক সার্টিফিকেট মিশরে বিনিয়োগ সার্টিফিকেট নামে অভিহিত। অথচ এ ধরনের বিনিয়োগে কোন লোকসানের ঝুঁকি নেই। আর যেকোন ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগই নির্ভেজাল রিবা।

রসুল (স)–কৃত্রিম মুদ্রা–মুদ্রাস্ফীতি এবং রিবা

কিছু তথাকথিত ইসলামি স্কলার 'ব্যাংকের সুদ'কে জায়েজ ঘোষণার পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে বলেছেন মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে লোকসান হয় তা পূরণ করার জন্য এই লভ্যাংশ ব্যবহার করা প্রয়োজন তাই এটা বৈধ। এটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ড়ধারণা। প্রথমত 'সুদ' বা রিবা নিজেই আধুনিক অর্থনীতিতে অভিশপ্ত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। আর মুদ্রাস্ফীতি হলো আধুনিক সুদ-ভিত্তিক পুঁজিবাদি অর্থনীতিরই এক অভিনব সৃষ্টি। বর্তমানকালের সুদী, পুঁজিবাদী অর্থনীতির আবির্ভাবের পূর্বে মুদ্রাস্ফীতির কোন অস্ড়িত্বই ছিল না।[১]

১ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে কৌশলে দরিদ্রের সম্পদ ধনবানরা নিয়ে যায়। পূর্বোলিখিত উদাহরণে দেখা যায় ৯০ সালে যে টাকার বিনিময়ে তারা ১০০০ মার্কিন ডলার কেনা সম্ভব ছিল, এখন সেই একই পরিমান টাকা দিয়ে কেনা যায় ৫০০ ডলার। গত পনের বছরে ৫০০ ডলার পরিমান টাকা উধাও হয়ে গেল। আরো লক্ষ্য করুন, ১৯৯০ সালে স্বর্ণের ভরি ছিল ৭০০০ টাকা আর বর্তমানে (২০০৬) সে একই স্বর্ণের ভরি হয়ে গেল ১৯০০০ টাকা। এবার মুক্ত মনে চিন্ড়া করে দেখুন মুদ্রাস্ফীতির কারণে, কার অর্থ সম্পদ কিভাবে কার কাছে চলে যায়। মুদ্রাস্ফীতি মূলত এমনই এক সুক্ষ্ম প্রতারণার কৌশল যা অদৃশ্য শক্তি বলে খেটে খাওয়া মানুষের অক্লান্ড় পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ সম্পদ লুণ্ঠিত হয় অথচ অসহায় মানুষের কিছুই করার থাকে না।

দ্বিতীয়ত মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস হিসেব করেই ব্যাংকে সুদ কষা হয়, কারণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্যই হল মুনাফা অর্জন। তাছাড়া সমস্ড় ব্যাংকগুলিই থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতাধীন, তারা কড়া নজর রাখে মুদ্রাস্ফীতির কারণে কোন ব্যাংক যেন বিধ্বস্ড় না হয়ে যায়। ব্যাংক সত্যিকার অর্থেই অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় অত্যাধিক মুনাফা করে। আর ব্যাংকের সিংহভাগই উপার্জিত হয় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুদ থেকে। অর্থনৈতিক দর্শনের যে দিকটি ব্যাংকের এই সুদী উপার্জনকে অনুমোদন করে তা হলো অর্থেরও নিজস্ব একটি ক্ষমতা ও চালিকা শক্তি আছে। ফলে অর্থ, মানুষের দ্বারা কোন চেষ্টা সংগ্রাম ছাড়াই আরো অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম। গড়হবু নৎরহমং সড়হবু, সড়হবু নৎববফং সড়হবু আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান অর্থনীতির এই দর্শন। কুর'আনের নির্দেশ হলো মানুষকে (হালাল) কিছু পেতে হলে তাকে অবশ্যই সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কুর'আনের এই দর্শনের

মূল ভিত্তিই হল কেউ যদি পুরস্কার আশা করে (তা অর্থ বা অন্য যা কিছুই হোক) এর সঙ্গে শ্রম, অধ্যাবসায় ও প্রচেষ্টা অন্র্ভুক্ত হওয়া জর—রী।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ, কোন পণ্যদ্রব্য ও সেবার চাহিদার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের রিয্ক নির্ধারণ করে নিজ হাতে তা বন্টন করেন এবং সত্যিকারভাবে প্রকৃত মুদ্রা (সোনা, রূপা, গম, বার্লি, খেজুর, লবন) বা সম্পদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। পক্ষান্তরে অর্থ ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যম পরিবর্তন হওয়াতে বর্তমানে পুঁজিবাদি সুদভিত্তিক ব্যাংক এবং সরকারগুলিই মুদ্রা সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ করে। তারা এটা করতে পেরেছে কাগুজে ও অন্যান্য কৃত্রিম মুদ্রা উদ্ভাবনার মাধ্যমে। নৈতিকতা ও মানবতার বিষয়টি তোয়াক্কা না করে তারা জনসাধারণকে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যের ভান্ডার হিসেবে কৃত্রিম মুদ্রা মেনে নিতে বাধ্য করে। এটি সম্পূর্ণ প্রতারণা। আর এটি ঘারার, এটিই রিবা।

বর্তমানে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা নিজেরাই তাদের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির ফাঁদে আটকা পড়েছে। তারা যদিও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে মানুষের রিয্ক নির্ধারণ করেন (তাদের নিজ বুদ্ধিতে) তার চেয়েও দক্ষতার সাথে তারা সে কাজটি করতে গিয়েছিল (নাউযু বিল্লাহ্ মিন যালিক–আমরা এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পানাহ্ চাই)।

সরকার যদি মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে তবে অর্থনীতিতে এ ধরনের কৃত্রিম মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারার কথা ছিল। আর এটা সরকারেরই দায়িত্ব। তবে বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সরকার প্রাণান্ত চেষ্টা করেও মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে পারেনা। মুদ্রাস্ফীতি জনিত অভিশাপের উৎপত্তি এখানেই। আর এটাই কৃত্রিম মুদ্রা প্রচলনের ব্যর্থতা। যার খেসারত দিয়ে চলেছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলি। মিল্টন ফ্রায়েডম্যান, মুদ্রাবিষয়ক অর্থনীতিবিদ অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বলেছেন, "এটা বোঝা যাচ্ছে ...যে মুদ্রাস্ফীতি সর্বদা, সর্বত্রই মুদ্রাসম্পর্কিত বিষয়। এটা এজন্য যে, মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয় উৎপাদনের (Output) তুলনায় মুদ্রার পরিমাণের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে"।

আজ আর ইউ এস ডলারের কোন নির্দিষ্ট স্থিরকৃত মূল্য যে নেই শুধু তা-ই নয়, বরং ইউ এস ডলারের উৎপাদন এত বেশী হয়েছে যে, বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতিরূপে সৃষ্ট বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্য একে ডলার এর অস্বাভাবিক বৈদেশিক চাহিদার উপরও পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে। আমেরিকান রাজনীতিবিদ, বিদ্বান ও দূরদর্শী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব থমাস জেফারসন ১৮১৬ সালের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে কর্মকান্ডের জন্য দোষারোপ করেছিলেন ইউ এস সরকার আবারও সে কাজগুলি করে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন,

"আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলি, দন্ডায়মান সৈন্যদের চেয়েও মারাত্মক ভয়ঙ্কর। আর তহবিল সংগ্রহের (Funding) এর নামে অর্থসাহায্য করা বা

অর্থঋণ দেয়া তা যেভাবেই হোক না কেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের সেটা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। এটা আর যা কিছুই হোক না কেন ভয়ঙ্কর প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়”।

ডলারের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্থিরকৃত হোক এই দাবী তিনি জানিয়েছেন। ১৭৮৪ সালে ইউ এস সরকারের মুদ্রানীতি বিষয়ক শীর্ষক একটি বিতর্কে তিনি যে দাবীর অবতারণা করেন তা হলো, “যদি আমরা সিদ্ধান্ড় নেই যে ডলারই আমাদের মুদ্রা এবং তা যদি লেনদেনের একক হয় তাহলে আমাদের সুনির্দিষ্ট করে বলে দিতে হবে ডলার কি?

১৭৮৪ সাল থেকে শুর— করে দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৯২০ সাল পর্যন্ড় এ যথার্থ বিষয়টিকে অতীব জর—রী ও অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে ইউ এস সরকার সম্মান দেখিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তা গুর—ত্বহীন ও ব্যর্থতায় রূপ নিয়েছে।

কাগুজে মুদ্রা যা স্বর্ণ বিনিময়ের প্রমাণ পত্র (Gold Certificate) হিসেবে ছিল, যাতে বলা ছিল, This Certifies that there had been deposited in the Treasury of the United States of America twenty dollars in gold coins payable to the bearer on demand.

সত্যায়িত করা যাচ্ছে যে, কোষাগারে ২০ ডলার মূল্য মানের স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখা আছে যা বাহককে চাহিবামাত্র প্রদান করতে হবে।

তখনকার দিনে যে কেউ ইচ্ছে করলেই ব্যাংকে গিয়ে কাগুজে মুদ্রা বদলে নিয়ে স্বর্ণমুদ্রারূপী প্রকৃত বা আসল মুদ্রার অধিকারী হতে পারতো। পরবর্তীতে এই প্রমাণ পত্র পাল্টে দিয়ে পুনরায় লিখা হয়,

Redeemable in lawful money at the United States Treasury, or at any Federal Reserve Bank.

ইউ এস কোষাগার (Treasury) অথবা যে কোন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে আইন সঙ্গত মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য।

পরিবর্তিত এই লিখার মাধ্যমে যথাযথ বিনিময় হিসেবে কাগুজে মুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্ড়রের বিধিবদ্ধ অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

ইদানিংকালের ইউ এস ডলারে লিখা থাকে: *This note is legal tender for all debts, public and private.*

এটি সরকারী বা বেসরকারী সব ধরনের ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত বিধিবদ্ধ প্রত্যয়ণ পত্র।

হতে পারে তাদের দৃষ্টিতে এটি আইনগত দিক থেকে বৈধ কিন্তু এটি অবশ্যই নীতিবিবর্জিত। কারণ এই নোট প্রকৃত মূল্যমানে (সোনা বা রূপা) পুনঃরূপান্ড়র করা যায় না। কাগুজে মুদ্রার যদি কোন প্রকৃত মূল্য থেকেই থাকে, তা শুধু কাগজের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ। যার ফলে বাজার এই কাগজের যে দাম নির্ধারণ করে দিবে সেটাই তার মূল্য। সুতরাং দর বেঁধে দেয়া কাগুজে মুদ্রার মূল্যমান শুধুমাত্র বাজারদরের উপর নির্ভরশীল। মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রকরা কখনও তাদের বেঁধে দেয়া মূল্য কমবেশী করার সুযোগ অন্য কাউকে দেয় না। বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় আসল মুদ্রার (স্বর্ণমুদ্রার) পরিবর্তে কাগজের নোট ব্যবহৃত হয়। কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও জালিয়াতির জন্মদাতা। যেহেতু স্বর্ণমুদ্রা রূপী আসল মুদ্রার নিজস্ব যেমন মূল্য থাকে কাগুজে মুদ্রার সেরূপ কোন মূল্য থাকে না। মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, কাগজের নোটে যে মূল্য নির্ধারণ করে দেয় সেটাই তার মূল্য। মূলত এই কাগুজে মুদ্রার বাজারদর ততদিন টিঁকে থাকে যতদিন এর প্রতি মানুষের আস্থা ও চাহিদা থাকে। আর কাগুজে মুদ্রার উপর আস্থা এবং এর চাহিদার ব্যাপারটি এমন যা ফাটকাবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে কমানো বাড়ানো যায়। এটি নির্ঘাৎ প্রহসন, এটি তামাসা, মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতি। আর তাই এটি রিবা।

কাগুজে, প্□াস্টিক বা ইলেট্রনিক মুদ্রাগুলিকে রূপান্ড়রের প্রতি সংবেদনশীল না করে উপায় নেই। কেননা এই সকল কাগুজে মুদ্রা ফাটকাবাজীর বেলাতেও অরক্ষিতই থেকে যায়। সমগ্র ইউরোপবাসীর জন্য ইউরোপীয়ান কম্যুনিটি যে সার্বজনীন মুদ্রা (ঊঁৎড়-ঈঁৎৎবহপু) প্রচলনের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে তা সত্যিই একটি বলিষ্ঠ এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আর যেসব মুসলিম আল□াহ ও রসুল (স) আনুগত্য অনুসরণ করছে বলে দাবী জানায় তারা যদি এ থেকে শিক্ষা নিত তাহলে তারা একক মুদ্রা ও স্বর্নের বিনিময় প্রচলন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারত।

ইউরোপে একক মুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। আর এ বিষয়ে সফলতায় তারা পৌঁছতেও পারবে না। কারণ বিশ্বের মুদ্রা বাজারে ফাটকাবাজী লেনদেনের ক্ষমতা প্রতিহত করার সামর্থ সরকারের নেই। কারণ বর্তমান মুদ্রা বাজার রয়েছে বিশ্বের সেরা দুষ্টশক্তি ফাটকাবাজদের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে। সর্বগ্রাসী লোভ লালসার কাছে দুষ্টচক্র এই ফাটকাবাজরা তাদের নৈতিক বিশ্বস্ড়তা ও দেশপ্রেমকে বিক্রি করে দিয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও ফাটকাবাজী মূলত বিশ্বমানবতাকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আল□াহ্ তা'আলার নির্দেশিত মুদ্রাকে (দিনার, দিরহাম) কাগুজে মুদ্রায় রূপান্ড়রিত করে আমরা সকলেই চরম অন্যায় ও গুণাহ্ করেছি। আজকের এই দাসত্বের শৃংখল আমাদের সে গুণাহ্ ও নাফরমানিরই পরিণতি। কেননা একমাত্র আল□াহ্তা'আলার নির্দেশিত মুদ্রাই সকল পরিবর্তনশীলতা ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত।

আধুনিক আর্থিক ঋণ (Credit) ইসলামে অনুমোদনযোগ্য, কেননা তা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিকে পূরণ করে থাকে এই যুক্তি যারা দেখায় তারা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অগভীরতাকেই প্রকাশ করে মাত্র।

পথভ্রষ্ট মুসলিম যারা সুদ দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণ হয় বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে সুদকে ইসলামে বৈধ বলে প্রচারণা চালায়, তারা তাদের ভ্রান্ড় পথ থেকে ফিরে আসার জন্য যা করতে পারে তা হলো, ব্যাংক থেকে তারা যে ঋণ নেয় তার মূল্য দিয়ে কতটুকু স্বর্ণ কেনা যায় তা যাচাই করে দেখা। অতপর যখন ঋণ পরিশোধ করতে হয় তখন আরেকবার সোনার মূল্যমানে তা নির্ধারণ করা, যদি দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হয়, যেমন পরিশোধযোগ্য অর্থ, ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ থেকে যদি অধিক হয়, তাই রিবা। আর এই রিবা ইসলামি আইনে নিষিদ্ধ বা হারাম। আমরা আরো লক্ষ করে দেখতে পারি রসুল (স) সোনার বিনিময়ে সোনা সমান সমান করে লেনদেন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ধরা যাক কোন এক ঋণদাতা ১৯৮৯ সালে একশত স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৪ সালেও তাকে একশত স্বর্ণমুদ্রাই গ্রহণ করতে হবে তার অধিক এক পয়সাও আদায় করে নিতে পারবে না। ১৯৮৯ সালের একশত দিনারের মূল্য হয়ত ১৯৯৪ সালের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। যেমন ১৯৯৪ সালে একশতটি সোনার দিনার দিয়ে যে পরিমাণ গম ক্রয় করা যেত। যে কোন কারণে ১৯৯৪ সালের মধ্যে গমের মূল্য বেড়ে যেতে পারে। যার ফলে সে একশতটি দিনার দিয়ে ১৯৮৯ সালে যে পরিমাণ গম ক্রয় করা সম্ভব ছিল ১৯৯৪ সালে সে পরিমাণ গম ক্রয় করা হয়ত যাবে না। তা সত্বেও সোনার বদলে সোনা এই নিয়মটিই বলবত থাকবে। এখন আমাদের জানা-বোঝার সময় এসেছে যে, মুদ্রাস্ফীতি নিজেই রিবার অন্য একটি রূপ। মুদ্রাস্ফীতি এতই ভয়ংকর রিবা যা নীরবে নিভৃতে প্রবেশ করে মানুষের সমুদয় সম্পদ আত্নসাৎ করে নেয় অথচ মানুষ তা বুঝতেই পারে না।

অর্থনীতিতে চৌকস ও ধড়িবাজ শ্রেণীর লোকেরা যারা জানে নিজেদের সুবিধা আদায়ে কখন কাকে দিয়ে কি করাতে হয় এবং কোন্ কৌশল ব্যবহার করতে হয়। এসব লোকেরা মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে অভাবনীয় মুনাফা অর্জন করে চলে। এরা আনাড়ী, অসহায়, নির্দোষ লোকদের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত চোষার ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ সকল অসহায় আনাড়ী লোকেরা কম থেকেও কম মূল্যে তাদের কঠোরতম শ্রম বিক্রি করে যায় কৃত্রিম কটি কাগুজে মুদ্রা পাওয়ার জন্য। অথচ এই কাগুজে মুদ্রা ক্রমাগতভাবে এর মূল্যমান হারাতে থাকে। অতীব গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় হলো বর্তমান (মুসলিম) উম্মাহকে রসুল (স) এর কৃত্রিম মুদ্রা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে এবং সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। কেননা পার্থিব অর্থাৎ কৃত্রিম (কাগুজে, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক) মুদ্রার ধ্বস নামার ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। যে সকল দুষ্টচক্র মুদ্রা বাজারের আস্থা ও চাহিদাকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম, সে সকল শক্তি এক সময় ফাটকাবাজির ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং রসুল (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্ড়বতায় পরিণত হবে।

আবু বাকর বিন আবু মারইয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রসুল (স) কে বলতে শুনেছেন: *মানবজাতির উপর এমন এক সময় আসবে যখন দিনার এবং দিরহাম (সোনা এবং*

রূপার মুদ্রা) ছাড়া অন্য কোন মুদ্রার কোন মূল্যই থাকবে না। সুতরাং একটি দিনার ও দিরহাম হলেও সঞ্চয় করে রাখ। (আহমদ)।

রসুল (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার পথে দিনকাল এগিয়ে চলেছে। বর্তমান মুদ্রানীতি সোনা উৎপাদনে কাগজ ব্যবহার করছে। এটি প্রতারণা, কারণ কাগুজে মুদ্রা নিজেই রিবা। এবার এর ব্যাখ্যাদান করা যাক। ধর ন আপনার দাদা একশত স্বর্ণমুদ্রা সম্পদ হিসেবে রেখে ১৯৭১ সালে ইন্ড়িকাল করলেন। যার উত্তরাধিকার আপনি, যা আপনার শিশুকালে আপনার থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল। পঁচিশ বছর পর, ১৯৯৬ সালে আপনি আপনার প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা ফেরত চাইলেন। যে বাক্সে এটা জমা রাখা হয়েছিল সেটা খুলে একশত স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এখানে আপনার অর্থ বাড়ল না আবার কমলোও না বরং অপরিবর্তিত থেকে গেল। এটাই আসল মুদ্রা যা মুদ্রা হিসেবে সফলতার সাথে তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে। এটাই মুদ্রার সবচেয়ে গুর ত্বপূর্ন ভূমিকা যা পালনে সে সক্ষম হয়েছে (Store of Value) মূল্যমানের ভান্ডার হিসেবে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়েই স্বর্ণ বিশ্বস্ড়তার সাথে এভাবেই নিজস্ব ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অথবা ধরা যাক, ১৯৭১ সালে যাদের কাছে আপনার দাদা সে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) গচ্ছিত রেখেছিল তারা সিদ্ধান্ড় নিল মুদ্রাগুলি কৃত্রিম মুদ্রায় বদলে রাখবে, কেননা কাগুজে মুদ্রা দিনারের চেয়ে অধিক সুবিধাজনক। তাছাড়া তারা ইউ এস ডলারের আস্থা ও শক্তির প্রভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, ডলারের (মুদ্রিত) দাবী সঠিক ও নির্ভেজাল-In God we trust অর্থাৎ আমরা প্রভুতে বিশ্বাস করি। আর তাই তারা একশতটি স্বর্ণমুদ্রা (একশত আউন্স সোনা) ১৯৭১ সালে ইউ এস ডলারে রূপান্ড়রিত করে ৩৫০০ ডলার পেল। তারা এই টাকা খুব গোপনে ও সযতনে রেখে দিল। এই টাকা বিনিয়োগ করাও সম্ভব হলো না কারণ একাজ করতে আপনার দাদা নিষেধ করে গিয়েছেন।

১৯৯৬ সালে আপনি আপনার অর্থ-সম্পদ ফেরত চাইলে তারা আপনাকে ৩৫০০ ইউ এস ডলার ফেরত দিলেন। তখন আপনার দাদা যে স্বর্ণমুদ্রা রেখে গিয়েছেন আপনি তাই ফেরত চাইলেন। তারা মুদ্রা বাজারে গেল ডলারগুলি সোনায় রূপান্ড়রিত করার জন্য। আর তখনও তারা ডলারে লিখা 'আমরা প্রভু-তে বিশ্বাস করি' এই দাবীর উপর আস্থা রেখেছিল। কিন্তু অত্যন্ড় দুঃখজনক এবং হতাশার ব্যাপার ঘটল যে, তাদেরকে হতবুদ্ধি করে ৩৫০০ ইউ এস ডলারকে রূপান্ড়রিত করে তাদেরকে অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র ৮টি স্বর্ণমুদ্রা তাদের হাতে তুলে দিল। তাদের চরম ক্ষতির সম্মুখীন করে এই পঁচিশ বছরে অত্যন্ড় বেদনাদায়ক এই ঘটনাটি ঘটে গেল। আর মুদ্রাস্ফীতির কারণে আপনার সম্পদের ৯২% পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাছে হস্ড়ান্ড়র হয়ে গেল। পঁচিশ বছরে হারিয়ে গেল আপনার ১০০টির মধ্য থেকে ৯২টি স্বর্ণমুদ্রা! মুদ্রা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে কাগুজে অর্থ দারুনভাবে ব্যর্থ হল। কাগুজে মুদ্রা মূল্যমানের ভান্ডার হিসেবে বিশ্বস্ড়তার

সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারলোনা। আপনার ৯২% ক্ষতি ছিল মূলত লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদীদের ৯২% মুনাফা। পুঁজিবাদী লুণ্ঠনকারীরা আপনার সম্পদ কেড়ে নিয়ে আপনাকে নিঃস করে দিল প্রতারণার মাধ্যমে। আর এটাই রিবা।

কৃত্রিম মুদ্রা প্রকৃত মুদ্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃত মুদ্রার নিজস্ব অন্তর্র্নিহিত মূল্য আছে কিন্তু কৃত্রিম মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্যই নেই। কৃত্রিম মুদ্রা বিশেষ করে কাগুজে মুদ্রার মূল্য তা যা মুদ্রা বাজারের ধুরন্দর প্রভাবশালী মহল মুদ্রার উপর ছাপিয়ে দেয়। কাগুজে মুদ্রার বাজারদর নির্দিষ্ট পরিমাণে ততদিনই টিঁকে থাকবে যতদিন বাজারে এর চাহিদা থাকবে। আর চাহিদা সর্বদাই দুপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আস্থা ও বিশ্বস্ড়তার উপর নির্ভরশীল।

অথচ বর্তমান মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বের সর্বাধিক নীতি বিবর্জিত প্রভাবশালী শক্তিগুলির মাধ্যমে। লোভ ও অনৈতিকতা সে শক্তিগুলির মূলধন। এখানে বিশ্বস্ড়তা ও দেশপ্রেমের কোন অস্ড়িত্ব নেই। তাই যে কোন মুহূর্তেই মুদ্রা বাজারের আস্থা ও বিশ্বস্ড় তাকে বিশৃংখল ও ধ্বংস করে দিয়ে রসুল (স) এর ভবিষদ্বানীকে সত্যে পরিণত করতে পারে।

একটি উদাহরণ হলো, যদি মুসলিমরা তেল সম্পদের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। আর তাদের রপ্তানীকৃত তেলের মূল্য অপরিবর্তনযোগ্য কৃত্রিম কাগুজে মুদ্রা, ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা তথা প্রকৃত অর্থের মাধ্যমে আদায়ের দাবী জানায়। তবে কাগুজে মুদ্রার প্রতি আস্থা লক্ষনীয়ভাবে কমে যাবে। কেন ঘটবে এমন ঘটনা? অপরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রা, প্লাস্টিক বা ইলেকট্রনিক মুদ্রার মূল্য ঠিক ততটুকু যতটুকু মানুষ দ্বারা মূল্যের মান স্থিরকৃত হয়। যখন মুদ্রার উপর মানুষের আস্থা নড়চড় হয় তখন কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যমানেও ধ্বস নামে। তেলের মূল্য হিসেবে সোনার চাহিদা, কাগুজে মুদ্রার উপর মানুষের আস্থাকে নাড়িয়ে দিবে। মুদ্রাবাজারের ধুরন্ধর ফাটকাবাজ শক্তিগুলি সারা জীবনের সবচেয়ে বড় দানটি মারার জন্য যে কোন সুযোগ সর্বগ্রাসী লোভের সাথে লুফে নিবে। আর সেটাই পর্যায়ক্রমে রূপান্ড়রের অযোগ্য কাগুজে মুদ্রার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্ড়র্জাতিক মুদ্রা বাজারে ধ্বস নামার কারণ ঘটাবে। মূলত মুদ্রাই হলো পুঁজির ভিত। মুদ্রার ধ্বস নামার অর্থ হলো 'মুদ্রা বাস্পের মত মিলিয়ে যাওয়া' বা মুদ্রা উধাও হয়ে যাওয়া যেমনি উধাও হয়ে গিয়েছে ৫০০ ডলার (দেখুন পৃ--) কিংবা ৯২টি স্বর্ণমুদ্রা (দেখুন পৃ---) আর কাগুজে মুদ্রার ধ্বস নামার সাথে সাথে রিবা ভিত্তিক পুঁজিবাদও ধ্বংস হয়ে যাবে। পক্ষান্ড়রে যাদের প্রকৃত মুদ্রা আছে তারা টিঁকে থাকবে। সুযোগ সন্ধানী ফাটকাবাজরাই তখন সবচেয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করবে। আর সম্পদ হারাবে সাধারণ জনগণ। তারা মূল্যহীন কাগজ (মুদ্রা) নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হবে। এটাই হবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ধ্বস যা খুব শীঘ্রই ঘটার অপেক্ষায়। রসুল (স) ছাড়া কযেকজন ব্যক্তিও এটা অনুমান করেছিলেন। যুডি শেল্টন তার অসাধারণ গ্রন্থের

শিরোনাম দিয়েছিলেন "Money melt down", যা লিখা হয়েছিল মুদ্রা বাজারের উপর।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ না এবং বাদবাকী বিশ্বকেও ভুলে যেতে দেয়া যাবে না ১৯৮০ সালের ২১শে জানুয়ারী যে নাটকীয় ও নজীরবিহীন ধ্বস নেমেছিল ইউ এস ডলারের। যখন স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের মূল্য আউন্স প্রতি ৮৫০ ডলারে নেমে গিয়েছিল। ১৯৭০ যার মূল্য ছিল আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার। আর ১৯৮০ সালের স্বর্ণের মূল্য দাড়াল আউন্স প্রতি প্রায় ৩৮০ ডলার। ১৯৯৭ সালে এর মূল্য ২৮০-৩০০ ডলারে উঠানামা করেছিল আর বর্তমানে এর মূল্য হয়েছিল ৫০০ ডলার। ডলারের এই ধ্বস নেমেছিল পশ্চিমাবিরোধী ইসলামিক অভ্যুত্থানের সফল জাগরণের ফলস্বরূপ। যার মাধ্যমে ইরানের বিশাল তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নৈতিকতা ও রীতি বিরোধী বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ইরান সরকার বিধিবদ্ধ বিশ্ব ব্যবস্থার বির‌ুদ্ধে ছিল কারণ এটা গড়ে উঠেছিল অ-নিরপেক্ষ ভিত্তির উপর। যা আধুনিক, স্রষ্টাবিহীন ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার থেকে উদ্ভুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকে প্রতিদ্বন্দিতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। সোনার দাম বর্তমান পর্যায়ে যে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে তা সেই সকল নীতিমালার সফলতার প্রতিফল। যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানটি কেন আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির ধ্বসকে হুমকীর মুকাবিলা করে? এই ব্যাপারে মুদ্রানীতি বিশেষজ্ঞরা একেবারেই নিরব। আর লুটেরা ফাটকাবাজী শক্তিগুলি যারা এই ধ্বস সম্পর্কে পূর্বাভাস পেয়েছিল তারা আরো অধিক নিশ্চুপ। কেননা তারা রসুল (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ভাল করেই জানত। তাই তারা শংকিত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে কৃত্রিম মুদ্রা ধ্বসে যাওয়ার ব্যপারে সে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে তা হয়তো বাস্তবতার রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। তবে বাস্তবে এটা ছিল সে নির্দিষ্ট আগুনের প্রথম ঝাপটা মাত্র, যে আগুন ধেয়ে আসছিল অতি নিকটে।

কান্ডজ্ঞানশূণ্য ও নীতিবিবর্জিত সরকারগুলি দ্বারা সৃষ্ট কাগুজে মুদ্রা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন মাধ্যম দ্বারা সামগ্রিকভাবে এই দুনিয়ার মানুষ রিবার সংস্পর্শে আসতে পারে বলে আমরা মনে করি না। বর্তমান কাগুজে মুদ্রা আর সে ভূমিকা পালন করে না, যা ছিল মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্য আল্লাহ্ সৃষ্ট মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ সোনা বা রূপায় পরিবর্তনযোগ্য (Interchangable)।

কাগুজে মুদ্রা আসলে মূল্যহীন কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মুদ্রা পুরাপুরিভাবেই এক প্রকার কৃত্রিম সম্পদ এবং এটা নিশ্চিত শঠতা ও প্রতারণা। আর প্রতারণামূলক লেনদেন যা মুক্ত ও সুবিচারমূলক স্বচ্ছ বাজারের কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয় তাই রিবা। বর্তমান শঠতাপূর্ণ কাগুজে মুদ্রার সার্বজনীন প্রচলন (যে মুদ্রা প্রকৃত মূল্যে রূপান্তর যোগ্য নয়) এবং সুদী অর্থ ঋণ আদান প্রদানই হলো আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তি যা

সুদী ঋণ লেনদেনের মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদ মানবজাতির উপর আধিপত্য বিস্ড়ার করেছে। এ সকল কারণেই বলা যায় রসুল (স) এর রিবা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী বাস্ড় বতায় পরিণত হতে চলেছে। অবশ্য ইতিমধ্যেই কারো কারো জীবদ্দশায় এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্ড়বে পরিণত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আবু হুরাইরাহ্ (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন:

মানবজাতির উপর এমন একটা সময় আসবে যখন একটি লোকও রিবার ব্যবহার হতে রেহাই পাবে না। সে সরাসরি রিবা না খেলেও সুদের ধুলা বা বাস্প তার কাছে পৌঁছবে। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌নে মাজাহ্)।

উলে্খ্য যে, উসমানীয় খিলাফাহ্ বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ড় রিবা ও শঠতাপূর্ণ কৃত্রিম কাগুজে মুদ্রা হতে মুসলিম বিশ্ব সুরক্ষিত ছিল। ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফাহ্‌র বিলুপ্তি ঘটলে ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিষাক্ত রীতিনীতি ও অর্থ ব্যবস্থা ইসলামি খিলাফাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে বন্যা পূর্ববর্তী বাঁধের দ্বার খুলে দেয়ার মতই পাশ্চাত্য হাওয়া ও শয়তানী কর্মকান্ড মুসলিম উম্মাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার লেবাস ধারন করে। যা গোটা বিশ্বের মুক্ত বাজারকে দুর্নীতিগ্রস্থ ও অস্থিতিশীল করে তোলে। দুর্নীতি এসে শুধু মুক্ত বাজারকে ধ্বংস করে দিয়ে সে শক্তি থেমে থাকেনি বরং প্রলয়ংকারী দানবের বেশে ঢুকে পড়েছে বিশ্বমানবতার মন-মগজ ও দেহাভ্যন্ড়রে। তাই যখনই সুযোগ আসবে, মুক্ত বাজারকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামি আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে হবে। আর মুক্ত বাজার পুনরুদ্ধারে একান্ড়ভাবে প্রয়োজন হবে সোনাকে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পুনঃপ্রবর্তন করার। কৃত্রিম মুদ্রার ধ্বস নামার ব্যাপারে রসুল (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী শুধু মুখে মুখে আওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং ব্যাপারটি অতি সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করতে হবে অর্থনীতির প্রতিটি পর্যায়ে।

মিকদাম বিন মা'আদিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত: *তিনি রসুল (স) কে বলতে শুনেছেন, "মানুষের মাঝে এমন যুগ অবশ্যই আসবে যখন দিনার ও দিরহামই শুধু কাজে লাগবে।* (আহমাদ)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, রসুল (স) এর ভবিষ্যদ্বাণী কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক ও কাগুজে মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন আর কাগুজে টাকার কোন মূল্যই থাকবে না। ফলে কাগুজে মুদ্রা মূল্যহীন কাগজেই পরিণত হয়ে যাবে।

আলাহ্ তা'আলা ১৯৭৩-৭৪ সালে এই কাগুজে মুদ্রার শঠতাপূর্ণ আচরণ আমাদেরকে বুঝে নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ড় বিদেশী সরকারগুলির অনুমোদনের ফলে আউন্স প্রতি ৩৫ ইউ এস ডলার হারে স্বর্ণ বিনিময়যোগ্য ছিল (Bretton Woods Agreement অনুযায়ী)। ১৯৭০ সাল পর্যন্ড় সৌদী আরব

যদি তেল বিক্রির ৩৫ বিলিয়ন ডলার জমা করে না রেখে ডলারগুলি সোনায় রূপান্তর করে রাখতো, তাহলে সৌদী আরব দেখতে পেত যে এর মূল্য এক বিলিয়ন আউন্স সোনা কেননা Bretton Woods চুক্তি বলে মুদ্রা বিনিময়ের হার ছিল প্রতি ৩৫ ডলারে ১ আউন্স সোনা। অথচ Bretton Woods চুক্তির প্রতি আস্থা রেখে সৌদী সরকার ডলারগুলি সোনায় রূপান্তর না করাটাই শ্রেয় মনে করেছিল।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ইউ এস সরকার অভনব পদ্ধতিতে Bretton Woods চুক্তি থেকে সরে আসলো এবং ডলার স্বর্ণে পরিবর্তন করার দায়দায়িত্ব তুলে নিল। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে মিশরীয় সৈন্যরা ইসরাঈল আক্রমন করে প্রাথমিকভাবে উলে�খযোগ্য বিজয় লাভ করলো। ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য ইউ এস সরকার ইসরাঈলকে পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য একটি আকাশ-সেতু (air bridge) স্থাপন করল। ফলে তেলের বাণিজ্য থেকে ইউ এস কে বয়কট করার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। এতে পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে এক মারাত্মক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং ইউ এস ডলারের মূল্য রাতারাতি কমে গেল। ফলে ১ আউন্স সোনার দাম ৩৫ ডলারের পরিবর্তে হয়ে গেল ১৬০ ডলার। তবে আমেরিকাকে বয়কট (একঘরে) করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্বদানের জন্য সৌদী আরবকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, তা হলো, ডলারের ধ্বস নামার সাথে সাথেই সৌদী আরবের এক বিলিয়ন আউন্স স্বর্ণ হঠাৎ করেই বাস্পের মত উবে (উধাও) গেল। ফলে তাদের কাছে যা রইল তা ছিল, মাত্র প্রায় ২২০ আউন্স (এক মিলিয়ন আউন্স থেকে কমে) স্বর্ণের মত। কারণ সৌদী সরকার তাদের তেল বিক্রির অর্থ ডলারে জমা করে রেখেছিল। ফলে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন আউন্স সোনার মূল্য (ডলারের দাম কমে **যাওয়ার** ফলে) বাস্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। সৌদী আরব এবং মুসলিম বিশ্বকে আরো বড় ধরনের মূল্য দিতে হয়েছিল যখন বাদশাহ্ ফয়সাল (আল�াহ তাঁর উপর রহম করুন) গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। যা ছিল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমা হামলার মতই একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আর এটা ছিল নির্দোষ অন্ধ মিশরীয় শেখ আব্দুর রহমানের জিহাদী আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার তীব্র বেদনাদায়ক একটি পদক্ষেপ।

জানুয়ারী ১৯৮৯, ইরানের ইসলামি অভ্যুত্থানের সময় সোনার দাম এক লাফে বেড়ে গিয়েছিল আউন্স প্রতি ৮৫০ ডলারে। অর্থাৎ ইউ এস ডলারের মূল্য লক্ষ্যনীয়ভাবে কমে যাওয়ায় স্বর্ণের মূল্য হয়েছিল আউন্স প্রতি ৮৫০ ডলার। সৌদী আরব যদি ১৯৭০ সালে ৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল বিক্রি করে থাকে এবং মনে করে থাকে যে তাদের অর্থের মূল্য এক বিলিয়ন আউন্স স্বর্ণের সমান, তবে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে যে, তাদের ৯৬% স্বর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। আর তাদের ৩৫ বিলিয়ন ডলার, এক মিলিয়ন আউন্সের মাত্র এক চতুর্থাংশ সোনা কিনতে সক্ষম। এটা খুবই বিস্ময়কর যে কথিত ইসলামিক স্কলারগণ যারা রিবা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করেন, তারা কাগুজে মুদ্রার অন্তর্নিহিত রিবাকে চিনতেই পারছেন না।

বর্তমানে ইউ এস ডলারে লেনদেন হয় স্বর্ণের আউন্স প্রতি প্রায় ৫০০ ডলারে। আমাদের মতে মুসলিম বিশ্ব যদি তাদের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে চায়, আর তারও আগে যদি তেলের বিনিময় মূল্য স্বর্ণমুদ্রায় পরিশোধের দাবী জানায়, তাহলে ইউ এস ডলারের মূল্যমানে চরম ধ্বস নামবে। যেমন ধ্বস নেমেছিল ১৯৭৪ এবং ১৯৮৯ সালে। মুসলিম উম্মাহ্ যেন সেদিনের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, যেদিন মুদ্রাস্ফীতি নামক প্রকান্ড শঠতার বাস্তবতা আঘাত হেনে তাদের জাগিয়ে তুলবে, আর বুঝতে পারবে যে কাগুজে মুদ্রা ব্যবহারের পরিণতি। মুসলিমদের অন্তত প্রকৃত মুদ্রা (দিনার, দিরহাম) পুনঃপ্রচলনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

অবশেষে ইনশাআল্লাহ্ ইমাম মাহদী (আ) এর আগমনের মধ্য দিয়ে দারুল ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। অতপর সে এলাকার বাজারগুলিতে করতে হবে প্রকৃত মুদ্রার পুনপ্রচলন। আমেরিকার কিছু রাজনীতিবিদ, সায়েন্টিস্ট (বিজ্ঞানী) এবং অর্থনীতিবিদদেরও একই লক্ষ্য রয়েছে। তারা চান Bretton Woods এর মত আরও একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি মুদ্রার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যে পরিমাণ নৈতিকতা প্রয়োজন তার অস্তিত্ব পশ্চিমা সমাজে আজ আর অবশিষ্ট নেই। বস্তুত তৎকালীন বিশ্ব মাদইয়ানবাসীদের শঠতাপূর্ণ অর্থনীতির প্রচলন প্রত্যক্ষ করেছিল। যার মুখোমুখী হয়েছিলেন শুআইউব (আ)। মাদিয়ানবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল:

আর মাদিয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শুআই'বকে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার জাতির লোকসকল। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এসেছে। অতএব তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণমাত্রায় কর। লোকদের তাদের পণ্য কম দিওনা এবং যমীনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করোনা। যেহেতু সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭:৮৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা মাদইয়ানবাসীদের প্রচন্ড এক ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ীর মধ্যেই মৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন। আর সূরা আল কাহ্ফ-এ আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রতারণাপূর্ণ রিবাভিত্তিক পুঁজিবাদ সৃষ্ট আজকের বিশ্বেরও একই পরিণতি ঘটাবেন।

নিশ্চিতই যা কিছু এই যমীনের বুকে পয়দা করেছি, তা করেছি তাকে (যমীনকে) শোভা বর্ধনের জন্য। যাতে করে আমি যাচাই করে দেখতে পারি তাদের মধ্যে আমলে বা কাজেকর্মে কে উত্তম। অতপর এই যমীনে যা কিছু আছে তা (ধ্বংস করে দিয়ে) উদ্ভিদশূণ্য মাটিতে পরিণত করে দিব। (সূরা কাহ্ফ, ১৮:৭-৮)

মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণ করার বাহানায় রিবাকে আইন সিদ্ধ বলে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা আসলে মিথ্যা, বানোয়াট ও ধ্বংসাত্মক। এই যুক্তি এতই বিপজ্জনক যে, যে সকল কথিত ইসলামিক স্কলারগণ রিবাকে ইসলামে বৈধ বলে যুক্তি খাড়া করে ফতোয়া

দিয়েছেন, তারা তাদের নিরীহ মেষপালকে (ভেড়ার পাল) সরাসরি নেকড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এসব ভেড়ারূপী মুসলিম জনগণ এবং রাখালরূপী স্কলারগণ যেন জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে। বস্তুত যারা নেতাদের দ্বারা ভুল ও গোমরাহীর পথে পরিচালিত হয়ে চলেছে। ফলে জাহান্নাম যাদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গেল তাদের সম্পর্কে আল-কুর'আন ঘোষণা দিয়েছে: *এভাবে যখন সব লোকগুলি (জাহান্নামে) দাখিল হয়ে একত্রিত হবে, তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে হে আমাদের রব, এসব লোকেরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। কাজেই এদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্ড়ি দিন*। (সূরা আ'রাফ, ৭:৩৮)।

সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য কর ্ন, নেতাদেরকে তাদের শিষ্যরা দুনিয়ায় কত সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখে। অথচ পথভ্রষ্ট নেতাদের দ্বারা পরিচালিত জাহান্নামীরা আল□াহ্ তা'আলার দরবারে মামলা ঠুকে দিবে আর দরখাস্ড় পেশ করবে ভুল পথে চালানোর দায়ে যেন জাহান্নামে তাদের শাস্ড়ি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। বস্তুত পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর পরিণতি এ রকমই হয়ে থাকে। স্বর্ণমুদ্রার পুনঃপ্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রার ন্যায়পরায়ণতা ও আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় সত্যিকার অর্থে গুর ্ত্ব দেয়া যাবে তখনই শুধুমাত্র যখন মুসলিমরা দেশ পরিচালনার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে। কেননা স্বর্ণ মুদ্রার মালিকানা অর্জন এবং নিজের কাছে স্বর্ণ ধরে রাখার অধিকার হয়তো একদিন কেড়ে নেয়া হবে। ফলে সাধারণ মানুষ আর সোনার মুদ্রা জমিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারবে না। আর বর্তমানে তাই হয়েছে। সকল স্বর্ণমুদ্রা সরকার কেড়ে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৩৩ সালে এই স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণের স্বাধীনতা প্রশাসনিকভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল। লিংকন একইভাবে সিভিল ওয়ার (Civil War) এর সময় স্বর্ণমুদ্রা জনগণদ্বারা সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। উপরন্তু ইউ এস সংবিধান স্বাক্ষরের পূর্বে পরপর দু'বার এই অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল।

স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করণের আইনটি খুবই সুস্পষ্ট। জাতীয় দুর্যোগের সময় যে কোন অজুহাতে স্বর্ণ বেচা-কেনা এবং সংরক্ষণ করা বেআইনি ঘোষণা করে রাষ্ট্রিয় কোষাগারে তা জমা করা হয়। এই বিষয়টি একটি কার্যনির্বাহী আদেশে পুংখানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত আছে।

এ আইন না মানার শাস্ড়ি হল ১০ বছরের কারাদন্ড অথবা ১০০০০ ইউ এস ডলার অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড।

জাতীয় সংকটে সরকারের পতন ঘটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। মূলত হিসেবে সমন্বয়সাধন করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকে অব্যাহত এবং স্থিতিশীল রাখতে হলে সরকারী তহবিলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কিভাবে এই আর্থিক সংকটের সমাধান করা যায়? সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো সকল প্রাপ্য মূল্যবান সম্পদ জনগণ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সেগুলির জন্য পুনরায় বেশী মূল্য ধার্য করা। যার একটি জ্বলন্ড় উদাহরণ পেশ করা হল–

১৯৩৩ সালে ইউ এস এর ঋউঅ প্রশাসন সকল পর্যায়ের বেসরকারী স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করে এবং সরকার স্বর্ণের আউন্স প্রতি ২০.২৭ ডলার পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে। বিজ্ঞপ্তিটি যেরূপ ছিল তার নমুনা পেশ করা হলো–

****

পোস্টমাস্টার অনুগ্রহ করে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন কর ুন

জেমস্ এ ফারলে

পোস্ট মাস্টার জেনারেল

প্রেসিডেন্টের কার্যনির্বাহী আদেশের অধীনে

ইস্যুকৃত এপ্রিল ৫, ১৯৩৩

মে ১, ১৯৩৩ অথবা তার পূর্বে

সকল প্রকার সোনার মুদ্রা, সোনার বাঁট বা সোনার সার্টিফিকেট যা বর্তমানে তাদের মালিকানায় রয়েছে সকল ব্যক্তিকেই তা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অথবা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের শাখাসমূহ অথবা তার যেকোন সদস্য ব্যাংকে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

কার্যনির্বাহী আদেশ অমান্য করার অপরাধে শাস্ড়ি হলো ১০০০ ইউ এস ডলার বা ১০ বছরের কারাদন্ড অথবা উভয়টিই, যা উক্ত আদেশের ৯নং সেকশনে বর্ণিত।
----- কোষাগার সেক্রেটারী

****

যখনই সকল সোনা তাদের হস্ড়গত হয়ে গেলো ইউ এস সরকার ঘোষণা দেয় যে এখন থেকে সোনার নতুন মূল্য আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার যা প্রায় ৭০ ভাগ বৃদ্ধি, এভাবেই ইউ এস সরকার, জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করে নিজেদের সংকটের সমাধান করেছিল। এটাই রিবা। ইসলামি সরকার, ইসলামি আইন বিধান অনুযায়ী যতদিন পরিচালিত হয়েছিল জনগণ তখন এরকম যুলুম ও প্রতারিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বর্তমান রিবা বিশ্ব, কৃত্রিম মুদ্রার প্রচলনের কারণে শয়তানী যুগের প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করছে। যা সূরা আল কাহ্ফ এ বর্ণিত আছে। সেখানে কয়েকজন মু'মিন যুবকের কথা বলা হয়েছে। যারা যুলুমের শিকার হয়ে চলছিল এমন এক ক্ষমতাধর শক্তি দ্বারা, যাদের আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান ছিল না। মুর্তিপূজাসহ বহুবিধ শির্ক এ যে সমাজ আকণ্ঠ ডুবে ছিল। তেমনি আজকের বিশ্বও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে রাষ্ট্র, সংবিধান, সংসদ, সর্ব্বোচ্চ আদালত, জাতিসংঘ,

প্রতিরক্ষা পরিষদ আরো কত কি সৃষ্টি করে নিয়েছে। সূরা কাহ্ফ এ বর্নিত যুগও ছিল এরকমই এক শির্ক-কুফরের যুগ! সেকারণে নিজেদের ঈমান সুরক্ষার জন্য সূরা কাহ্ফ এ বর্ণিত যুবকেরা গুহায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। যেখানে আল□াহ্ তা'আলা তাদেরকে সৌর বছরের তিনশত বছর এমনকি আরো অধিক সময় (আল□াহই ভাল জানেন) ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। যখন তিনি তাদের জাগিয়ে তুললেন, তখন তারা ক্ষুধার তাড়না অনুভব করলো। ক্ষুধার কারণে তারা তাদের এক সঙ্গীকে কিছু হালাল খাবারের সন্ধানে বাজারে পাঠালো। কিন্তু যুবকেরা খাবার কিনতে যে মুদ্রা নিয়ে গিয়েছিল তার উলে□খ করতে যেয়ে কুর'আনে 'ওয়ারিক্বিকুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের সার্বজনীন অর্থ হলো রৌপ্যমুদ্রা। এমনও হতে পারে এটা 'ওয়ারাক্ব' (কাগুজে মুদ্রা) এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এই ঈঙ্গিত নির্দেশ করছে যে বর্তমান কাগুজে মুদ্রার উদ্ভাবন সূরা কাহ্ফে বর্ণিত অকল্যাণকর শয়তানী যুগের প্রত্যাবর্তনের আভাস। আল□াহ্ তা'আলাই ভাল জানেন!

পরিশেষে বলতেই হয়, কাগুজে মুদ্রা রিবা। আর এটা মানুষের কঠোর শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং আল□াহর দেয়া রিয্ক কেড়ে নেয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির বিবরণ-

January	1980	-$1 =	Tk. 15.59
January	1985		Tk. 26.00
January	1990		Tk. 32.27
January	1991		Tk. 35.79
January	1995		Tk. 40.24
January	1996		Tk. 40.89
January	2001		Tk. 54.01
January	2002		Tk. 57.14
January	2003		Tk. 58.09
January	2004		Tk. 58.75
January	2005		Tk. 60.02
Sept.	2005		Tk. 65.60
June	2006		Tk.
	Source –		

NOTES OF CHAPTER FOUR

1. Muhammad Asad, 'The Message of the Qur`an'. Op. Cit. Footnote No. 35 to verse 30:39

2. Quoted by Misbahul Islam Faruqi in: 'Jewish Conspiracy and the Muslim World', published by the author in Karachi, 1971.

3. Milton Friedman, "Quantity Theory of Money" in 'The new Palgrave': Money', ed. John Eatwell, Murray Milgate,and Peter Newman, New York:Norton, 1989. p. 28

4. Thomas Jefferson, 'Writings', New York: Literary Classics of the United States, 1984. p. 1391

5. Quoted in Ron Paul and Lewis Lehrman, ‘The Case for Gold: A Minority Report of the US Gold Commission”. Washington D. C.: Cato Institute, 1982. p.1.

6. Judy Shelton, ‘Money Meltdown : Restoring Order to the Global Currency System’. (The Free Press. NY. 1994).

পঞ্চম অধ্যায়ঃ রিবা (সুদ) সংক্রান্ড় মৌলিক আলোচনা

রিবার করাল গ্রাসে সারা দুনিয়া ছেয়ে গেছে। বিশ্বের একটি মানুষও রিবার ধ্বংসাত্মক আক্রমন থেকে রেহাই পায়নি। রিবার এই বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়ার শুধুমাত্র একটি পথই খোলা আছে, আর তা হলো একাত্মতা ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিমের রিবা বর্জনের বৈপ□বিক আন্দোলনে সরাসরি শরিক হওয়া। রিবা বর্জনের আন্দোলনে প্রতিটি মুসলিমের শরিক হওয়ার মাধ্যমে আশা করা যায়, ইনশাআল□াহ্ তারা তাদের হারানো ঈমানের কিছু অংশ হলেও ফিরে পাবে। আর সেই সাথে পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে দার"ল ইসলাম। সত্যিকার অর্থে বর্তমানে দার"ল ইসলামের অস্ড়িত্ব যেহেতু দুনিয়ার কোথাও নেই, সেহেতু সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় মানবজাতি আবার ফিরে গিয়েছে সেই সপ্তম শতাব্দির প্রাক-হিযরত তথা জাহিলিয়াতের যুগে। বোধ-বুদ্ধি ও অন্র্ড়দৃষ্টি সম্পন্ন যে কোন মুসলিম, অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকালেই জাহিলিয়াতের সকল কর্মপন্থা ও আচার আচরণের যাবতীয় প্রমাণ পাবেন।

বর্তমান সংকট মুকাবিলায় মুসলিমের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সমষ্টিগত অদম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে মক্কা হতে মদীনা হিযরতের সে পথ দ্বিতীয়বারের মত অতিক্রম করা।

মুসলিমরা কখনো কোন ভূখন্ড বা এলাকা জয় করে নিতে পারলে তৎক্ষনাৎ রিবার করাল গ্রাস থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেয়া বাঞ্ছনীয় তা হলো–

১. লাভ বা যেকোন অন্র্ড়নিহিত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ঋণদান এবং ব্যবসার সাথে জড়িত সকল প্রকার সুদী লেনদেনের আইনগত বৈধতার বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করাতে হবে। যাতে করে ঋণদাতা ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা সংস্থা কেউই ঋণগ্রহীতাকে ঋণের বিপরীতে রিবা বা সুদ আদায়ে বাধ্য করতে কিংবা কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা নিতে না পারে।

২. বাকীতে লেনদেনে ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণগ্রহণকালে বাজারদর অপেক্ষা অধিক মূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কিংবা পূর্বেই চুক্তি হয়ে থাকলে এই অবৈধ চুক্তির জন্য ঋণ গ্রহীতার বির"দ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের বিধিবিধান বিলুপ্ত করা।

৩. ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) পুনরায় প্রচলন করা। দিনার ও দিরহাম আর্থিক লেনদেনের একমাত্র মুদ্রা হিসেবে চালু করা সম্ভব হলে, দিনমজুর থেকে শুর" করে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সকল সেবা প্রদানকারীগণ মূল্যহীন কাগুজে মুদ্রার বদলে নিজ নিজ পারিশ্রমিক সোনা বা রূপার মুদ্রায়ই দাবী করতে এবং আদায় করতে পারবে। ব্যবসায়ী ও সেবা প্রদানকারী মহল প্রয়োজনে তাদের

কর্মসম্পাদনের চুক্তি পুনঃবিবেচনা বা পর্যালোচনা করার সুযোগ সংরক্ষণ করতে পারবে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলিও দৃষ্টান্ড় স্থাপনের লক্ষ্যে আন্ড়র্জাতিক ব্যবসা ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলার পাউন্ডের পরিবর্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারের দাবী জানাতে পারবে।

৪. সাদাকা ও কর্‌যে হাসানা প্রদানে উৎসাহিতকরণ, যাকাত আদায়ে বাধ্যবাধকতা এবং বিলাসিতা ও অপচয় রোধ করে কুর'আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে এমন আইন বিধান প্রণয়ন করা যাতে রিবা বা সুদী অর্থনীতি বিলুপ্তিকরণ সম্ভব হয়। শুধু আইন-বিধান প্রণয়ন করে ক্ষান্ড় হলেই চলবে না বরং প্রণীত আইন-বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ড়মূলক শাস্ড়িদানের ব্যবস্থা করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যখন আর সুদের বিনিময়ে ঋণ দেয়ার খদ্দের (ক্লায়েন্ট) খুঁজে পাবে না, অর্থাৎ সুদী ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবে না তখন তারা খোলা বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। যখনই ব্যাংকসমূহ বাজার ও প্রকৃত বাণিজ্যে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করবে তখন সার্বিকভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে ও পণ্যবাজারে নৈতিকতা, সুবিচার, সততা, নিষ্ঠা, সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গড়ে উঠবে এক সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও বৈষম্যহীন প্রতিযোগিতা। ফলে, একদিকে যেমন পণ্যের মান উন্নত হবে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যও কমে গিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার মধ্যে চলে আসবে।

সোনা-রূপার মুদ্রা প্রচলন হলে কাগুজে মুদ্রা তার মূল্য হারিয়ে ফেলবে। এতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে হত-দরিদ্র সাধারণ জনগণ যাদের কাছে কোন কাগুজে মুদ্রা জমা থাকে না। অবশ্য এতে করে লোভী ধনকুবের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ঘুষখোর অসৎ লোকদের বিরাট ক্ষতি হবে কারণ তাদের ব্যাংক একাউন্টে তখন আর কাড়িকাড়ি অর্থ জমবে না আর তারা টাকার পাহাড়ও গড়ে তুলতে পারবে না।

ঋণ এবং অর্থনৈতিক সুন্নাহ

যতদিন না দারুল ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন রিবার ধ্বংসাত্মক আক্রমন যতটা সম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টায় প্রতিটি মুসলিমের আত্মনিয়োগ করতে হবে। উপরন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী নীতি প্রণয়ন করতে হবে। রসুল (স) এর জীবন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলি দৃষ্টান্ড় হিসেবে বিশে্লষণ করে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের কুর'আন সুন্নাহ্‌র আলোকে এমন এক নীতি নির্ধারণ করতে হবে যার ফলে মানুষ রিবা বর্জনের অনুকূল পরিবেশ ফিরে পায়। মুসলিমদের বোঝাতে হবে তারা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায়

রিবার ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে। জীবনরক্ষার সর্বশেষ উপায় ব্যতীত কোন প্রকার ধার-দেনার মধ্যে যেন না যায় মানুষকে সে বিষয়ে বোঝাতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই সুদী ব্যবস্থায় ঋণগ্রস্থ আছেন বা ঋণদাতা হয়ে আছেন তারা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ঐ রিবাভিত্তিক লেনদেন তথা সুদী ব্যবস্থা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার। আর যারা সামর্থবান, তারা যেন তাদের সুদী ব্যবস্থায় ঋণগ্রস্থ ভাই-বোনদের ঐ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সর্বাত্মক সহায়তা করেন। এর ফলে সর্বাধিক প্রচলিত সুদী ব্যবস্থা –আধুনিক ব্যাংকিং যা মুসলিম সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে তা ধীরে ধীরে আপনিতেই বিলুপ্তির পথে চলে যাবে।

ঋণ দেয়া এবং নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামিক অর্থনীতি বা সুন্নাতী অর্থনীতির ব্যবস্থা প্রচলন করতে পারলে সেটাই রিবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং কর্মকৌশল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমরা এমন এক নীতির কথা বলছি যার সূচনা হবে ঋণ আদান প্রদান সম্পর্কে ইসলামিক অর্থনীতি শিক্ষার মাধ্যমে।

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উচিৎ রসুল (স) এর রিবা সংক্রান্ত হাদীসগুলি আত্মস্থ করে বা জেনে বুঝে প্রতিটি পদক্ষেপে তা পালন করা। এই হাদীসগুলি লিফলেট আকারে ছাপিয়ে প্রতি সপ্তাহে বাদ জুমু'আ মুসল্লীদের মাঝে বিতরণ করা একটি যুগোপযোগী উদ্যোগ। তদুপরি মাসজিদে নিয়মিত এবং অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে হবে রিবাভিত্তিক অর্থনীতির কুফলগুলি এবং রিবা ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে নাযিলকৃত আল-কুর'আনের আয়াতগুলি রিবা বা সুদ সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পোষ্টার আকারে ছাপিয়ে মাসজিদে এবং স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগাতে হবে যাতে রিবার ক্ষতিকর দিকগুলির বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

আইশা (রা) বলেছেন, রসুল (স) সলাতে দু'আ করতেন এই বলে যে, 'আয় আল্লাহ্‌, আমি সকল প্রকার গুণাহ্ থেকে এবং ঋণগ্রস্থ হওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি'। এক ব্যক্তি রসুল (স) কে প্রশ্ন করেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্ (স) আপনি কেন এত বেশী বেশী ঋণগ্রস্থ হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করেন'? উত্তরে রসুল (স) বলেন, "ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি মিথ্যাচার করে। সে মানুষকে ওয়াদা দেয় এবং তারপর নিজের দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে"(৪/২২৩২, পৃ: ২৪৯, সহীহ বুখারী)।

মূলত ঋণ একটি মারাত্মক ব্যধি, যে কারণে নবী কারিম (স) বারবার আল্লাহ্‌র নিকট ঋণগ্রস্থ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করেছেন। ঋণ শুধু একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে তা নয়, ঋণ গোটা জাতি তথা সমগ্র রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বর্তমানে সমগ্র ইসলামি সভ্যতা ধ্বংসের দারপ্রান্তে এসে পৌছেছে শুধুমাত্র রিবা ভিত্তিক এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে। এর জন্য অবশ্য দায়ী কথিত ইসলামি স্কলার ও অর্থনীতিবিদরা যারা কিনা 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'উন্নত' পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। ইয়াজুজ-মাজুজের ইউরোপীয় সভ্যতার রাজা-বাদশাহ্ ও

সরকার যারা আজ মুসলিমদের শাসন করছে তারাও দায়ী মুসলিমদের এই দুরবস্থা ডেকে আনার জন্য। বিংশ শতাব্দীর শুর–তে ইসলামি খিলাফাতের ধ্বংসের পরই ইয়াজুজ-মাজুজের ইউরোপীয় সভ্যতা মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করে মুসলিমদেরকে শাসন করতে শুর– করে। আর তখন থেকেই ইসলামি খিলাফাতের স্থান দখল করে নিল ইয়াজুজ-মাজুজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক পৃথক সরকার। আমরা এদেরকে ইয়াজুজ-মা'জুজের সরকার বলছি এ কারণে যে এই সরকারগুলি বিত্তবানদের স্বার্থই শুধু রক্ষা করে চলেছে, আর তা করছে দরিদ্রদের পদদলিত করে তাদের শোষণের বিনিময়ে।

বিশ্বব্যাংক পৃথিবীর ৩২টি দেশকে ঝবাবৎবষু ওহফবনঃবফ ষড়ি রহপড়সব ঈড়ঁহঃৎরবং ঝওখওঈ বা অধিক ঋণগ্রস্থ দরিদ্র শ্রেণীর দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এদের জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় ঋণের অনুপাত ৮০ ভাগেরও বেশী। অন্য কথায় এদের রপ্তানীর তুলনায় ঋণের অনুপাত ২২০ এর অধিক। ঋন ঃ রপ্তানী = ২২০ঃ১। এদের মধ্যে ২৫টি ঝঁন - ঝধযধৎধহ আফ্রিকার দেশ। অর্থাৎ, পৃথিবীর সেসব ভূখন্ড যেখানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের থাবা সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে উলঙ্গভাবে অনুপ্রবেশ করেছে।

এ দেশগুলির সম্মিলিত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৯৪ সালে ২১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। ১৯৮০ সালে তা ছিল এর এক চতুর্তাংশ। ১৯৯৫ সালে এ ২১০ বিলিয়ন ডলারের সুদ হয়ে দাঁড়ায় ১৬ বিলিয়ন ডলার কিন্তু ঐ হতদরিদ্র দেশগুলি রিবাভিত্তিক ঐ সুদের মাত্র অর্ধেক শোধ করতে সক্ষম হয়, অবশিষ্ট যোগ হয় বাকীর খাতায়। এভাবে প্রতি বছর ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে দরিদ্র দেশগুলির। ঋণের বোঝার পরিমাণ এত বিশাল হয়েছে যে এই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আর তাদের কারোরই নেই। ব্যক্তিগত ঋণ হলে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি নিজেকে দেউলিয়া গোষণা করে পুনরায় নতুন জীবন শুর– করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঋণের ক্ষেত্রে তো আর সে সুযোগ নেই। সুতরাং এসব দরিদ্র দেশগুলি ধনী দেশগুলির দাসত্বের শৃংখলে এখন বন্দী। বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলিও ঐ একই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

আসুন দেখা যাক এই ঋণগ্রস্থ অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে?

সহীহ বুখারী এর হাদীসে হযরত সালামাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে: *একবার এক মৃতব্যক্তির লাশ রসুল (স) এর কাছে নিয়ে আসা হ'ল জানাযার জন্য। রসুল (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যক্তির কি কোন ঋণ আছে?' উত্তর দেয়া হল 'না'। তখন রসুল (স) ঐ মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ালেন। এর পর আরেক ব্যক্তির লাশ আনা হল জানাযার জন্য। রসুল (স) একইভাবে জানতে চাইলেন এই ব্যক্তির কোনো ঋণ আছে কি না। উত্তর এল 'হ্যাঁ'। রসুল (সা) তখন বললেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়'। তখন আবু কাতাদাহ্ (রা) ঘোষণা দলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্ (স) আমি তার ঋণ পরিশোধ করে দিচ্ছি'। আবু কাতাদাহ্ যখন সেই ঋণ পরিশোধ করলেন তখন রসুল (স) এই দ্বিতীয় ব্যক্তিরও জানাযায় ইমামতি করলেন।* (বুখারী)

সহীহ বুখারীতে আবু যার (রা) হতে বর্ণিত আছে যে: *তিনি একবার রসুল (স) এর সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তিনি ওহুদ পাহাড় দেখে বললেন, "আমার জন্য এই পাহাড় যদি সোনায় পরিণত হয় এবং সোনা দিয়ে সোনার মুদ্রা বানানো হয়, তাহলেও তিন দিনের মধ্যে সব স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আমার কাছে ১০টি দিনার ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই দিনার থাকবে শুধুমাত্র আমার ঋণ পরিশোধ করার জন্য।*(৪:২২২৪, পৃ:২৪৪)।

উপরোক্ত হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক সুন্নাহ্ মতে সম্পদ মজুদ করা ঘৃণিত কাজ বিধায় এর জন্য ধ্বংস ঘোষিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'আলার পথে (সৎ পথে, সৎ উদ্দেশ্যে) খরচ উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে দরিদ্র জনগণ উপকৃত হয়, সমাজের উন্নয়ন হয়। এই ব্যয় হতে হবে রসুল (স) এর মত সাধারণ, অনাড়ম্বর জীবন ধারায়। মিতব্যয়ীর মত, এই খরচ হবে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে কিন্তু অবশ্যই তা ব্যয় করতে হবে ভোগের উদ্দেশ্যে নয়, বরং উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। বিত্তবান ও সামর্থবানরা যখন উৎপাদনের জন্য অর্থ ব্যয় করেন তখন সে সমাজ ও দেশ থেকে দারিদ্র দুর হয়ে দেশের অবস্থা আরো চাঙ্গা হতে বাধ্য। কাজেই আমাদের মুসলিমদের ব্যয় করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরোপকারের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে মুসলিমের উচিৎ যাকাত সাদাকার হার বাড়িয়ে দিয়ে সমাজ উন্নয়ণ ও দারিদ্র বিমোচনে যথা সম্ভব সহায়তা করা।

আবু হুরাইরা (রা) হতে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রসুল (স) বলেছেন: *কোন ব্যক্তি তার সামর্থ থাকা সত্বেও যদি তার ঋণ পরিশোধ করতে দেরী করে, তাহলে সেটাও একপ্রকার জুলুম ও অত্যাচার।*

এখানে উল্লেখ্য যে হজ্জের মতো আল্লাহ তা'আলার এত গুরুত্বপূর্ণ একটি হুকুমের সাথেও ঋণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে আর তাই হজ্জ পালনের পূর্বে সবরকম ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল শারীদ (রা) হতে বর্নিত: *রসুল (স) বলেছেন সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ করতে দেরী করে তবে, রূঢ় বা কঠোর কথা বলে তাকে অপমান করা বৈধ, এবং তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া আইনসঙ্গত।* (আবু দাউদ, নাসাঈ)

আবু কাতাদাহ (রা) হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত: *এক ব্যক্তি রসুল (স) কে প্রশ্ন করেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্ (স) আমি যদি আল্লাহর পথে ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যাই, ভয়ে পিছপা না হই এবং সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করি তবে কি আল্লাহ্ আমার সব গুণাহ্ মাফ করে দিবেন? রসুল (স) বলেন, 'হ্যাঁ', লোকটি খুশী মনে ফিরতে উদ্যত হলে রসুল (স) তাকে ডেকে বললেন, 'এই মাত্র জিব্রীল (আ) আমাকে বলে গেলেন, বর্ণিত অবস্থায় আপনার সব গুণাহ্ মাফ হবে কেবলমাত্র অনাদায়ী ঋণ ছাড়া।'*

আবদল□াহ্ বিন আমর (রা) হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত: *রসুলুল□াহ (স) বলেছেন, 'একমাত্র অপরিশোধকৃত ঋণ ছাড়া শহীদের সমস্ড়গুণাহ্ মাফ হবে।'*

আবু হুরাইরা (রা) হতে তিরমিযীতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, 'একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার অপরিশোধকৃত ঋণ যতক্ষন পরিশোধ করা না হয়, তার আত্মা সেই ঋণের সাথে আবদ্ধ থাকে'*। (আহমদ)।

আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন কবিরা গুণাহ্ সমূহের পর যে কাজটি সবচেয়ে অপরাধের সবচেয়ে বেশী গুণাহর তা হ'ল অপরিশোধকৃত ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করা এবং সে ঋণ শোধ করার মত অর্থ-সম্পদ না রেখে যাওয়া।* (আহমদ, আবু দাউদ)।

মুহাম্মদ বিন আবদুল□াহ্ বিন যাহশ হতে বর্ণিত: *আমরা একদিন মাসজিদের সামনে উঠানে বসে আছি, রসুল (স) ও আমাদের সাথে বসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর দৃষ্টি নত করে কপালে হাত রেখে বললেন, "সমস্ড়প্রশংসা আল□াহ্ তা'আলার, সমস্ড় প্রশংসা আল□াহ্ তা'আলার- কি ভয়ংকর অবস্থা এসেছে! " সারাদিন এবং সারারাত আমরা কোন কথা বলিনি, পরদিন সকাল পর্যন্ড় ভাল ছাড়া মন্দ কিছু ঘটতেও দেখলাম না । সকালে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসুলুল□াহ্ (স) কি ভয়ংকর অবস্থা এসেছে? তিনি বললেন, এটা ঋণ সংক্রান্ড়। 'যার হাতে আমার জীবন ও মরণ তাঁর শপথ, কোন ব্যক্তি যদি আল□াহর পথে শহীদ হয় এবং পুনরায় জীবিত হয় এবং আল□াহর পথে শহীদ হয় এবং পুনরায় আল□াহর পথে শহীদ হয় অপরিশোধিত ঋণ রেখে। এইরূপ তিনবার তিনি আল□াহর পথে শহীদ হলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার বংশধররা তার সে ঋন পরিশোধ না করে'*। (আহমদ)।

আর ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ড় অবকাশ দেবে। আর যদি তোমরা সাদাকা করে দাও তা তোমাদের জন্য (কত যে) উত্তম যদি তোমরা জানতে। (সূরা বাকারা, ২:২৮০)।

(এসব) 'সাদাকা' তথা যাকাতের অর্থ হচ্ছে ফকীর মিসকীনদের জন্যে, এই (ব্যবস্থার) ওপর (যাদের জীবিকা সে সকল) কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্ড়করণকে (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী করা প্রয়োজন তাদের জন্যে, (কোন ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে আযাদ করার জন্যে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির (ঋণমুক্তির) জন্যে, আল□াহ্ তা'আলার পথে (সংগ্রামী) ও মুসাফিরদের জন্যে (এ সাদকার অর্থ ব্যয় করতে হবে)। এটা আল□াহ তা'আলার নির্ধারিত ফরয। নিঃসন্দেহে আল□াহ তা'আলা (সবকিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী। (৯:৬০)।

লেখকের এখনো মনে পড়ে ১৯৫৭ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা মা কয়েকবার ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঋণভারে দুশ্চিন্ড়ায় তখন তার ঘুম হত না, খাদ্য গ্রহণেও তার আগ্রহ ছিলনা, কেবল চিন্ড় করতেন কবে কিভাবে এই ঋণ পরিশোধ করবেন। তার বাবা-মা দু'জনেই এমন ছিলেন। আগেকার মুসলিম এমনকি অমুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোকেরাও একসময় এমনই ছিল, তবে তখনও ইয়াজুজ-মা'জুজ

এবং ভন্ড কানা-দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেনি। ইয়াজুজ-মা'জুজ এবং দাজ্জালের শয়তানী শক্তি এই সমাজটাকে অতপর ঋণের অশুভ চক্রে কলুষিত করে ফেলে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত লোকগুলি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে গিয়ে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে সুদী ঋণের চাকচিক্যে আটকা পড়ে যায়। তাদের এই অশুভ চক্র বর্তমানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো দেখা যায়, বাড়ী বানানো বা কেনার জন্য ঋণ সুবিধা, আসবাবপত্র কেনা, বিয়ের গয়না এবং ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য ঋণব্যবস্থা এমনকি এখন উৎসব ঋণ বা ঈদ উদযাপনের জন্যও ঋণ সুবিধা বড় বড় করে ফলাও করে ঘরে ঘরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করে নিরীহ ও লোভী লোকদের রিবার প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে। ভাবটা এমন যেন যার সাধ আছে সাধ্য নেই তাদের জন্যই এই ঋণ সুবিধা উৎসর্গ করে সুদখোরেরা (তাদের দৃষ্টিতে) ব্যক্তি ও সমাজের বিরাট কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। আর এই বিজ্ঞাপনে অশিক্ষা-কুশিক্ষা কবলিত লোভী মানুষগুলিও এই সুবিধা গ্রহণে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। রিবাখোরদের ধারণায় রিবা ভিত্তিক ঋণসুবিধা সে সাধ ও সাধ্যের মিলন ঘটিয়েছে যা পূর্বে কখনও সম্ভব ছিল না। কিন্তু এটা যে মানুষকে মহা বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা নিরীহ, স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারছে না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ঋণের অশুভ ও শয়তানী চক্রকে চিনতে বুঝতে আমাদের সহায়তা করতে হবে। সর্বপ্রথম নিজ সন্ড়ান ও আহ্লদের এই অশুভ চক্রকে চেনাতে হবে। তাদেরকে অর্থনৈতিক সুন্নাহ পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ঋণের অশুভ চক্রকে প্রতিহত করার সংগ্রামে শরিক হওয়ার দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে আজীবন।

রিবার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এমনকি ইংরেজ সাহিত্যিক সেক্সপিয়ারও তার লেখায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। উলেখ্য যে, আমেরিকান, ফরাসী এবং বলশেভিক বিপব ইউরোপীয় তথা পশ্চিমা সভ্যতাকে পাল্টে দিয়ে নাস্ড়িক সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই তো সেক্সপিয়ার তার হ্যামলেট নাটকে বলেছেনঃ-

"ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা কোনোটাই হইও না
দিয়া ঋণ, অর্থ ও বন্ধু দুই-ই হারাইও না
ঋণ কর্মঠকে করে কর্ম বিমুখ
এই কথা রাখিবে সদা স্মরণে
চলিবে মানিয়া রাত্রি ও দিবসে
রহিবে সদা সত্য মানব সকলের তরে"

ঋণগ্রস্থকে সহায়তা দান

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের মুসলিম ভাই-বোনদের জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঋণগ্রহণের ক্ষতিকর দিক এবং রিবার ভয়ঙ্কর থাবা ও অশুভ চক্র সম্পর্কে বোঝানোর মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনে কেউ ঋণগ্রস্থ হলে সে সকল ভাই-বোনদের ঋণমুক্ত হতে সহায়তা করতে হবে আর তা করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এমনকি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা দিয়ে।

রসুলুল্লাহ্ (স) তাঁর উম্মাতদের সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন তারা যেন তাদের ঋণ-গ্রস্থ ভাই-বোনদের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করেন অথবা যারা ঋণগ্রস্থ অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে যেন ঐ আনাদায়কৃত ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন।[১]

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হ'তে বর্ণিত: *যখন হযরত আলি বিন আবু তালিব (রা) একজন মৃত মুসলিম ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেন, তখন রসুল (স) এই বলে দু'আ করেন 'তোমার ঐ ভাইকে যেমন তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করলে, আল্লাহ্ যেন তেমন তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে যেন রক্ষা করেন, আমিন! যে সমস্ত মুসলিম তাদের অপর মুসলিম মৃত ভাই বোনদের ঋণ পরিশোধ করে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।'* (শার্‌হ আস্-সুন্নাহ)।

ইমরান বিন হোসেন (রা) হ'তে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, যখন কোন মুসলিম পাওনাদার তার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারীর (সুদমুক্ত) ঋণ পরিশোধের সময় বাড়াতে থাকবে তার আমলনামায় তত সাদাকা জমা হতে থাকবে।* (আহমাদ)।

সুমারাহ্ (রা) হতে বর্ণিত: *একদিন রসুল (স) সমবেত লোকদিগকে প্রশ্ন করেন, 'অমুক গোত্রের কেউ কি উপস্থিত আছেন? কোন সাড়া না পেয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, অথচ সবাই নিরুত্তর। তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির, ইয়া রসুলুল্লাহ্ (স)'। উত্তর পেয়ে রসুল (স) খুশী হয়ে বললেন, 'প্রথম দু'বার আপনি চুপ ছিলেন কেন? আমি আপনাকে একটা ভাল খবর দিতে চাই। আপনার গোত্রের অমুক জান্নাতে ঢুকতে পারছিলেন না দুনিয়ার পাওনাদার রেখে যাওয়ার দরুন। তারপর আপনি তার সেই ঋণ পরিশোধ করার পর এখন আর তার কোন পাওনাদার নেই'*। (আবু দাউদ)।

১ আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত: *তিনি বলেন, রসুল (স) বলেছেন, "জনৈক ব্যবসায়ী, লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্থকে দেখলে তিনি তার কর্মচারীদের বলতেন, তার ঋণ মওকুফ করে দাও, হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।* (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৪৩ পৃ:২২)।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত: *তিনি বলেন কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে রসুল (স) তার জানাজা পড়াতেন না। একবার এক ব্যক্তির লাশ আনা হল জানাজা পড়ার*

উদ্দেশ্যে। রসুল (স) জানতে চাইলেন, এই ব্যক্তির কোন ধার-দেনা রেখে গিয়েছেন কি না? উত্তর দেয়া হল, হ্যাঁ, দুই দিরহাম। এই কথা শুনে রসুল (স) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাই-এর জানাজা পড়। তখন আবু কাতাদাহ আল আনসারী (রা) বললেন, আমি তার দেনা পরিশোধ করে দিচ্ছি। এরপর রসুল (স) ঐ ব্যক্তির জানাজা পড়লেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রসুল (স) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, "হে লোকসকল, তোমরা নিজেরা নিজেদের যত কাছে, আমি তাদের আরো বেশী কাছে। তোমাদের কেউ যদি ঋণ রেখে ইন্তিকাল করে সেই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর সে যদি কোন সম্পত্তি রেখে যায়, সে সম্পত্তি এদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারীদের" । (আবু দাউদ)।

হুযাইফা (রা) হতে বর্নিত: *তিনি বলেন, রসুল (স) বলেছেন, আল্লাহর সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে হাযির করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ থেকে আমাকে দান করেছিলেন। আমি মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছলদের সাথে আমি সহনশীলতা দেখাতাম আর অভাবীদেরকে সময় দিতাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিক যোগ্য (ক্ষমাশীল)। (অতপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বললেন) তোমরা আমার এই বান্দাকে (জাহান্নামের আযাব হতে) ছেড়ে দাও*। (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৮৪৮, ৩৮৫১ পৃ:৪৯৫)।

ঋণ দেয়া-নেয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুসলিম সমাজকে সচেতন করতে গিয়ে এবং শিক্ষা দিতে যেয়ে প্রকৃত অর্থে আমরা নিজেদের ভাই-বোনদেরই রিবার করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হব।[1]

১ আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়াবী বিপদ-আপদের একটিও দূর করবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অসচ্ছল ব্যক্তির সংকট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সংকটসমূহ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তাঁর বান্দার সহায়তায় রত থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইএর সাহায্যে রত থাকে। (৪:১৯৩৬ তিরমিযী)।

আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনায় রসুল (স) বলেছেন, *মুসলিম মুসলিমের ভাই*।(তিরমিযী, ৪:১৯৩৩ পৃ:৩৭৩)।

মুসা আশআবী (রা) এর বর্ণনায় অপর একটি হাদীসে রসুল (স) বলেছেন: '*এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যেমন একটি ইট আরেকটি ইটকে শক্তি যুগিয়ে থাকে*।' (তিরমিযী, ৪:১৯৩৪)।

করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ

আমরা দু'ভাবে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করতে পারি–

১. আর্থিক অনুদান দিয়ে

২. রিবা বা সুদমুক্ত ঋণ বা দাইন (dayn) দিয়ে

রিবা বা সুদমুক্ত ঋণ আবার দু’ প্রকার ঃ

ক) ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল অর্থ ফেরত দিবে এই শর্তে ঋণ দান।

খ) কর্‌যে হাসানা - ঋণ গ্রহীতা যখন সামর্থ হবে তখন ঋণ বা দেনা পরিশোধ করবে এই শর্তে ঋণদান।

দাইন (dayn) সম্পর্কে পবিত্র কুর’আনে ইরশাদ হচ্ছে: *হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখনই দাইন বা অর্থঋণ করবে তখন কর্জাদাতার সাথে একটা লিখিত চুক্তি করে নিবে। কি শর্তে ঋণ নিচ্ছ এবং কোন তারিখের মধ্যে তা শোধ করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে সেই চুক্তিতে। (সে চুক্তির জন্য সাক্ষীও রাখবে) আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই অধিক পছন্দনীয় যাতে করে পরবর্তীতে কোন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।* (২:২৮২)।

কর্‌যে হাসানার কথা কুর’আনুল মাজীদে বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। যথা ২:২৪৫; ৫:১২; ৫৭:১১; ৫৭:১৮; ৬৪:১৭; ৭২:৮০। ভাল কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহকে কর্‌যে হাসানা দেয়ার কথা বলা হয়েছে, একজন মুসলিম বোন বা ভাইকেও কর্‌যে হাসানা দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে কর্‌যে হাসানার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারী যখন সক্ষম হবে তখনই ঋণ পরিশোধ করবে, কর্জ বা ধার শোধ করার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সময় ও শর্ত থাকবে না। বরঞ্চ, ঋণগ্রহীতা যদি এতটাই অক্ষম হয় যে দেনা শোধ করতে অপারগ হয় তাহলে কর্জদাতা সম্পূর্ণ বা আংশিক ‘পাওনা’ মওকুফ করে দিবেন। এতে করে আল্লাহর নিকট হতে ঋণদাতার জন্য অনেক বড় প্রতিদান বা নি’আমাত পাওনা থাকবে।[1] কর্‌যে হাসানা মূলত Charitable Loan। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন: *কে এমন আছে, যে আল্লাহকে্ কর্‌যে হাসানা বা উত্তম ঋণ দিবে? আল্লাহকে দেয়া এই ঋণ বহুগুণে বাড়িয়ে তিনি তাকে পরিশোধ করবেন (অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতিদান তার জন্য অনেক বেশী হবে)। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধনবান করেন, যাকে ইচ্ছা অভাবগ্রস্থ করেন। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।* (২:২৪৫)।

‘দাইন’ শোধ করার জন্যও কর্‌যে হাসানা দেয়া যায়, সেক্ষেত্রে কর্‌যে হাসানা দাতাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা প্রভূত পুরস্কৃত করবেন।

১ আবু হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে হাযির করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ থেকে আমাকে দান করেছিলেন। আমি মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছলদের সাথে আমি সহনশীলতা দেখাতাম আর অভাবীদেরকে সময় দিতাম। আল্লাহ তা’আলা বললেন, এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিক যোগ্য (ক্ষমাশীল)। (অতপর আল্লাহ তা’আলা ফিরিশতাদের বললেন) তোমরা আমার এই বান্দাকে (জাহান্নামের আযাব হতে) ছেড়ে দাও। (৪:৩৮৪৮, ৩৮৫১ সহীহ মুসলিম, ৪:২২২৬ বুখারী)

আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনায় রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন: যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্থকে অবকাশ দেয় বা তার পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিনে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া বাদে অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (৩:১৩০৯ তিরমিযী)।

আর্থিক সাহায্য চাওয়া বা ধার নেয়া

অতিকষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলিম/মু'মিন আরেকজনের কাছে সাহায্য না চাওয়া বা ধার না চাওয়াই উত্তম।

ইব্‌নে আব্বাস (রা) বর্ণিতঃ *রসুল (স) বলেছেন, অভাবের কারণে কেউ যদি ক্ষুধার্থ থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে না জানায় তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিদান হিসেবে সৎ এবং বৈধ উপায়ে পুরো এক বছরের রিয্‌ক দান করবেন।* (বায়হাকী)।

ইমরান বিন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিতঃ *রসুল (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই দরিদ্র, বিশ্বাসী বান্দাকে ভালবাসেন যে ঘরে ক্ষুধার্থ সন্তর্পণ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে না।* (ইব্‌নে মাজাহ্)।

আবু কাবশা আল আনসারী (রা) হতে তিরমিযীতে বর্ণিতঃ *রসুল (স) বলেছেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি আজ তোমাদের যা বলব তা কখনো ভুলে যাবে না তিনটি বিষয় অবশ্যই সত্য যে–*

১) যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে তার সম্পদ কখনোই কমে যায় না।

২) বিপদের সময় যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দেন।

৩) যখন কোনো ব্যক্তি ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দারিদ্রের দ্বার উন্মোচন করে দেন।

মূলত পৃথিবীতে চার প্রকার লোক আছে–

১. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান এবং সম্পদ উভয়ই দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় (সৎ কাজে) ব্যয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করতে ব্যবহার করে। এই হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি।

২. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ দেননি, এবং যে আল্লাহর উপর একান্তভাবে ঈমান আনে এবং আন্তরিকভাবে বলে, আল্লাহ্ আমাকে আর্থিক সঙ্গতি দিলে আমি অমুক ব্যক্তির মত ভাল কাজে, আল্লাহর পথে আমার অর্থ-সম্পদ খরচ করতাম। এই ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির মত এবং সে আল্লাহর কাছে সমান প্রতিদান পাবে।

৩. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞান দেননি এবং সে তার অর্থ-সম্পদ নিজের ভোগ-বিলাসিতার জন্য যথেচ্ছ খরচ করে, আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করতেও সে সম্পদ ব্যবহার করে না, সে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। আখিরাতে তার জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

৪. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানও দেননি, সম্পদও দেননি, কিন্তু সে বলে তার যদি অর্থসম্পদ থাকত তবে সে অমুকের মত (৩য় দলের) নিজের আরাম-আয়েস ও ভোগের জন্য খরচ করত যাতে অন্যরা (তার বিলাসিতা ও চাকচিক্য দেখে) তাকে হিংসা

করে। এরূপ ব্যক্তি ঐ তৃতীয় দলের মত নিকৃষ্টতম মানুষ এবং আখিরাতে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। (তিরমিযী)।

মিতব্যয়িতা এবং অর্থনৈতিক সুন্নাহ্

মুসলিমদের জানতে হবে যে মিতব্যয়ী ও মধ্যপন্থী সাধারণ জীবন-যাপন করাটা হলো অর্থনৈতিক সুন্নাহর মূল শিক্ষা। সাধারণ, মধ্যপন্থী, মিতব্যয়ী জীবনযাত্রা মানুষকে ধার-দেনা এবং রিবা থেকে দূরে রাখতে যেমন পুরোপুরি সক্ষম, তেমনি মিতব্যায়ী হলে তার হালাল রিযীর থেকেই কিছুটা সঞ্চয় করতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন। সুতরাং রিবা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম পন্থা হল অর্থনৈতিক সুন্নাহ্ অনুযায়ী সাধারণ, মধ্যপন্থী, মিতব্যয়ী জীবনযাপন করা। যারা অপচয় বা বেশী বেশী খরচ করে, বিলাসী জীবন যাপন করে, জোড়ায় জোড়ায় দাস-দাসী রাখে, দেশী-বিদেশী ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে, শুধুমাত্র রসনার তৃপ্তি মেটানোর জন্য ভুরিভোজন করে আর অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরের মেদ বাড়িয়েই চলে, তাদের পক্ষে সুন্নাতী জীবন যাপন করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। কেননা সুন্নাতী জীবন যাপনে প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সবর ও স্বার্থের কুরবাণী বা ত্যাগ তিতিক্ষার আর তাই আল-কুর'আনে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে:

....আমি তোমাদের জন্য যা হালাল করেছি তা থেকে খাও এবং জীবন রক্ষা কর; কোনোভাবেই সীমালংঘন করো না, যারা সীমালংঘন করে তাদের উপর আমার গজব পড়বে আর যাদের উপর আমার গজব পড়বে তারা অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। (সূরা, তা-হা, ২০:৮১)।

...এবং তোমরা খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় করে সীমা লংঘন করো না বা অসভ্যতা করো না। সীমালংঘনকারী এবং অপচয়কারীদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (আল আরাফ ৭:৩১)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: *রসুল (স) আমাকে ৯টি কাজের নির্দেশনা দিয়েছিলেন-*

১. আল্লাহকে ভয় করবে; গোপনে এবং প্রকাশ্যে

২. সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থাতেই ন্যায্য কথা বলবে

৩. প্রাচুর্যের মধ্যে থাক আর দারিদ্রের মধ্যে থাক, সর্বাবস্থায় মিতব্যয়ী হবে

৪. যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে, তার সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করবে

৫. যে তোমাকে দিতে চায় না, তাকেও তুমি দিবে।

৬. যে তোমার প্রতি যুলুম ও অন্যায় করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিবে

৭. *নীরব থাকাকালে তুমি আল□াহর যিক্‌র করবে (আল□াহকে স্মরণ করবে) এবং কথা বলার সময়ও আল□াহর যিক্‌র করবে। (হক ও সত্যি কথা বলাও এক ধরনের যিক্‌র)*

৮. *তোমার দৃষ্টি হতে হবে সতর্কতামূলক*

৯. *যা কিছু ভাল এবং প্রশংসনীয় এবং আল□াহর কাছে পছন্দনীয় তাই করবে।* (রাযিন)

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, একজন যাত্রী যতটুকু সম্বল নিয়ে ভ্রমণ করে পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের এর বেশী সম্বল রাখা উচিৎ নয়। (কেননা প্রয়োজনের বেশী মাল-সম্পদ বহন করা এবং ব্যবস্থাপনা করা বড়ই ঝামেলা এবং কষ্টকর ব্যাপার।)

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল□াহর রসুল (স) পৃথিবীতে থাকাকালে কত ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন? হযরত আইশা (রা) হতে বর্ণিত: *রসুলুল□াহ (স) এর ওফাত পর্যন্ড় সংসারে কখনো একসাথে দুই দিনের খাবার ব্যবস্থা থাকতো না।* (বুখারী, ৯:৪৯০৯)।

সৈয়দ আল-মাক্কবুরী হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর কথা বলতে গিয়ে বলেন: *যে তিনি (আবু হুরাইরা (রা)) কেউ দুম্বা খাওয়ার দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না, এই বলে যে রসুল (স) কখনো একবেলা পেট ভরে যবের র"টিও খাননি।* (বুখারী)।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত: *একবার তিনি রসুল (স) কে মাটিতে পাটি বিছিয়ে শোয়া অবস্থায় দেখেন যে পাটির উপর কোনো চাদরও বিছানো ছিল না। পাটির দাগ রসুল (স) পিঠে দেখে তিনি বললেন, ইয়া রসুলুল□াহ (স) আপনি আল□াহকে বলুন যেন তিনি আপনাকে এবং আপনার উম্মাতদের ধনবান করেন। তিনি তো বাইযানটীন এবং পারস্যবাসীদের ধনবান করেছেন যদিও তারা আল□াহর এবাদত করে না। রসুল (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এই তোমার চিন্ড়ধারা? তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে আমরা আখিরাতের অনন্ড় জীবনে ভোগ করব, আর ওরা তো ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে ভোগ করছে?* (বুখারী, মুসলিম)।

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত: *ইব্‌ন ইয়েমেন পাঠানোর সময় রসুল (স) তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, বিলাসী জীবন-যাপন থেকে সাবধান থাকবে। আল□াহ তা'আলার প্রিয় বান্দারা বিলাসিতা করে না।* (আহমদ)।

আলী (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল□াহর কাছ থেকে অল্প পেয়েই সন্তুষ্ট আল□াহও তার কাছে থেকে অল্প (সে অল্প আমল বা এবাদত করলেই) পেয়েই সন্তুষ্ট হবেন।* (বায়হাকী)।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুন্নাহ্

অনেক মুসলিম প্রশ্ন করেন, আমরা যদি ব্যাংকে আমাদের সঞ্চয় না রাখি, মেয়াদী হিসাবে না রাখি, তবে সঞ্চিত অর্থ রাখবো কোথায় এবং কিভাবে? এই সঞ্চয় কাজে লাগাবো কি করে? উত্তর হল, সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করতে হবে, আল্লাহ্র পথে এবং সৎ কাজে। ব্যয় করতে হবে মানুষের কল্যাণে। টাকা জমিয়ে রাখা যাবেনা আবার বিলাসিতা করে অপব্যয় করা যাবে না বরং মানুষের উপকারের জন্য এবং আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্ তা’ আলার আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করতে হবে, ইসলামি নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূরীকরণে ব্যয় করতে হবে। যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে প্রকৃত পক্ষে কেবল ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ রক্ষা করতে তারা ব্যস্ত, তাদের প্রতিহত করতে ব্যয় করতে হবে, দারিদ্র-বিমোচনে ব্যয় করতে হবে। যখন ইনসাফের ভিত্তিতে ব্যয় হয়ে দাঁড়ায় বিলাসিতা আর অপচয়, তখন ব্যক্তি এবং সমাজ হয় কলুষিত। পক্ষান্তরে, যখন অর্থ বিনিয়োগ করা হয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র-বিমোচনের উদ্দেশ্যে তখন সমগ্র সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি লাভবান হয়, দারিদ্র দূর হয়। আর যখন ব্যয় হয় জৌলুস ও অহমিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং যখন ব্যয় পরিণত হয় নিতান্ত অপচয় এবং বিলাসিতার পেছনে তখন ব্যক্তি ও সমাজ হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কুর’আনুল কারীমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: *আর যখন তারা খরচ করে তখন তারা অপব্যয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না এবং তাদের ব্যয় এই দুই-এর (অপচয় এবং কার্পণ্য) মাঝামাঝি পথে হয়ে থাকে।* (আল-ফরকান ২৫:৬৭)।

সহীহ বুখারীতে আবু যার (রা) হতে বর্ণিত: *একদিন রসুল (স) উহুদ পর্বত দেখে বললেন, এই পর্বতটি যদি সোনায় রূপান্তরিত করে আমাকে দেয়া হয়, তাহলেও তিনদিনের মধ্যে আমি সব খরচ করে কেবল এতটুকু পরিমাণ রেখে দেবো। যা রাখবো শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের জন্য।* (৪:২২২৪)।

অর্থনৈতিক সুন্নাহ্ গঠনে পূর্বোক্ত হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে অর্থ জমিয়ে রাখা ইসলামের আদর্শ নয় বরং ইসলাম নির্দেশ দেয় আল্লাহ্ তা‘আলার দেয়া রিয্ক (সম্পদ) ইনসাফের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশিত পথে দ্রুত খরচ করে ফেলার। যেভাবে রসুলুল্লাহ্ (স) উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ মাত্র তিনদিনে খরচ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। যখন অর্থ-সম্পদ ইনসাফের ভিত্তিতে বন্টন ও খরচ করা হয় তখন সে সম্পদ অর্থ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে এবং অর্থ ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলে।

আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পদ মজুদ করাকে কঠোর ভাষায় ঘৃণা করে সূরা তাওবার ৩৪-৩৫ আয়াতে বলেছেন:

হে ঈমানদার লোকেরা, (আহলে কেতাবদের) বহু পন্ডিত ও ফকির-দরবেশ এমন আছে, যারা অন্যায় ভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ ভোগ করে, এরা (আল্লাহর বান্দাহদের)

আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (এদের মাঝে) যারাই সোনা-রূপা জমিয়ে রাখে আর তা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবা, ৯:৩৪)।

(এমন দিন আসবে) যেদিন (পুঞ্জীভূত) সোনা-রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দিয়ে (যারা এগুলিকে জমা করে রেখেছিলো) তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বে ও তাদের পিঠে চিহ্ন (এঁকে) দেয়া হবে এবং (তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে), এই হচ্ছে তোমাদের সে সকল সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, অতএব যা কিছু সেদিন তোমরা জমা করেছিলে (আজ) তার স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা তাওবা, ৯:৩৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে কৃপণতাকে ঘৃণা করেছেন। যারা কার্পণ্য করে তাদের জন্যও রয়েছে কঠিন শাস্তি:

তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার বানিয়ো না। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো, (আরো) যারা (তোমাদের) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী (তোমার) পথচারী সংগী ও তোমার অধিকারভুক্ত (দাস-দাসী– এদের সবার সাথেও ভালো ব্যবহার করো) অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক। (সূরা নিসা, ৪:৩৬)।

(আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদেরও ভালবাসেন না) যারা নিজেরা (যেমন) কার্পণ্য করে, (তেমনি) অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ করে, (তাছাড়া) আল্লাহ তা'আলা তাদের যা কিছু (ধন-সম্পদের) অনুগ্রহ দান করেছেন তারা তা লুকিয়ে রাখে। আমরা কাফিরদের জন্য এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (সূরা নিসা, ৪:৩৭)।

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরও পছন্দ করেন না) যারা (লোক) দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ও শেষ বিচারের দিনকেও বিশ্বাস করে না, (আর) শয়তান যদি কোন ব্যক্তির সাথী হয়, তাহলে (বুঝতে হবে যে) সে বড়ো খারাপ সাথী (পেলো)। (সূরা নিসা, ৪:৩৮)।

কৃপণতাকে নিরুৎসাহিত করে রসুল (স) নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্য পরিমিত ব্যয় করতে বলেছেন, কেননা মহান আল্লাহ্ প্রাচুর্যের সুফল তার বান্দাদের মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিযী)।

তবে নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য অতিরিক্ত খরচ করা, অপচয় বা সম্পদের অপব্যবহার করা ইসলামে কোন অবস্থায়েই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা সূরা বনী ইসরাইলে নির্দেশ দিয়েছেন:

তোমরা আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক আদায় করে দিবে এবং মিসকীন ও মুসাফীরকেও এবং কোনপ্রকার অপব্যয় - অপচয় করবে না। অবশ্যই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই আর শয়তান হলো তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:২৬-২৭)।

হালাল খাদ্যগ্রহণের এবং হালাল উপার্জনের ব্যাপারে এবং হারামকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে কুর'আনুল কারীমে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে এবং হাদীসেও এ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। অতএব, মুসলিমদের সদা সচেতন এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে তাদের আয় এবং সম্পদ হালাল এবং সৎপথে উপার্জিত হয়। অন্যথায়, শয়তানকেই অনুসরণ করা হবে। হারাম উপায়ে আয় রোজগার করা শয়তানকে অনুসরণ করারই নামান্ড়র এবং এ পথ মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এ পথে আছে শুধু জাহান্নামের আযাব আর কিছু নয়। *জাবির (রা) হতে বর্ণিত: রসুল (স) বলেছেন, হারাম খেয়ে বেড়ে ওঠা দেহের একমাত্র স্থান জাহান্নাম এবং যে দেহ হারাম দ্বারা গঠিত ও প্রতিপালিত, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।*

আবু বাক্‌র (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, যে হারাম খাদ্য খেয়েছে অথবা হারাম উপায়ে অর্জিত রুজি খেয়েছে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।* (বাইহাকী)।

আবু তামিমা (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, মানুষকে কলুষিত করে সর্বপ্রথম তার উদর; তাই মানুষের উচিৎ শুধুমাত্র হালাল (উপায়ে অর্জিত) খাদ্য খাওয়া।*

ইব্‌নে উমর (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, কেউ যদি ১০ দিরহাম দিয়ে ১টি পোষাক কেনে যার মধ্যে ৯ দিরহাম হালাল রুজি এবং ১ দিরহাম হারাম রুজির তাহলে সে যতক্ষণ ঐ পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকবে তার কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। এই বলে তিনি তার দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে যদি এই বর্ণনা আমি রসুল (স) হতে না শুনে থাকি* (বায়হাকী)।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত: *রসুল (স) বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ তার রুজি রোজগার হালাল না হারাম সে ব্যাপারে মোটেই চিন্ড্র-ভাবনা করবে না, অর্থাৎ, হারাম রুজি সম্পর্কে তার কোন বিবেক কাজ করবে না।*[1] (সহীহ বুখারী, ৪:১৯৪৮, পৃ: ২৬)।

১ নাউযুবিল্লাহ, এখন আমরা সেই সময় অতিবাহিত করছি যে সময়কার মানুষ রুজি রোজগারের বিষয়ে হালাল-হারামের পরোয়া করে না।

খাদ্য উৎপাদন

পুঁজিবাদী অর্থনীতির কর্পোরেট বিশ্ব আজ শুধু তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ এবং প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে লাভের কথাই চিন্ড়া করে। তাই সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ তাদের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। কৃত্রিম শিশুখাদ্য ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক কোম্পানী, মোবাইল সার্ভিস অপারেটর এবং তাদের দেশীয় এজেন্ট এবং তামাক ব্যবসায়ী বা সিগারেট কোম্পানীগুলির আগ্রাসী বাণিজ্য-নীতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ সরকারের প্রতি অন্ধ সমর্থন করেছিল।

তাই এর নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে সারাবিশ্বব্যাপী যখন প্রতিবাদের ঝড় বইছিল তখনো বর্ণবাদী শেতাঙ্গ সরকারের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলির অন্ধ সমর্থন পুঁজিবাদ অর্থনীতির অপর একটি দৃষ্টান্ড়। ইসরাইলের প্রতিও যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন এ ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই অংশ।

রাসায়নিক সার, কীটনাশক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে মুনাফা বাড়ানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এখনকার কর্পোরেট বিশ্ব কখনোই প্রশ্ন তোলে না। মূলত গরুর মবহব/পযৎড়সড়ংড়সব পরিবর্তন ঘটিয়ে বেশী পরিমাণে হরমোন প্রয়োগ করে উৎপাদিত দুধেরও গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারটি তাদের নৈতিকতা ও বুদ্ধি বিবেকের বাইরে অবস্থান করছে। যার ফলে এ সকল দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য উপকারের চেয়ে অধিক ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে চলেছে। আমরা অনেকেই জানি প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত অধিকাংশ খাদ্য ক্যান্সারসহ বিভিন্ন প্রকার দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করে। কিন্তু পরিবর্তিত জীন (gene) হতে উৎপন্ন খাদ্য সেসব গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। তাই ঝপরবহপব ঞ্চরসবং এর ১৭মে ১৯৯৪ সালের সংখ্যায় ক্যান্সার প্রতিরোধ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ কারলাইন মিলার লিখেছেন-"মানবদেহে জেনেটিক বিন্যাসের উপর নির্ভর করে কার ক্যান্সার হবে, আর কার হবে না। উঘঅ তে সংঘটিত পরিবর্তন চিহ্নিত করে সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাপকতাও চিহ্নিত করা যায়। কিছু কিছু খাদ্যাস্থিত উপাদান এ ক্ষতির ব্যাপকতা সীমিত করতেও সক্ষম"।

কারলাইন মিলারের চিঠি আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উপায়ে (natural organic procedure) উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণই আমাদের জন্য একান্ড় বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য, মানবদেহকে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে । ফলে রোগ বালাই সারাতে যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় হয় তা থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি রেহাই পায়। প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্য উৎপাদনে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে না। তাই প্রাকৃতিক খাদ্য স্বাস্থ্যকর এবং প্রকৃতি বান্ধব (environment friendly) । প্রাকৃতিক খাদ্যের মান খুবই উন্নত ফলে এর মূল্যও থাকে বেশী। তাই অধিকাংশ সরল ও অসচেতন মানুষ প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য বাদ দিয়ে পরিবর্তিত জিন (gene) থেকে উৎপন্ন কমদামী খাবারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলেছে। অন্যদিকে কর্পোরেট বিশ্ব নানারকম রাসায়নিক সার, কীটনাশক, জেনেটিক পরিবর্তন ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে। মাঝখান থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নিরীহ, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, নির্বোধ মানুষগুলি যাদের অধিকাংশই মুসলিম। তবে বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা এই অবস্থাকে নিজেদের আয়ত্বে আনার জন্য একটা ভাল সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তারা তখন অধিক হারে প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হতে পারে। উৎপাদন বেশী হলে উৎপাদনের খরচও ধীরে ধীরে কমে যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি কৃত্রিম, জেনেটিক্যালী পরিবর্তিত ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের ক্ষতিকর বিষয়ে

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য ও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প বিশ্বমুসলিমদের জন্য একটা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে। সাধারণ মানুষ যখন সচেতন হবে কর্পোরেট সংস্থাগুলির উৎপাদিত খাদ্য সস্ড়া হলেও তখন আর কেউ তা কিনবে না কেননা এসব খাদ্য অনেক রোগের কারণ হয়ে দেশ ও জাতির ব্যয়ের পরিধি বাড়ায় এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। যখন মানুষ কৃত্রিম খাদ্যের এই সকল ক্ষতিকর বিষয় বুঝতে পারবে তখন বেশী মূল্য দিয়ে হলেও প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাদ্য ব্যবহারে তারা উৎসাহী হবে। আর বাজারে যখন প্রাকৃতিক খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাবে কর্পোরেট বিশ্ব তখন তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের জন্য এখনই উপযুক্ত সময় সকল ক্ষতিকর খাদ্য সামগ্রী তাড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা। প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনে সক্ষম হলে তখন খাদ্য হবে-

১) পুষ্টি ও শক্তির উৎস।

২) বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময়কারী উপাদান।

৩) ক্যান্সার ও অন্যান্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের প্রতিরোধক।

৪) পরিবেশ বান্ধব।

ফিৎনার যুগে দুগ্ধখামার এবং খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র গঠন ও কৃষি কাজের গুরুত্ব

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, “অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল। ফিত্না থেকে দ্বীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলি নিয়ে পাহাড়ের চুড়ায় এবং প্রবল বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নিবেন। (সহীহ বুখারী, ১০:৬৪৯৬ পৃ:৩৫০)।

আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণনায় রাসুল (স) বলেছেন, অচিরেই অনেক ফিত্না দেখা দিবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তির চাইতে উত্তম, দাঁড়ান ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি ফেৎনার দিকে তাকাবে ফিত্না তাকে পেয়ে বসবে। কেউ যদি কোন আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন সেখানেই আত্মরক্ষা করে। (সহীহ বুখারী, ১০:৬৪৮৮, পৃ:৩৪৫, ও মুসলিম ৭:৬৯৮৩, পৃ:৩৬৩)।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে মুসলিম জাতি যখন দুগ্ধখামার এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত হবে তখন তা যে শুধু তাদের হালাল আয় বাড়িয়ে দেবে তা-ই নয়, তাদেরকে রাসায়নিক সার ও হরমোন ব্যবহার করে উৎপন্ন ক্ষতিকর দূষিত খাদ্য গ্রহণ থেকেও রক্ষা করবে। সেই সাথে যাদের সম্পদ গবাদি পশু এবং কৃষি ভূমি আকারে সংরক্ষিত থাকবে তারা কাগুজে মুদ্রার প্রতিনিয়ত মূল্যস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির যুগে মুসলিমরা তাদের কৃষিজমি, গৃহপালিত পশু বিক্রি করে না দিলে তাদের সম্পদ অবমূল্যায়ন থেকে রক্ষা পাবে। আর যে শ্রমিককে কাগুজে মুদ্রায় তাদের শ্রমের মূল্য পরিশোধ করা হয় তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্থ। আরো ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা তাদের গৃহপালিত পশু অথবা কৃষিজমি কাগুজে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হবে। তারা দিনে দিনে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রতর হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ে দাদন খাটতে বাধ্য হয়ে পড়বে। সে সুযোগে লোভী লুন্ঠনকারী ব্যবসায়ীরা অসহায় জনগণের শ্রমে মুনাফা লুটতে থাকবে।

গৃহপালিত পশু এবং জমির মালিকেরা যদি তাদের পশু ও জমিগুলি বিক্রি করে না দেন, তাহলে রাক্ষুসে ধনী ব্যক্তিরা তাদের আগ্রাসী কার্যক্রম চালাতে কিংবা জালিয়াতি ও ঠকবাজির মাধ্যমে শোষণ করতে পারবে না। উপরন্তু পরম কর‍ুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও রহমাত বর্ষিত হলে জমিতে ভাল ফসল উৎপাদন এবং গৃহপালিত পশুর বংশবৃদ্ধি করে দুধ, ডিম, ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করে তাদের সম্পদ বাড়াতে পারবে।

বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতি রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে দূষিত, অর্থনৈতিকভাবে কলুষিত বিশ্বে ব্যাংকে কাগুজে মুদ্রার হিসেবে সম্পত্তি সংরক্ষণের চেয়ে জমি-জমা বা গৃহপালিত পশুতে বিনিয়োগ করাই অধিক লাভজনক। বহুবিধ ত্যাগের মাধ্যমে নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ প্রতারণা ও কৌশলে যখন লুণ্ঠিত হয়, তখন সেও উঠে পড়ে লেগে যায় অন্যের সম্পদ লুন্ঠন করে তার নিজের লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে আনতে। এভাবে একে একে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ তথা সারা বিশ্ব এরূপ লুন্ঠন প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সেকারণে নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে তারা তাদের ঈমান, বিবেক ও মনুষত্বকে নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় দরিদ্র নিপীড়িত জনগণ।

যে মুসলিমরা এই বই (ইংরেজীতে মূল বই) পড়েছেন বা পড়ছেন তাদের উচিৎ কাগুজে মুদ্রার সংরক্ষিত সঞ্চয়সমূহ জমি বা গৃহপালিত পশু ইত্যাদি ক্রয় করে সম্পদ বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের সঞ্চয় সংরক্ষণ করা যাতে করে, মুসলিমের সম্পদ, পুঁজিবাদী লুন্ঠনকারী ইহুদি-নাসারাদের কাছে চলে না যেতে পারে।

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য আমাদের একটা প্রস্তাবনা রয়েছে। ইসলামি ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কোম্পানীর কৌশল পর্যালোচনা করে তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমাদের এই বিশ্বের সচেতন মুসলিমদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে। মাসিক চাঁদা বা এককালীন চাঁদা (Contribution) দিয়ে মুসলিমদের অংশীদারী বিনিয়োগ ও ব্যবসা শুরু করতে হবে। মু'মিনদের মধ্যে এরূপ সব শরিকানা ব্যবসা সমূহ প্রতিষ্ঠায়, আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি এতটাই বিদ্যমান থাকে যে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যবসায় অংশ নেন এবং আল্লাহর রহমতে এরূপ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে, যতদিন পর্যন্ত মু'মিন ও সৎ অংশীদারগণ কেউ কাউকে ক্ষতি করা বা ঠকানোর চেষ্টা না করে। আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আল্লাহর রহমতে এই সকল ব্যবসায় সাময়িক লাভ লোকসান থাকলেও এর কোন ধ্বংস নেই।[১]

সুদ বা রিবা ভিত্তিক ব্যবসার পরিবর্তে ইসলামি ব্যবসা ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সফল করতে হলে এরূপ বিনিয়োগে ব্যাপকহারে মুসলিমদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে হবে। রিবা মুক্ত বিনিয়োগকারী সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা চলে এসেছে বহুদিন ধরে কিন্তু এগুলি সফল হয়নি পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটির কারণে। তাছাড়া যেহেতু জাহলিয়তের পুনঃ প্রবেশের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা রিবার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়নি। তাদেরকে রিবা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জোড়ালো আহ্বান জানানো হয়নি। যথাযথ ব্যাখ্যা ও যুক্তি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি; তাদের বোঝানো হয়নি যে ইসলামে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং রিবা বা সুদী লেনদেনকে হারাম ঘোষণা করেছেন কঠোর ভাষায় (২:২৭৫)। রিবা-মুক্ত বিনিয়োগকারীরা সফল হতে পারেনি এবং উদ্যোক্তরা জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ব্যবসা যদি সৎ ভাবে আল্লাহর

১ আবু হুরাইরা (রা) কে বলতে শুনেছেন, *রসুল (স) বলেছেন যে অংশীদারী ব্যবসায় সততা ও ন্যায়ের পক্ষ থাকে সে ব্যবসায় আমি আমার আল্লাহ্ তা'আলার দু'জন অংশীদারের সাথে তৃতীয় পক্ষের একজন অংশীদার। যে মুহুর্তে ঐ ব্যবসাতে ঠকবাজী, ধোঁকাবাজী, প্রবেশ করে সে মুহুর্তে আমার অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করে নেই এবং শয়তান সেখানে প্রবেশ করে।* (আবু দাউদ; রাযিন শয়তানের প্রবেশ কথাটুকু সংযোজন করেছেন-হাদীসে কুদসী।) সুতরাং পারস্পরিক সততা ও বিশ্বস্ততা তথা ঈমানী চেতনা হলো অংশীদারী ব্যবসার অন্যতম মূলধন। মুসলিমদের মাঝে অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ মাধ্যম হতে হবে দিনার বা স্বর্ণমুদ্রায়। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সোনা সৃষ্টি অন্যান্য কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সোনার ব্যবহার।

নির্দেশিত উপায়ে করা হয়, তাহলে তা পুঁজিবাদী বা ক্যাপিটালিজমের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য লাভজনক এবং আত্মতৃপ্তিদায়ক। কেননা সৎ ব্যবসায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার অংশিদারিত্ব থাকে পক্ষান্তরে অসৎ ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে শয়তান। এ ধরনের কিছু কিছু কোম্পানী অনেকটা কথিত 'ইসলামি ব্যাংকিং' নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকিং এর মূলনীতি না বুঝেই কিছু কিছু মুসলিম সরকার নির্বোধের মত রিবা-মুক্ত ব্যাংকিং অনুমোদন দিয়েছে। অথচ বর্তমানে যে সকল 'ইসলামি

ব্যাংকিং’ চালু রয়েছে তা সত্যিকার অর্থে রিবা-মুক্ত নয়। (যদিও কেউ কেউ প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রিবামুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায়।)

আমাদের মূল লক্ষ্য হল রিবা মুক্ত সমাজ গঠন করে ব্যাপক হারে মুসলিম উম্মাহকে সম্পৃক্ত করা। সকল মুসলিমরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে রিবা নির্মূলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং তাদের সঞ্চিত অর্থ রিবা-মুক্ত ব্যবস্থায় বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে তখনই কেবল বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলিমদের বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হবে এবং লুণ্ঠনকারীরা নিজ থেকেই কেটে পড়বে। আর তখনই ব্যবসা গঠিত হবে সত্যিকার রিবামুক্ত পরিবেশে এবং গড়ে উঠবে স্বচ্ছ ও সুবিচারমূলক মুক্ত বাজার।

বর্তমান বিশ্বে ভন্ড দাজ্জাল শক্তির বির“দ্ধে সবচেয়ে শক্তিধর মারণাস্ত্র হল অর্থনৈতিক সুন্নাহ্ । অর্থনৈতিক সুন্নাহ্ কার্যকর হলে নিপীড়িত মুসলিম উম্মাহর হৃদয়মূলে পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম ভাই-বোনদের ইসলামি ব্যবসা ও বিনিয়োগ কোম্পানীতে (Islamic Business and Investment Companies - IBIC) ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে আমাদের যে সকল পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক তা হলো-

১) সুপরিকল্পিতভাবে গণশিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিমদের বিস্ড় ারিতভাবে বোঝাতে হবে রিবা কি, রিবার বিভিন্ন রূপগুলি কি কি?

২) ইসলামে কত কঠোরভাবে রিবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যারা রিবার সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত তাদের জন্য কি ধরনের কঠিন শাস্ড়ি অপেক্ষা করছে, এবং সে শাস্ড়ি কিয়ামাত ও হাশরের পূর্বে কবরেই শুর“ হয়ে যাবে। এমনকি কিছু কিছু শাস্ড়ি বা আযাব দুনিয়াতেও ভোগ করানো অসম্ভব কিছু নয়। এ বিষয়ে মুসলিমগণ সচেতন হয়ে রিবা ভিত্তিক লেনদেন ত্যাগ না করলে আল্লাহ্ তা‘আলা এবং তাঁর রসুল (স) তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য হবেন (২:২৭৯)।

৩) মুসলিমদের (এমনকি কৌতুহলী অমুসলিমদেরও) বোঝাতে হবে ইসলামে কেন রিবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪) রিবা চুড়ান্ড়ভাবে নিষিদ্ধ করার আগে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসুল (স) এর মাধ্যমে কিভাবে ধাপে ধাপে জনগণকে সচেতন করেছিলেন। সে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৫) বর্তমান দুনিয়াজুড়ে ব্যাপকহারে রিবার যে প্রচলন ঘটেছে মনে রাখতে হবে এটা শেষ যামানারই আগামনী বার্তা।

ইসলামি ব্যবসা ও বিনিয়োগ কোম্পানী (Islamic Business and Investment Companies - IBIC) প্রতিষ্ঠা করার পর যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

অতপর ব্যবসা শুরু করতে হবে এমন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যেন ব্যবসার লাভ ও লোকসান তারা তাদের বিনিয়োগের অনুপাতে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে। মনে রাখতে হবে এই ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন হল ঈমান, পরস্পরের প্রতি অটুট বিশ্বাস, আস্থা এবং সততা। তাছাড়া এই ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস বা অসততা প্রবেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করে নিবেন ফলে অবিশ্বাস এবং অসততা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে এবং রিবাযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বিষয়টির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা আ'মাল করতে হবে।

IBIC মুসলিম ব্যবসায়ীদের রিবা-মুক্ত ঋণও দিতে পারে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য। এই ঋণে কোন প্রকার সুদ থাকবে না, ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা সমানভাবে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি করে নিবে। ফলে মুসলিম ব্যবসায়ীদের আর রিবা-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না। ফলে সুদ হিসেবে যে অর্থ ব্যাংককে ফেরত দিতে হত সে অর্থ IBIC এর পরিধি বাড়ানোর কাজে, সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ এবং দারিদ্র বিমোচনে ব্যবহার করতে পারবে। এই ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা মানুষ যত বেশী প্রত্যক্ষ করবে ততই তারা আরো ব্যাপক হারে IBIC এবং রিবা মুক্ত ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হবে এবং এক সময় রিবা ভিত্তিক ব্যাংকিং আপনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে করে মুসলিম ব্যবসায়ীরা রিবা এবং ঋণভারে আর জর্জরিত হবে না। তাছাড়া ঋণ খেলাপী (Loan defaulter) হয়ে ব্যবসায়ীরা সমাজের রক্তচোষা শ্রেণীতে পরিণত হওয়ারও অবকাশ পাবেনা।

IBIC এর মাধ্যমে মুসলিমরা বেশ বড় রকমের মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ পাবে যা এককভাবে কোন মুসলিম ভাই-বোনের পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। ইনশাআল্লাহ্ সঞ্চিত এই পুঁজি একসময় বিরাট আকার ধারন করবে। এই বড় রকমের মূলধন এদেশে এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামি আইন বিধান মত ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। ইসলামি ব্যবসায় উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা হরমোন ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক উপায়ে গরুর খামার, মুরগীর খামার, ধান-গম-আলু-সব্জী ও ফলের চাষ করে দেশের হালাল এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারবে। যার ফলে মানুষ আধুনিক যুগের বিকৃত উপহার–কৃত্রিম প্রজনন, হরমোন ব্যবহার বা গবেষণাগারে ঘটানো অঙ্কুরোদ্গম পদ্ধতি থেকে উৎপন্ন খাবার খাওয়ার ফলে নিত্য নতুন রোগ বালাই হওয়ার ঝুঁকি থেকে আল্লাহ্ তা'আলা দূরে রাখবেন। উপরন্তু মানুষ ফিরে পাবে বৈধ ও হালাল, স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের অপূর্ব সুযোগ।

সাধারণ মুসলিম জনগণ ওইওঙ্গ তে তাদের সঞ্চয় মুদারাবা হিসেবে সীমিত অংশীদারিত্বে জমা রেখে হালাল আয়ের সুযোগ পাবেন। তখন আর আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির সঞ্চয়ী

হিসাব বা মেয়াদী হিসাবে কোন অজুহাতেই অর্থ জমা রাখার প্রয়োজন পড়বে না। স্টক এক্সচেঞ্জের অনিশ্চিত পুঁজিবাদী পদ্ধতিতেও মুসলিমদের যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

মুদারাবা বা মুশারাকা ভিত্তিক ইসলামি প্রকাশনী কোম্পানী-স্থাপনের প্রস্তাবনা

মুসলিম ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের প্রস্তাব হলো তারা যেন ইসলামি প্রকাশনা হাউজ স্থাপন করেন। আর এর মাধ্যমে রিবা সহ বিভিন্ন ইসলামি বিষয়ে বই, পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি নিয়মিত ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ইসলামি প্রকাশনা কেন্দ্র থেকে ছাপানো বই সমূহ নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলি মিটাবে বলে আশা করা যায়।

১) নাস্তিক ও ইহুদি সম্প্রদায় কর্তৃক ইসলাম এবং মুসলিমদের উপর পরিচালিত আক্রমন ও নেতিবাচক প্রচারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

২) 'আধুনিক' কথিত ইসলামি স্কলারদের দ্বারা আধুনিকায়নে অপব্যাখ্যার প্রত্যুত্তরে ইসলামি শিক্ষার যথাযথ ব্যাখ্যা-বিবরণ দিয়ে সাধারণ মুসলিমকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাতে হবে। মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (রহ) এর 'The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society' এ ধরনের একটি গ্রন্থ।

৩) এ ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষিত সমাজের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা যাবে, যার ফলে তারা জানতে এবং বুঝতে পারবে আসলে বর্তমান বিশ্বমানবতা যে জটিল, বিপজ্জনক বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যার যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সমাধান রয়েছে শুধুমাত্র ইসলামে আর কোথাও নেই।

৪) কুর'আনুল কারীম যে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং কুর'আনে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনা সমূহই লিপিবদ্ধ আছে, কোনো মানুষ এই পবিত্র কিতাবের লেখক নন, এই মহাসত্য অমুসলিমদের এবং একই সাথে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' মুসলিমদের কাছে জোড়ালোভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

৫) যে এলাকায় এই প্রকাশনা কেন্দ্র থাকবে সে এলাকাকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে ঈমানী চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং ইসলামি আইন মোতাবেক খলিফা বা ইমাম এই সংঘবদ্ধ সমাজটির নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

এরূপ ইসলামি প্রকাশনা কেন্দ্র স্থানীয় মুসলিম স্কলার ও চিন্তাবিদদের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধান বিষয়ে গবেষণা পত্র, বই এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ প্রকাশনারও সুযোগ করে দেবে যে সুযোগ বর্তমানে নেই বললেই চলে। প্রকাশনা বিভাগটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও স্থাপন করা যেতে পারে যা একটি ইসলামি পদ্ধতিতে বৈধ ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।

গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৌশল

জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর অভিযানের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে নিপীড়িত মানুষের সুপ্ত ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত করা। অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রিবা আক্রান্ত লোকদের ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও আন্দোলনে যার যার সর্বোচ্চ সাধ্যমত জড়িত করার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি মুসলিমকে সম্পৃক্ত করে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলার আইন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সত্যিকার দারুল ইসলাম বা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়িম হবে এবং আধুনিক 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র প্রত্যাখ্যাত হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৫ সালে ওয়াশিংটন শহরে ১০ লক্ষ নিপীড়িত লোকের মিছিল সফল হয়েছিল লুইস ফারাখানের (Louis Farrakhan) ডাকে। ফারা খান সফল হয়েছিলেন কারণ নিপীড়ক গোষ্ঠির ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে তিনি নিপীড়তদের ডাক দিয়েছিলেন ফলে তাকে নিপীড়ক গোষ্ঠি কিনে নেবার সুযোগ পায়নি। অনেক মুসলিম নেতাগণ বিদ্রোহ ও আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। তবে সফল হতে পারবেন বলে মনে হয় না কারণ তারা, ঐ নিপীড়ক গোষ্ঠির ভিতরেই এখনো নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এ সকল নেতাগণ নিপিড়কদের দান করা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাদের দ্বারা প্ররোচিত ও প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ঈমানী চেতনা বিসর্জন দিয়ে চলেছেন। কিউবাতে নিপীড়কদের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ট্রো সফল হয়েছিলেন-কারণ তিনি ঐ সিস্টেমের বাইরে থেকে আন্দোলনের কাজ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে, ইরানে ইমাম খোমেনীর ডাকে সাধারণ জনগণ সাড়া দিয়েছিল কেননা তিনি তৎকালীন ইরানী শাসক গোষ্ঠির বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং শোষকগোষ্ঠির দেয়া কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা কখনোই সফল হবে না যতক্ষণ নেতারা বর্তমানের আল্লাহদ্রোহী রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবেন। মাওলানা মওদুদী (রহ) এই ভুলটাই করেছিলেন যখন তিনি পাকিস্তানে আন্দোলনের ডাক দিলেন কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত জামাআ-তে ইসলামি দলকে সে দেশের শাসনতন্ত্র মোতাবেক রাজনৈতিক

দল হিসেবে নিবন্ধিত করালেন এবং পাকিস্ড়ানে রাজনৈতিক ধারার মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। ইসলামি বিপ□ব ও আন্দোলনের নেতৃত্ব তখনই সফল হবে যখন তা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে ঃ

১) মুসলিম উম্মাহকে কুর'আনুল কারীমের নির্দেশিত পথে একনিষ্ঠ ভাবে চলতে হবে। নাসারা (খ্রীষ্টান), ইহুদি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে কোনরূপ নির্ভরশীলতার সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ, আমাদের হিন্দু-খ্রীষ্টান, ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুষ্টচক্রের শয়তানী প্রভাব থেকে মুসলিমদের সর্বাবস্থায় রক্ষা করতে হবে এবং নিজেদের স্বাধীনতা ও ঈমানী চেতনা বজায় রাখতে হবে। মুসলিমদেরকে বন্ধুত্ব করতে হবে শুধুমাত্র আল□াহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। পশ্চিমা দেগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে মুসলিমদেরকে সতর্কতা অবলম্বণ করতে হবে কেননা পশ্চিমা দেশগুলির যাবতীয় কার্যকলাপ ইসলামের বির―দ্ধেই পরিচালিত, বাকী রয়েছে শুধু প্রকাশ্যে ইসলামের বির―দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। আল-কুর'আনে আল□াহ্ তা'আলা মু'মিনদের সতর্ক করেছেন:[১]

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা (কখনো) আমার ও তোমাদের দুশমনদের নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি দয়া দেখাচ্ছ! (অথচ) তোমাদের কাছে যে সত্য (দ্বীন) এসেছে তারা তাকে অস্বীকার করেছে, তারা আল□াহর রসুল এবং তোমাদেরকে (জন্মভূমি থেকে) বের করে দিচ্ছে। শুধু এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল□াহর উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা (সত্যিই) আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে ও আমারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (ঘর বাড়ী থেকে) বেরিয়ে থাকো, তাহলে কিভাবে তোমরা চুপে চুপে তাদের সাথে (আবার) বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারো। তোমরা যে কাজ গোপনে করো আর যে কাজ প্রকাশ্যে করো আমি তা খুব ভাল ভাবেই অবগত আছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ (দুশমনদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব গড়ার) এ কাজটি করে তাহলে সে (দ্বীনের) সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (সূরা মুমতাহিনাহ্, ৬০:১)।

১ *হে মু'মিনগণ তোমরা কখনো নিজেদের দলভুক্ত লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানিয়ো না, কেননা তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনের কোন পথই অবলম্বন করতে দ্বিধা করবে না। তারা সর্বদা তোমাদের ক্ষতি ও ধ্বংসই কামনা করে। তাদের জঘন্য প্রতিহিংসা তাদের মুখে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। তবে তাদের অন্ড়রে লুকানো হিংসা-বিদ্বেষ বাইরে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার থেকেও মারাত্মক। আমরা সব নিদর্শন ও খবর খুলাখুলি বয়ান করে দিলাম তোমাদের যদি সত্যি সত্যিই বিবেক-বুদ্ধি থাকে তাহলে সতর্ক হতে পারবে।* (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১৮)।

হে (লোক সকল তোমরা) যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য হতে যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে (যাক) অতপর শীঘ্রই আল□াহ তা'আলা এমন (কওম) জাতি (সৃষ্টি করে) আনবেন যাদেরকে তিনি মুহাব্বাত করেন আবার তারাও তাঁকে মুহাব্বাত করবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারনা জিহাদ করবে আল□াহর রাস্ড়ায় এবং তারা নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় (পরোয়া) করবে না। নিশ্চই তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন আল□াহ এবং তাঁর রসুল, আর (তারা) যারা ঈমান এনেছে, সালাত কায়িম করেছে, যাকাত আদায় করেছে এবং তারা র―কুকারী (সুরা মাইদাহ্ ৫:৫৪, ৫৫)।

২)আন্দোলনের সর্বপ্রথম কাজ হবে নিপীড়িতদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা। এ কাজে সফলতা কখনই আসবে না যতক্ষণ আন্দোলনকারীরা নিপীড়কদের রাজনৈতিক আবর্তে থাকবে এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করবে আর লোক দেখানো আন্দোলন করে যাবে। কেননা ইসলাম কখনোই, কোনভাবেই যুলুম নিপীড়নের সাথে জড়িত থাকতে পারে না।

৩) নিপীড়িতদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে, জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের সুপ্ত ঈমান, চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে। যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং দ্বীনি বিষয় সবদিক থেকেই নিপীড়িত হয়ে চলেছে, এই জাগরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে তাদেরকে রিবা এবং রিবাজনিত নিপীড়ন ও রিবার ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করে তাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করা, যাতে তারা রিবার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে এবং বর্জন করতে পারে রিবাযুক্ত সকল প্রকার লেনদেন।

৪) অর্থনৈতিক নিপীড়ন তথা রিবা ভিত্তিক নিপীড়নকে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং একে যে কোন মূল্যে মুকাবিলা করতে হবে।

৫) শান্তিপূর্ণ পন্থায় যদি নিপীড়িতদের উদ্ধার করা সম্ভব না হয় তবে নিপীড়িতদের পক্ষে প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে।

প্রথমেই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নিপীড়িতদের উদ্ধার করতে হবে। তারপর বিশ্বব্যাপী অন্যান্য নিপীড়িতদের পক্ষে যুদ্ধ করতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন খিলাফাহ বা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য হিজরতের পূর্বে নির্যাতিত মুসলিমরা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নীতি অবলম্বন করে এগুতে হবে অর্থাৎ নীরব প্রতিবাদ, নীরব প্রত্যাখ্যান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে। এই কর্মকান্ড পরিচালনা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মুসলিমদের ঈমান শির্ক, কুফর ও নিফাকের (মুনাফেকীর) বীজ দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়নি এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়নি।

রিবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা ইসলামের শিক্ষার মধ্যে পড়ে কি না এই ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকলে তাদের উচিৎ হবে আল-কুর'আনের রিবা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ (৩০:৩৯, ৩:১৩০, ২:৭৫-২৭৯, ৪:২৯-৩০) বিশেষ করে সূরা বাকারার ২৭৫-২৮০ আয়াতগুলি পড়ে তার মর্ম বোঝার চেষ্টা করা। কেননা, ২৭৮-২৭৯ আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্ট ভাবে রিবার বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের কাছে যে রিবা বাকী আছে তা ত্যাগ কর যদি সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাক। আর যদি তা না কর (রিবা ছেড়ে না দাও) তাহলে, শুনে নাও, আল্লাহ ও রসুল (স) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা। আর যদি তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই মাল-সম্পদ। আর তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

সম্মানিত পাঠক, এই বই রচনায় আমাদের পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমেই আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা অতপর একই বিষয়ের উপর কুর'আনুল মাজীদে যত আয়াত আছে তা উল্লেখ করা। দ্বিতীয়ত, রসুলুল্লাহ্ (স) এর সে বিষয়ের উপর বর্ণিত সম্ভাব্য সকল হাদীসগুলিকে উপস্থাপন করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়া। যাতে করে কুর'আনের দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। আমরা রিবা বা সুদের ক্ষতিকর দিক এবং এর আক্রমানাত্মক ছোবলের রূপ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সুপ্ত ঈমানে শান দেয়ার চেষ্টা করে অত্যাধিক গুরুত্ব সহকারে যে বিষয়টি ভেবে দেখার আবেদন জানিয়েছি তা হলো রিবা মুক্তি আন্দোলনে শরিক হওয়া। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এর সৃষ্ট এই দুনিয়া রিবার বিষাক্ত দূষণে ছেয়ে গেছে। রিবা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মারণাস্ত্র এবং আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা জাতি সংঘের রাজনৈতিক অস্ত্রের সম্পুরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। যার মাধ্যমে মিথ্যেবাদী ও ভন্ড লোকগুলি সারা বিশ্বের উপর রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি এবং বিশ্ব অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মিশনকে সফলতার সাথে পরিচালিত করছে। তাই মুসলিম উম্মাহ্‌কে আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না বরং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রিবা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনে যার যার মেধা, সুযোগ ও সামর্থ অনুযায়ী শরিক হতে হবে। রিবা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর সুযোগ গ্রহণে আসুন আমরা সকলে সচেষ্ট হই আর আল্লাহ্ ও রসুল (স) ঘোষিত যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

রিবা এবং দারুল হারব (সংঘাতের সাম্রাজ্য)

অনেক মুসলিম ভাইবোন রিবা বিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন করেন। কেউ কেউ আবার উলামাগণের বরাত দিয়ে মত প্রকাশ করেন যে 'দারুল হারবে' রিবা বিষয়ক কোন প্রশ্ন তোলা অবান্তর। অন্যান্যরা অবশ্য এই মতবাদের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্ন করেন। এই মতবাদটি সঠিক না ভুল সে ব্যাপারে আলোচনার আগে জানতে হবে দারুল হারব কি?

দারুল হারব

সূরা আল আ'রাফ এর ১২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেনঃ *এ মহাবিশ্ব এবং তাতে অবস্থিত সব কিছুই তাঁর, সবকিছুরই মালিক তিনি।* তিনি আরো বলেছেনঃ *তাঁর বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য বান্দারাই দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব পাবে।* (২১:১০৫)। এ দায়িত্ব হচ্ছে মূলত পৃথিবীতে 'সালাম' রক্ষার নির্দেশ। (১০:২৫)। 'সালাম' অর্থ 'শান্তি'; 'নিরাপত্তা'; 'অমঙ্গলকে দূরে রাখা' 'সালাম' অবস্থার বিঘ্ন ঘটে। যখন দুর্বলের উপর নিপীড়ন চালানো হয়, যখন আগ্রাসী কাজ করা হয়, যখন আগ্রাসন চালানো হয় এবং নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষরা আল্লাহ তা'আলার কাছে বিচার চেয়ে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এই সকল নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতিবাদে সংগ্রাম করার নির্দেশ এসেছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এমন সংগ্রামকে বাধ্যতামুলক বা ফরয করা হয়েছে যাতে করে মুসলিমরা যুদ্ধ করে নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত, নিগৃহীত, দুঃস্থ জনগণকে মুক্ত করে সত্য ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসতে পারে (৪:৭৫)।

আরবী ভাষায় (হারব) শব্দের অর্থ যুদ্ধ। তাই যে দেশে মুসলিমরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত সে দেশকে 'দারুল হারব' বা 'সংঘাতের সাম্রাজ্য' বলে। আল-কুর'আন এবং হাদীসে এমন কোন কথা বা ইঙ্গিত নেই যা দ্বারা দারুল হারবে রিবাকে বৈধ বা হালাল করা হয়েছে। কোন কোন দেশে হানাফী সম্প্রদায়ে একটা ভুল মতবাদ অবলীরায় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে প্রচলন করা হয়েছে। মতবাদটি হল দারুল হারব এ রিবা বৈধ বা হালাল কারণ সেখানে লেনদেন হয় 'হারবী' বা দারুল হারববাসীদের সাথে। কিন্তু এই মতবাদটি একেবারেই মিথ্যা ও বানোয়াট। সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী রিবা একধরনের জোরপূর্বক চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজি যে কখনো বৈধ হতে পারে না এটা আমাদের সকলেরই জানা।

পৃথিবীর কোন একটা ভূ-খন্ডকে দারুল হারব তখনই বলা যাবে, যদি পৃথিবীর অন্য কোন ভূ-খন্ডে দারুল ইসলামের অস্তিত্ব থাকে। অথচ বর্তমান বিশ্বে সত্যিকার অর্থে দারুল ইসলামের অস্তিত্ব নেই, এমনকি পবিত্র মক্কা এবং মদিনা শহরেও দারুল

ইসলাম নেই। তৎকালীন সময়ে বিশিষ্ট চিন্ড়্যবিদ, শিক্ষাবিদ মাওলানা মানাজির আহসান জিলানীর পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না যে দারুল ইসলামের অস্ড়িত্ব বিলীন হয়ে গেছে। ১৯২৪ সালে খিলাফাহ ধ্বংসের পর, ১৯২৬ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত খিলাফাহ কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সময়ও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় অনুধাবন করতে পারেনি যে প্রকৃতপক্ষে দারুল ইসলামের অবসান ঘটেছে।

একটি ভূ-খন্ড বা দেশকে দারুল ইসলাম বা ইসলামের সাম্রাজ্য আখ্যায়িত করার আগে দেখতে হবে সে ভূ-খন্ডে সরকার এবং জনগণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পথে আছে কিনা এবং তাঁর সংবিধান মেনে চলছে কি না। কেননা ঐ ভূ-খন্ডের মানব রচিত প্রচলিত আইনের উপর স্থান পাবে আল্লাহর আইন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের কোথাও এমন একটি ভূ-খন্ড নেই যেখানে আল্লাহর আইন-বিধানে রাষ্ট্র চলে। জাতিসংঘের চার্টারের ২৪ এবং ২৫ নম্বর আর্টিকেল দু'টি অনুযায়ী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

আর্টিকেল ২৪ : জাতিসংঘ কর্তৃক দ্রুত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এর সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদকে প্রাথমিকভাবে আন্ড়র্জাতিক শান্ড়ি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে এবং সদস্যদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদকে এই কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে চলেছে।

আর্টিকেল ২৫ : জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী সদস্য দেশগুলি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতিসংঘের উক্ত চার্টার ২৬শে জুন ১৯৪৫ সই করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে এবং কার্যকরী হয় ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ থেকে। সে সময় অধিকাংশ মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা দেশগুলির কাছে পরাধীন থাকলেও সৌদী আরব স্বাধীন ছিল তথাপিও সৌদী সরকার ঐ সনদে স্বাক্ষর করে।

ইরান, সুদান, পাকিস্ড়ান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের সকল (পরিচয়ে) মুসলিম দেশগুলি যারা জাতিসংঘের সদস্য তারা সকলেই ঐ চুক্তি অনুযায়ী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মানতে বাধ্য। অন্যকথায় বলা যায়, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সে কথা বাদ দিয়ে এবং ভুলে গিয়ে তারা কয়েকজন আদম সন্ড়ানের সীমিত জ্ঞান উদ্ভুত পরিষদকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমন করার সময় স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি অমান্য করে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে ইরাককে ধ্বংস করেছে এবং নিজেদের আধিপত্য বিস্ড়ার করেছে। অথচ (কথিত) মুসলিম বিশ্ব এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি এবং কোন চেষ্টাও করেনি।

কোন একটি ভূ-খন্ডকে দারুল ইসলাম বলে চিহ্নিত করতে হলে দেখতে হবে সে দেশে/ ভূ-খন্ডে ইসলামি আইন অনুযায়ী মুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণ করছে কি না। সে অধিকারগুলি হল-

১) দারুল ইসলামে অবাধে প্রবেশাধিকার কোনরূপ ভিসা-পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়বে না।

২) বিনা বাধায় বসবাসের অধিকার

৩) ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই জীবিকা অর্জনের অধিকার

৪) রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার

৫) অবস্থানের জন্য কোন মুসলিমের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহার

বর্তমান বিশ্বে কোন মুসলিম রাষ্ট্রই আর মুসলিমদের উপরোক্ত অধিকারগুলির প্রতি সম্মান দেখায় না। মুসলিম জাতিকে বর্তমানে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীর হীনমন্যতা পেয়ে বসেছে এবং ইসলামি শিক্ষা ও আইনে অজ্ঞতা বশত তারা উপরোক্ত অধিকারগুলির বিপরীতে কাজ করে উল্টো আরো বিরোধিতা করে আসছে। অথচ, দারুল ইসলামের এই অধিকারগুলি ইউরোপীয়রা গ্রহণ করে ইউরোপীয় গোষ্ঠি গঠন করেছে এবং সকল ইউরোপীয় নাগরিকের জন্য ঐ অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে।

একমাত্র একজন আমীরুল মু'মিনীন পারেন কোনো ভূ-খন্ডকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা করতে। ১৯১৪ সনে শেষবারের মত ইস্তাম্বুলে একজন খলিফা এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিগত সৌদী রাজা একবার ইসরাইলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু পরে মুহুর্তেই তা ভুলে গিয়েছিলেন। আবার ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে জিহাদের ডাক দেয়া হয়েছিল। মুসলিমরা যদি সত্যিকার ভাবে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে সে ভূ-খন্ডে বসবাসকারী মুসলিমরা ইসলামি প্রথা অনুযায়ী খলিফা বা আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচন করতে পারবেন। সেই খলিফা তখন ইসলামি আইন-বিধান অনুযায়ী যে সমস্ত দেশসমূহে মুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার খর্ব হয়ে চলেছে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদী আরব এবং বাংলাদেশ সহ সে সব দেশগুলিকে দারুল হারব বলে ঘোষণা করতে পারবেন।

যখন কোনো ভূ-খন্ডকে দারুল হারব হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন সে ভূ-খন্ডে কোন মুসলিমের বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদি কারো সেখানে কোন সাময়িক কাজ বা প্রয়োজন থাকে তাহলে দ্রুত সে কাজ বা প্রয়োজন শেষে তাকে দারুল ইসলামে ফিরে যেতে হয়।

হারবী বা দারুল হারব-বাসী এমন এক দল যাদের সাথে মুসলিমরা থাকবে (সর্বদা/সদা) যুদ্ধরত। সুতরাং যুদ্ধের নিয়ম নীতি অনুযায়ী যে কোন মুসলিম একজন

হারবীকে হত্যা করতে পারবেন যে কোন সময়ে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র যদি দারুল হারব হয় তাহলে একজন মুসলিম ইসলামি আইন বিধান অনুযায়ী যে কোন অমুসলিম আমেরিকান (তথা হারবী) কে হত্যা করতে পারেন। একজন হারবী অবশ্য নিরাপদে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারে, যদি কোন মুসলিম নর-নারী তাকে অনুমতি দেয়। সেক্ষেত্রে অন্য কোন মুসলিম তাকে হত্যা করতে পারবে না যতক্ষণ সে দারুল ইসলামে অবস্থান করবে।

একজন মুসলিম একজন হারবীর সম্পত্তিও দখল করতে পারেন যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী। সেই হিসেবে আমেরিকা যদি দারুল হারব হয়, তবে আমেরিকানদের সম্পত্তি দখল করা বৈধ হবে!

আমেরিকা বা যে কোন অমুসলিম দেশকে দারুল হারব হিসেবে গণ্য করে সেখানে রিবা ভিত্তিক লেন-দেন করার আগে মুসলিমদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বুঝতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে।

কোন মুসলিম যদি মনে করেন আমেরিকা দারুল হারব। আবার অন্যদিকে আমেরিকার গ্রীন কার্ডের বা নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রানান্ত চেষ্টা চালিয়ে যান তাহলে বলতে হয় তিনি সবচেয়ে বড় হিপোক্রিট এবং ইসলামের একজন বড় শত্রু এবং বিশ্বাসঘাতক। মৃত্যুর আগে তাওবা করে মৃত্যুবরণ না করলে হাশরের দিন তার জন্য থাকতে পারে কঠোর শাস্তি। আর পৃথিবীতে থাকাকালীন ঐ অমুসলিম দেশের সরকার ঐ মুসলিম পরিচয়দানকারীর নাগরিকত্ব (রেসিডেন্সী) বাতিল করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং তাকে সশ্রম কারাদন্ড দিতে বা নির্বাসন দিতে কোন বাধা থাকবে না।

NOTES OF CHAPTER SIX

1. Majid Khadduri: The Islamic Law of Nations. Shaybani's Siyar translated with an introduction, notes and appendages by Majid Khadduri. The john Hopkins Press. Baltimore, Maryland, 1966. pp. 173-4.

সপ্তম অধ্যায়ঃ রিবা এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার আইন-বিধান

RIBA & THE LAW OF NECESSITY

অনেকে যুক্তি দেন যে অমুসলিম দেশগুলিতে অত্যাশ্যকীয় বিষয়ে ইসলামের আইন বিধান (Riba & the Law of Necessity) অনুযায়ী রিবাভিত্তিক অর্থনৈতিক লেনদেন করা যেতে পারে।

এ মতবাদের সমর্থকদের যুক্তি হল নিতান্ড় খাদ্যাভাবের মধ্যে পড়লে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার উদ্দেশ্য না থাকলে বরং শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য নিরুপায় হয়ে হারাম খাদ্য খাওয়া যায়। যেমন শুকর খাওয়া হারাম এ বিষয়টি ধরুন। একজন মুসলিম ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুর দুয়ারে দাড়িয়ে। আর তার সে ক্ষুধা নিবারণে একমাত্র যে খাবারটি রয়েছে, তাহলো শুকরের মাংস। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্থ এই মুসলিমের পক্ষে শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণের জন্য শুকর খাওয়া জায়েজ। ঐ মুসলিমের সংকটময় মুহুর্ত পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তার জন্য আবার শুকর হারাম হওয়ার আইন বলবৎ থাকবে। হালাল হারামের বিষয়ে আসুন দেখা যাক কুর'আনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কি বলা হয়েছেঃ

লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায় তাদের জন্য কি কি হালাল। আপনি বলুন উত্তম (পবিত্র) জিনিষগুলি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৪)।

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত পশু-পাখী, রক্ত, শুকরের মাংস আর সে সকল পশু যেগুলি আল্লাহ্র নাম ছাড়া জবাই করা হয়েছে। আর, পতিত হয়ে শ্বাসরূদ্ধ মৃত, হিংস্র পশুর আঘাতে মৃত পশু যেগুলি জীবিত পেয়ে পরিশুদ্ধ (জবাই) করা হয়েছে তা ব্যতীত, আর পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীরগুলি দিয়ে হত্যা করা পশু। এ সকল কর্মকান্ডই ফাসেকী। আজ তোমাদের দ্বীন হতে কাফিররা নিরাশ (ভীত) হয়ে পড়েছে সুতরাং তাদেরকে ভয় করোনা এবং শুধু আমাকেই ভয় কর। তোমাদের জন্য আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে (সন্তুষ্ট হয়ে) তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (সূরা মাইদাহ্, ৫:৩)।

আপনি বলুন আমার কাছে যে ওয়াহী এসেছে তাতে এমন কিছু পাইনা যা হারাম হতে পারে তবে যদি তা মৃত (পশু-পাখী), রক্ত কিংবা শুকরের মাংস হয় তবে তা ভিন্ন কথা কেননা তা অপবিত্র। (সূরা আন'আম, ৬:১৪৫)।

তোমরা যদি আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি ঈমান এনে থাক তাহলে যে সকল (হালাল) পশু আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবাই করা হয়েছে তা তোমরা খাও। আর তোমাদের কি হয়েছে যে আল্লাহ্র নাম নিয়ে (জবাই করা পশুর গোশ্ত) তোমরা খাচ্ছ না? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ড়ারিত বর্ণনা করেছেন তোমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে যদিও নিরুপায় পরিস্থিতিতে পড়লে তা তোমরা খেতে পারো । কিন্তু আল্লাহ্র (দেয়া আইন-বিধান সম্পর্কে) কোন জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের (হওয়া নাফসের) খেয়াল খুশীর দ্বারা বহু পথভ্রষ্ট লোক বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি করে। সীমালংঘনকারীদের বিষয়ে আপনার রব খুব ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬:১১৯)।

আল্লাহ্ নিশ্চয়ই হারাম করেছেন মৃত জন্তুর মাংস, সকল প্রকার রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ্‌র নাম নেয়া ছাড়া জবাইকৃত জন্তু। কিন্তু কেউ বিপদে তাড়িত হয়ে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আইন ভঙ্গ (করে তাঁর সাথে নাফরমানি) করার উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খায় তাহলে তার গুনাহ্ হবে না। (কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই দয়ালু এবং অতীব মেহেরবান। (২:১৭৩)। অমুসলিম দেশে দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে পড়লে রিবা ভিত্তিক লেন-দেন করা যেতে পারে। তাদের যুক্তির সমর্থনে তারা পূর্বোল্লিখিত কুর'আনুল মাজীদের কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করে থাকেন।

যখন সকল মুসলিম সম্মিলিত প্রচেষ্টা করে রিবামুক্ত লেনদেন করার জন্য। অথচ সবরকম পন্থা অবলম্বন এবং চেষ্টা সাধনার পরেও সমষ্টিগতভাবে যখন সকলে ব্যর্থ হয় এবং রিবাভিত্তিক লেনদেন না করার কারণে তাদের অস্থিত্বই টিঁকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। রিবা গ্রহণ ছাড়া প্রাণ বাঁচানো কোনমতেই সম্ভব নয় বলে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় অমুসলিম দেশে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে কুর'আনের বিধান মতে শুধুমাত্র তখনই রিবাভিত্তিক লেনদেন করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা রিবাভিত্তিক লেনদেন করে থাকেন প্রধানত বসবাসের বাড়ী বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য। তাদের যুক্তি হল মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে অন্যতম হল একটি নিরাপদ বাসস্থান। ঐ সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের এই যুক্তি দেয়ার আগে চিন্তা করা প্রয়োজন তারা যে দেশে বসবাস করছেন সেখানে কি ভাড়ায় বাসস্থান পাওয়া যায় না? ভাড়া করা বাড়ী কি নিরাপদ বাসস্থানের প্রয়োজন মেটায় না? সে দেশে হাজার হাজার অমুসলিম কি ভাড়া বাড়ীতে থাকেন না? তাহলে মুসলিমদের কোন্ যুক্তিতে রিবাযুক্ত ঋণ নিয়ে বাড়ী বা ফ্ল্যাট কিনতে হবে? উপরন্তু যারা হাজার হাজার ডলার ব্যয় করে ভাড়া বাসায় থাকার সামর্থ রাখেন তাদের জন্য বাড়ী কেনা কি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের আওতায় পড়ে? বাড়ী না কেনা হলে কি তাদের জীবন ধারন থেমে যাওয়ার ঝুঁকি বয়ে আনে? আসলে রিবাভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে বাসস্থান কেনার যে যুক্তি দাড় করানো হয় সেসব কোন যুক্তিই এসব ক্ষেত্রে খাটে না। বরং রিবাভিত্তিক লেনদেন বর্জনের জন্য ন্যুনতম ঈমানের দাবী হিসেবে তারা অনায়াসে ভাড়া বাসায় থাকতে পারেন।

অনেকে আবার যুক্তি দেখাতে পারেন ভাড়া বাসার চেয়ে নিজের বাড়ী বেশী নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনের আশ্বাস দেয়। এই যুক্তিটাকে পুঁজি করেই রিবাভিত্তিক অর্থনীতি তার বিষাক্ত ব্যবসায়িক থাবা বিস্তার করেছে।

১ সুদী ঋণ নিয়ে একটা বাড়ী/ফ্ল্যাট যখন হয়ে যায় তখন থেকেই বাড়তে থাকে তাদের অদম্য চাহিদা। নতুন ফ্ল্যাটে পুরোনো ফার্নিচার আর মানায় না। ঘরকে এবার সাজানোর জন্য দেশী বিদেশী বিভিন্ন শো পিস, ফার্নিচার, কম্পুটার, ভি সি আর, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ (ওভেন) আরো কত কি। আর এসব কেনার কাজে সহায়তার (শয়তানী) হাত প্রসারিত করে রেখেছে সুদী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলি।

প্রকৃতপক্ষে সুদী ঋণ নিয়ে বাড়ী বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের পরিবর্তে অংশীদারিত্ব মালিকানা ব্যবস্থায় বাড়ী ক্রয় করে, (সুদ মুক্ত) কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে বাড়ী বা ফ্ল্যাটের

মালিক হওয়ার ব্যবস্থা করা হলে ইসলামি আইন মোতাবেক তা বৈধ হয়। দেখা গেছে সুদী ঋণ নিয়ে বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় করতে গেলে আসল মূল্যের ৩০%-৪০% এমনকি ৫০% বেশী মূল্য পরিশোধ করে বাড়ীর মালিক হতে হয়। অথচ শরীকি মালিকানায় বাড়ী কিনতে গেলে ভাড়াটে ব্যক্তি মাসিক ভাড়ার সাথে (সুদমুক্ত) কিস্ড়্রি টাকা বাড়ী বা ফ্ল্যাটের মালিককে দিতে থাকলে, চুক্তি বা শর্তানুযায়ী ৫ বৎসর, ৭ বৎসর বা ১০বৎসর ময়াদ শেষে ভাড়াটে ঐ বাড়ী বা ফ্ল্যাটের মালিকানা পেয়ে যেতে পারেন।[১]

এবার আসা যাক বন্ধকের বিনিময়ে ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ নেয়ার সমস্যা ও ক্ষতিসমূহ আলোচনায়-

১) রিবা সংক্রান্ড় আল□াহ তা'আলার আইন অমান্য করে আল□াহর ক্রোধে নিপতিত হওয়া।

২) শরীকি ব্যবস্থায় কোনকিছু কেনার চেয়ে ৩০%-৪০% এমনকি ৫০% বেশী মূল্যে কিনতে বাধ্য হওয়া।

৩) দীর্ঘমেয়াদী ঋণচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। অর্থনৈতিক সুন্নাহ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও এটুকু বোঝা যায় এই দীর্ঘমেয়াদী ঋণচুক্তিতে যাওয়া ভীষন বোকামী এবং বিপজ্জনক। আর আল□াহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করার গুণাহ ও আযাব আরো মারাত্মক কঠিন।

৪) মৃত্যু যেকোন সময় হাজির হতে পারে। একজন মুসলিম ঋন পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে এবং সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে যাওয়াতে স্বয়ং রসুল (স) এক সাহাবীর জানাজায় ইমামতী করতে অস্বীকার করেছিলেন। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ঋণ করা কতটা নিন্দনীয় বিষয়। উপরন্তু এই ঋণ যদি সুদী ঋণ হয় তাহলে তার ভয়ংকর পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫) দীর্ঘমেয়াদী ঋণচুক্তির মধ্যে নিজেকে এবং নিজ পরিবার বর্গকে জড়িয়ে ফেলা। সুদী ব্যবস্থায় ঋণ নিয়ে বাড়ী কেনার পর সেই ঋণ পরিশোধের আগেই যদি ক্রেতার মৃত্যু ঘটে তবে ঋণ পরিশোধের যাবতীয় দায়িত্ব বর্তায় তার বিধবা স্ত্রী এবং এতিম পুত্র-কন্যার উপর। যদি তাদের সেই ঋণ পরিশোধের সামর্থ না থাকে তাহলে ব্যাংক তার

১ এতে করে আপাতদৃষ্টিতে ভাড়াটেকে লাভবান হতে দেখা গেলেও প্রকৃত লাভবান হবেন বাড়ীর মালিক কারণ তার নিয়াত যদি একমাত্র আল□াহর সন্তুষ্টিই হয় তাহলে বহুগুণে এই ত্যাগের প্রতিদান আল□াহ তা'আলা তাকে দিবেন।

পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য ঐ সম্পত্তি নিলামে উঠানো সহ যেকোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখে। ফলে যে মুহূর্তে ঐ অসহায় পরিবারের নিজস্ব বাসস্থানের

নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই সময় তাদেরকে তাদের স্বপ্ন-সাধের বাড়ীটি ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয়। ধরা যাক ২০ বছরের মেয়াদী বন্ধকী চুক্তিতে ঐ ব্যক্তি ব্যাংকের কাছে এক লক্ষ ডলার ঋণ নিয়ে বাড়ীটি কিনেছিলেন। (প্রতি মাসে ১০০০ ডলার পরিশোধ করলে বছরে ১২,০০০ ডলার পরিশোধ করার কথা) কিন্তু ঋণচুক্তির শর্তানুযায়ী প্রথম ৫ বছর প্রতি বছরের পরিশোধকৃত ১২,০০০ ডলারের মধ্যে মাত্র ১,০০০ ডলার মূল পরিশোধের খাতে জমা হবে, বাকী ১১,০০০ ডলার সুদ পরিশোধের খাতে জমা হবে। ফলে ৫ বছর নিয়মিত কিস্তি শোধের পরেও দেখা যাবে ঐ ক্রেতা তার মূল ঋণের মাত্র ৫,০০০ ডলার এবং সুদের ৫৫,০০০ ডলার পরিশোধ করতে পেরেছেন। সেই সাথে ক্রয় ট্যাক্স এবং বাড়ীর অন্যান্য ট্যাক্স, বীমার টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচও তাকে বহন করতে হয়েছে যদিও আইনত বাড়ীটির মালিক তিনি ছিলেন না। অর্থাৎ, ১,০০,০০০ ডলার ঋণের জন্য ৫ বছরের প্রায় ৭০,০০০ ডলার খরচের পর তার ৯৫,০০০ ডলার ঋণের টাকা বাকী থেকে গিয়েছে। তার মৃত্যুতে ৯৫,০০০ ডলার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তার পরিবার দিশেহারা, সেই সময় ব্যাংক তার পাওনা আদায়ের জন্য নিলাম ডাকল এবং পুরোনো হয়ে যাওয়ার ফলে ১,০০,০০০ ডলারের বাড়ীটি ৮০,০০০ ডলারে বিক্রি করতে হলো। তাতেও কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে ব্যাংকের ১,৫০০ ডলার পাওনা থেকে গেল। ৫ বছর ধরে যাকে নিজের বাড়ী বলে জানত সেখান থেকে বেরিয়ে পথে বসতে হ'ল। তা সত্ত্বেও সুদী ঋণ গ্রহণের শাস্তি শেষ হ'ল না, ব্যাংক আরো ১,৫০০ ডলার পাওনা থেকে গেল। এই ঋণ সময় মত পরিশোধ করতে না পারলে তাতেও রয়েছে আবার সুদ গোনার পালা।[১]

৬) কোন মুসলিম দীর্ঘমেয়াদী ঋণচুক্তিতে আবদ্ধ হলে তার পক্ষে হজ্জের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায় সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা ঋণ গ্রস্থ অবস্থায় হজ্জ পালন করলে সে হজ্জ আল্লাহ কবুল করবেন এমন আশা করা যায়না। রসুল (স) বলেছেন, সামর্থ থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ করতে বিলম্ব করে সে একজন যালিম। আর যালিম ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। ধরা যাক, কোন এক পথভ্রষ্ট সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত এক পথভ্রষ্ট মুফতী বা শেখের কাছে কোন এক অজ্ঞ অসচেতন মুসলিম ফাতওয়া বা পরামর্শ চাইতে গেলেন। সে পথভ্রষ্ট শেখ তাকে ফাতওয়া দিলেন যে বাড়ী কেনার ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার আইন (Law of Necessity) এখানে প্রযোজ্য তাই সে অনুযায়ী সে ব্যক্তি ব্যাংকের সুদী ঋণ নিয়ে বাড়ী কিনতে বা বানাতে পারবে। প্রশ্ন হল ঋণ নিয়ে কি ধরনের বাড়ী তিনি বানাতে বা কিনতে পারেন? কোন্ সে জরুরী অবস্থা যখন হারাম ভক্ষণ জায়েজ সে বিষয়ে কুর'আনের আয়াতগুলি দেখুন -৫:১-৩; ২:১৭৩; ৬:১৪৫, ১১৯।

১ পাঠকগণ, অনুধাবন করতে পারেন কি মহা সংকটে ঐ পরিবারকে ফেলে ঋণগ্রহীতা মৃত্যু বরণ করলেন? সুদী ঋণ নিয়ে বাড়ী না করে ভাড়া বাসায় থাকলে ঐ পরিবারের এমন বিপদে হয়তো পড়তে হ'ত না। এমন ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে তার খবর রাখে ক'জনা।

এ সকল আয়াত অনুযায়ী হারাম গোস্ত তখনই ভক্ষণ করা যেতে পারে যখন একেবারে নিরূপায় হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই

হারাম ভক্ষণ শুধুমাত্র জীবন রক্ষার জন্য জায়েজ এবং অবশ্যই এই হারাম ভক্ষণ আল্লাহ্র নির্দেশ বিন্দুমাত্র অমান্য করার উদ্দেশ্যে যেন না হয়। এখন এই জরুরী অবস্থার বিধান যদি বাড়ী বানানো বা কেনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটা হতে পারে অতীব সাধারণ একটি ঘর। কোনরকম মাথা গোঁজার ঠাঁই করার মত একটি বাসস্থান কেনা বা বানানো অবশ্যই তার থেকে বেশী কিছু নয়। উপরন্তু এমন এক নিরূপায় অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যখন আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে নিম্নতম সুবিধাসহ একটি ভাড়া বাড়ী যোগাড় করাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

বাসস্থানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন্ আকারের বাড়ী প্রয়োজন এই প্রশ্ন এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুসলিমদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হল রসুল (স) এর জীবনাদর্শ। রসুল (স) তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য কি ধরনের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন তা পরবর্তী বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি-

আবু সালামা (রা) হযরত আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন: *আমি রসুল (স) এর সামনের দিকে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটো থাকতো তাঁর সলাতের স্থানে। তিনি সিজদায় গেলে আমি পা গুটিয়ে নিতাম। আর সিজদা শেষ করে দাড়িয়ে গেলে আবার পা মেলে দিতাম। আর তখনকার দিনে ঘরগুলিতে আলোও থাকত না*। (বুখারী, ২:১১৩৬ পৃ:৩৩৬)।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেন তাদের ঘর-বাড়ী ও আসবাবপত্রের কাছে বন্দী না হয়ে যায় বরং যখন প্রয়োজন তখনই যেন তারা আল্লাহ্র দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বা হিযরত করতে পারে। মূলত আমাদের এমন ঘরেরই দরকার যাতে সে ঘরের মায়া ছিন্ন করে সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যাওয়া যায়।[১]

এবার দেখা যাক, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কেমন ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন: *আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঘরগুলিকে শান্তির নীড় হিসেবে তৈরী করেছেন। তিনিই পশুর চামড়া দিয়ে (হালকা) ঘর বানানোর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তোমরা ভ্রমণের সময় তা বহন করতে পারো। আবার (অন্য) কোথাও বসতি স্থাপনে তা ব্যবহার করতে পারো এবং পশুর চামড়া ও পশম দিয়ে অন্যান্য সামগ্রী বানাতে পারো*। (সূরা নাহ্ল, ১৬:৮০)।

১ ভ্রমণকালে একজন যাত্রীর যেটুকু খাদ্য ও মালপত্র থাকা প্রয়োজন সেটুকুই হলো একজন মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা। কেননা প্রতিটি মানুষই এই দুনিয়ায় ক্ষণকালের যাত্রী। আখিরাতের ওপার থেকে যখনই ডাক আসে তৎক্ষণাৎ সে ডাকে সাড়া দিতে হয়। আখিরাতের অনন্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি ব্যাহত হয়, মানুষ যখন মাল সম্পদ ও ভোগ বিলাসিতায় আটকা পড়ে যায়। কেননা দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করা সেক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:
তোমরা প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতির স্মরণে অনর্থক ইমারত রচনা করছো? আর প্রাসাদ সম বড় বড় দালান কোঠা বানাচ্ছ? মনে হয় যেন তোমরা (এ দুনিয়ায়) চিরকাল থাকবে? (সূরা শু'আরা ২৬:১২৮-১২৯)।

উপসংহার

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে দিনাতিপাত করছি যে যুগের সিংহভাগ মানুষ, বাড়ী, গাড়ী ক্রয় করা থেকে শুরু করে কলেজ-ইউনির্ভাসিটির বেতন দেয়া এমনকি ঘরের আসবাবপত্র ও বিয়ের শাড়ী-গহনা কিনার জন্যও ব্যাংক থেকে সুদী-ঋণ নিয়ে থাকে। তাছাড়া যারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন, তারাও রিবা বা সুদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে যান। অতীব দুঃখ ও লজ্জার কথা হল আমাদের চেনা-জানা এমন অনেক (নামে-পরিচয়ে) মুসলিম আছে যারা সুদী-ঋণ নিয়ে হজ্জ করতে যান আর সুদী লভ্যাংশ দিয়ে যাকাত আদায় করেন। [১]।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ (পরিচয়ে) মুসলিমই তাদের জমানো অর্থ বিভিন্ন প্রকার বন্ড, বীমা ও ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে হরদম সুদী বিনিয়োগ করে চলেছে। এ সকল সুদী বিনিয়োগকারী জনগোষ্ঠির অনেকেই জানেন না তারা সুদী অর্থনীতির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে কুর'আন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামের সাথে কত মারাত্মক দুশমনী তারা করছে। তারা এটাও হয়তো জানেন না বা জানতে চাননা সুদ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সীমালংঘন এবং নাফরমানীর পরিণতিতে তাদের জন্য কত ভয়ংকর আযাব অপেক্ষা করছে।

বন্ড, বীমা বা ফিক্সড ডিপোজিটের লেনদেনে অংশগ্রহণকারীরা যতবারই বীমা বা ফিক্সড ডিপোজিটের কিস্তি জমা দেয় কিংবা ব্যাংক অথবা বীমা কোম্পানী থেকে মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে গ্রহণ করে ততবারই তারা যিনার চেয়েও অধিক ঘৃণিত গুণাহ্য় লিপ্ত হয়। কেননা আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত রসুল (স) বলেছেন: *রিবার মাত্র একটি রোপ্যমুদ্রাও যে জেনে শুনে খায়, তবে তা ছত্রিশবার যিনা (ব্যভিচার) করা অপেক্ষা অধিক গুণাহ্* (আহমদ, বায়হাকী)।

১ সুদখোর-ঘুষখোরদের দেখা যায়, সুদ-ঘুষের অর্থ দিয়ে মাসজিদ বানায় (নাউযু বিল্লাহ্) আর মিথ্যা আশা নিয়ে ঘুষের অর্থ দিয়ে হজ্জ করে, মাসজিদ প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্য কোন জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করে বিরাট সওয়াব অর্জন করবে। কক্ষনো নয় সুদ-ঘুষ কিংবা অন্য খিয়ানাতের মাল আল্লাহ্ কবুল করেন না। শুধুমাত্র হালাল উপার্জনের অর্থ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, কেননা আল্লাহ নিজে পবিত্র তাই তাঁর পথে সকল ব্যয়ই হওয়া চাই হালাল উপার্জন থেকে। তবে সুদখোর বা ঘুষখোররা তাদের সমুদয় অপবিত্র অর্থ সম্পদ পরিত্যাগ করে তাওবা করে নিলে আশাকরা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ্ গফুরুর রহিম (পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু)।

তদুপরি তারা বিভিন্ন প্রকার সুদী লেনদেনের মাধ্যমে নিজেরা যেমন দুর্নীতি ও শোষণের নির্মম শিকার হয়ে প্রতারিত হয়। তেমনি অকারণে শোষণের বদলা নিতে কিংবা নিজের

সম্পদের ক্ষতিপূরণ করতে তারাই সমাজের অন্যদের উপর শোষণ-নির্যাতন চালায়। আবার কেউ কেউ সুদী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেব খুলে অথবা অন্য কোন উপায়ে এই সকল শোষণ নির্যাতনের পথ ও পন্থাকে অবিরাম সহায়তা করে যায়। যখন মানুষ সুদী ঋণ গ্রহণ করে তখন তারা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে 'আইনসিদ্ধ চুরি বৃত্তিতে' (Legalized theft) এবং সুদী ব্যবস্থাকে চাঙা রাখে যার ফলে সমাজে পুঁজিবাদী লুটেরা গোষ্ঠি সমগ্র মানবজাতির রক্ত চুষে নেয় প্রতারণা আইনসিদ্ধ চুরিবৃত্তি ও শোষণ-নির্যাতনের মাধ্যমে। সে কারণে রসুলুল্লাহ্ (স) সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত সকলের প্রতি লা'নাত করেছেন। জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রসুল (স) বলেছেন: *সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের সাক্ষীদ্বয় এবং সুদের হিসেব লেখকদের উপর লা'নাত কারণ তারা সকলেই সমান অপরাধী*। (সহীহ মুসলিম, ৪:৩৯৪৮ পৃ:৫২৫)।

সুদী লেনদেনে জড়িত প্রতিটি দলকে দুনিয়া ও আখিরাতের চরম পরিণতির বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে ।[১]

রিবা বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কঠোর নিষেধাজ্ঞার (হারাম ঘোষণার) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বেশ ক'টি কারণ রয়েছে। কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ মুসা (আ) ও ঈসা (আ) কে দেয়া তওরাত ও ইঞ্জিলের বাণী ইহুদি-নাসারা কর্তৃক রূপান্তরিত করা। তওরাত-ইঞ্জিলে নাযিলকৃত অন্যান্য বিষয়গুলির মত রিবার হারাম ঘোষণাকেও ইহুদিরা রদবদল করে ফেলেছিল আর তওরাত ও ইঞ্জিলের বেশকিছু অংশ নিজেদের বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিজেদের খেয়াল খুশী মত নতুন করে লিখে নিয়েছিল ইহুদিরা (দেখুন আল বাকারা, ২:৫৯ ও ১৭৪)।

তওরাত-ইঞ্জিলের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি রদবদল করার কারণে আল্লাহতা'আলার নাযিল করা সর্বশেষ কিতাব কুর'আনুল কারীমে (রিবাকে হারাম বা নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে ধাপে ধাপে শিক্ষার মাধ্যমে) চূড়ান্তভাবে রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। সুদী ঋণ গ্রহীতা, সুদী-ঋণদাতা, সুদী-কারবারের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব ও তা লেনদেনে সাক্ষ্যদাতা ও সহায়তাকারী সকলেই জঘন্য গুণাহ্য় লিপ্ত রয়েছে। যার পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধে পতিত হবে এবং কঠোর ও লাঞ্ছনাদায়ক আযাব ভোগ করবে। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন: *মি'রাজের রাতে আমি এমন সব লোকদের দেখেছি যাদের পেটগুলি ছিল এক একটা বিশাল ঘরের সমান। আর সে পেটগুলি সাপে ভরপুর ছিল যা বাহির থেকেই স্পষ্ট*

১ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষ করে রিবা বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা দান করেছেন এবং সরাসরি সুদী লেনদেন থেকে হিফাজাত করেছেন তারাই রিবার কুফল সম্পর্কে সাধ্যমত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন। এই গ্রন্থে রিবা বা সুদের বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে যা রিবার বিরুদ্ধে গণ সচেতণতা গড়ে তুলতে আমাদের সহায়তা করবে।

দেখা যাচ্ছিল। এদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হলো, এরা হলো সেসব লোক যারা (দুনিয়ায়) সুদ খেতো। সুদখোরেরা খ্রীস্টান, ইহুদি, হিন্দু, বুদ্ধ, (পরিচয় সর্বস্ব) খন্ডকালীন বা আংশিক মুসলিম অথবা অন্য যে কেউ হোক না কেন, তা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সে যে দ্বীনেরই অনুসারী হোক না কেন সে বা তারা সুদখোর হলে তারা চরম ঘৃণিত গুণাহ্য় লিপ্ত রয়েছে। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাদের প্রত্যেককেই চরম আযাব ভোগ করতে হবে। কেননা মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহতা'আলা মুসলিম, খ্রীষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, বুদ্ধ তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর সর্বশেষ আসমানী কিতাব ও হিদায়াত গ্রন্থ আল-কুর'আনের শিক্ষাদানে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সে কারণে আল-কুর'আনের রিবা নিষিদ্ধকরণ বা হারাম ঘোষণা, বাংলাদেশী, সৌদী, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী, ইরানী, মিশরীয়, আমেরিকান, চাইনিজ, অষ্ট্রেলিয়ান তথা সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রযোজ্য।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রিবাকে হারাম ঘোষণা করে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা কোন নুতন বিষয় নয়, বরং দাউদ (আ), মুসা (আ) এবং ঈসা (আ) এর প্রতি নাযিল করা পূর্ববর্তী কিতাব যাবুর, তওরাত ও ইঞ্জিলেও রিবাকে হারাম ঘোষণা করে যে সকল ওয়াহী নাযিল হয়েছিল, তারই অবিকৃত অবশিষ্ট অংশ যা মজুদ ছিল তা পুনরুদ্ধার, সত্যায়ণ ও হিফাজাতের মাধ্যমে কুর'আনুল কারীমে রিবা হারাম হওয়ার চুড়ান্ড় ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে দুনিয়াতে শির্ক বাদে যে কয়টি মারাত্মক গুণাহ্ মানুষ করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম ঘৃণিত, ভয়ানক ও বৃহৎ গুণাহ্ হলো যে কোন ধরনের রিবা বা সুদী লেনদেন। অন্যান্য মারাত্মক গুণাহ্গুলি হলো বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করে আল্লাহর ইবাদতে শরিক বনানো, আর এমন ঈশ্বরের উপাসনা করা যে ঈশ্বরের (পুরুষের বেশে) আগমন ঘটেছিল বেথেল হেমে (যীশুর মায়ের কাছে) কিংবা আমেরিকার শিকাগো শহরে। অথবা এমন কঠিন গুণাহ করা যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবের কিছু অংশ নিজেদের সুযোগ-সুবিধামত রদবদল করে নতুন করে নিজেরাই লিখে এবং ছাপিয়ে (তা আসমানী কিতাব বলে) বিলি করা এবং বিভ্রান্ড়ির কবলে ফেলে বিশ্বমানবতা ধ্বংস করা (যেমনটি করা হয়েছিল যাবুর, তওরাত ও ইঞ্জিলে রিবা নিষিদ্ধকরণের আয়াতগুলি বদলে দেয়ার মাধ্যমে)।

আর এমন সুযোগ রাখা হয়নি যে তারা বলবে, কুর'আনের শিক্ষা আমাদের কাছে পৌঁছেনি তাই আমরা জাহিল ও গাফিল থেকে রিবা বা সুদ খেয়ে এসেছি। সুতরাং হে আমাদের রব! আমাদেরকে আখিরাতের এই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করুন।

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: *সর্বোত্তম কালাম হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মদ (স) এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল কুশিক্ষা, কুসংস্কার।* (সহীহ বুখারী, ১০:৬৬৬৮)।

বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও ব্যাপক অধ্যয়ণের ফলে রিবা বলতে যা বুঝা গেল তা হলো, প্রতারণা, নীতিবিবর্জিত ও বেআইনীভাবে যেকোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা পণ্যসামগ্রী হতে সুযোগ সুবিধা লাভ করা। যেমন, দুর্নীতি, প্রতারণা, ঘুষ আদান-প্রদান, ভেজাল মিশ্রণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতারণা করা, অনুমান নির্ভর ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি।

সুদী-ব্যাংকিং পদ্ধতিটাই হলো 'আইনসিদ্ধ চুরিবৃত্তি' (Legalized theft) যা সুদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রিবা ব্যবস্থার কারণে মুদ্রা মূলত একটি অর্থ (সম্পদ) ভান্ডার এবং একটি বিনিময় মাধ্যম। রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কারণে কাগুজে মুদ্রা আসল (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রার স্থান দখল করে নিয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা অত্যন্ড় ধুর্ততার সাথে কাগুজে মুদ্রার মূল্যমান ক্রমাগতভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। তাই গত ২৫-৩০ বছরের মুদ্রা বাজারের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আমেরিকান ডলার তার প্রকৃত মূল্যের ৯২% হারিয়ে ফেলেছে। যেমন ১৯৭১ সালে ১ আউন্স স্বর্ণের মূল্য .....ডলার যার বর্তমান মূল্য .....ডলার। আর মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রকদের কারসাজীর কারণে দরিদ্র দেশগুলির মুদ্রামান হ্রাস পাচ্ছে আরো অধিক হারে। অথচ খুব কম সংখ্যক মানুষই পুঁজিবাদীদের খবমধষরুবফ ঃযবভঃ এর কারচুপি বুঝতে সক্ষম। যতবারই মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে ততবারই লাভবান হচ্ছে লুন্ঠনকারী পুঁজিবাদী গোষ্ঠি। পক্ষান্ড়রে চরম ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে দিনমজুর, কৃষক এবং অন্যান্য খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠি। আর এরই নাম ধ্বংসাত্মক রিবা।

সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে শোষণ করে সুদী অর্থ সম্পদ গঠিত হয় যা ক্রমাগতভাবে পুঞ্জিভূত হতে থাকে লুন্ঠনকারী পুঁজিপতি ধনীদের সঞ্চিত ভান্ডারে। যার পরিণতিতে দরিদ্র গোষ্ঠি ক্রমাগতভাবে লুন্ঠনকারী ধনীদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। পরিশেষে পুঁজিপতি ধনীদের মাঝেই অর্থসম্পদ আবর্তিত হতে থাকে। অপরদিকে দরিদ্ররা বিনা অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্রের ভয়াল চক্রে (Vicious cycle) জড়িয়ে ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্র হয়ে চিরকাঙালে পরিণত হয়। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দিনে দিনে বাড়তেই থাকে আর অর্থ সম্পদ আবর্তিত হয় গুটি কয়েক পুঁজিবাদী লুন্ঠনকারীদের চারপাশে। ফলে বিশ্বের সকল সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে অবশেষে লুন্ঠনকারী ধনীরা পালিয়ে যায় সুরক্ষিত শহরতলীর দিকে। যাতে করে শোষিত ও নিগৃহীতদের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়। রিবা বা সুদী অর্থনীতি বহুবিধ উপায়ে আর্থ-সামাজিক শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে স্বচ্ছ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। আর রিবা বা সুদী লেনদেন অত্যন্ড় সুকৌশলে তার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত করে সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারছেনা মুক্ত বাজারের ধুঁয়ো তুলে পুঁজিবাদী রিবাখোর মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রকরা কিভাবে তাদের সমুদয় অর্থ সম্পদ করায়ত্ব করে

ফেলে। প্রতারণা ও চাকচিক্যের আবরণ থাকার ফলে অধিকাংশ মানুষ পুঁজিবাদীদের নীল নকশা চিহ্নিত করতে অক্ষম। সারা মানুষকে উন্নয়নের নামে সমগ্র মানবতাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে প্রভু মহাজন সেজে বসেছে পুঁজিবাদী ইউরোপীয় সভ্যতা।

ইহুদিরা অবশ্য আজকের দুনিয়ার সর্বপ্রধান প্রভু মহাজন, এই সকল লোকই হলো রিবা ও সুদখোরদের সর্দার। উলে□খ্য যে এই ইহুদিরাই পূর্ববর্তী যামানায়ও রিবার প্রধান হোতা ছিল।

পুঁজিবাদ পদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে বৈধ-অবৈধ বিষয় তোয়াক্কা না করে সম্পদ বাড়াতেই থাকবে। এই অনৈতিক-অবৈধ সম্পদ বাড়ানোর অন্যতম পন্থাই হলো বিভিন্ন প্রকারের রিবা বা সুদী লেনদেন। সে কারণে ধনীরা ধনী হয়েই চলেছে আর দরিদ্ররা পরিণত হচ্ছে চির কাঙালে। ইসলামের মূল নীতি হলো সম্পদের বন্টন এমনিভাবে করতে হবে যাতে শুধু বিত্তশালীদের মধ্যে এই সম্পদ আবর্তিত না হয় আল□াহ্ যা কিছু সমাজের লোকদের থেকে তাঁর রসুলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল□াহ্ ও রসুল (স) এর জন্য এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন (অভাবী) এবং পথিকদের জন্য যাতে করে সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়। আর রসুল (স) যা কিছু (বিধান) দেন তা গ্রহণ করে এবং যা করতে তোমাদের নিষেধ করেন তা বর্জন কর। আর আল□াহ্কে ভয় কর কেননা তিনি শাস্ড়িদানে অত্যন্ড় কঠোর (আল হাশর ৫৯:৭)। ভেবে দেখুন পুঁজিবাদ আর ইসলামি বিধানে কত বিশাল ব্যবধান!

ইসলামি বিধান মতে মজলুম (অত্যাচারিত) গোষ্ঠি মুক্তির লক্ষ্যে শোষণ-নির্যাতনের বির"দ্ধে সদা-সর্বদা লড়াই করার অধিকার রাখে। কোন অপশক্তি কিংবা আইন বিধানই সে অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের রিবা তার ধ্বংসাত্মক থাবা বিস্ড়্বার করে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা রিবার বিভিন্ন ধরন বা রূপ পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আশা করি তারা রিবার ক্ষতিকর দিকগুলি বুঝতে পারবেন এবং অন্যকে বোঝাতে পারবেন। রিবা এখন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা মুক্ত ও স্বচ্ছ বাজারকে কলুষিত করে ধ্বংস করতে সর্বদাই তৎপর। প্রকৃত পক্ষে ন্যায্য ও মুক্ত বাজারে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই রিবা ব্যবস্থা। আল□াহ্ তা'আলা যে ব্যবসাকে হালাল করেছেন, সুদী বা রিবা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সেই ব্যবসা সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। রিবা ব্যবস্থার অকল্যাণগুলি সৎ ব্যবসার কল্যাণকর দিকগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আরো ধ্বংস করেছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মূল্যবোধ ও বিবেককে যা ফিৎনার নামান্ড়্র। সাধারণ মানুষ এগুলি বুঝতেও পারছেন না। বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি সাধারণ মানুষ সুদ বা রিবা বিবর্জিত কোন অর্থ ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারছেন না। তাই রিবার মাধ্যমে সুকৌশলে সম্পদ হাতিয়ে নেয় পুঁজিপতিরা আর ধ্বংস করে ফেলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বিবেক-বুদ্ধি ও মূল্যবোধ অথচ সাধারণ মানুষ শয়তানের এই কারসাজি জানতেও পারেনা বুঝতেও পারেনা।

যে অবিচার ও অনৈতিকতা রিবার সাথে জড়িয়ে রয়েছে তা যেমনি বিশাল তেমনি ভয়ংকর। রিবার বিষাক্ত ছোবলে নৈতিকতার বিলুপ্তিতো ঘটেছেই সেই সাথে ভেঙ্গে পড়েছে আর্থ-সামাজিক কাঠামো, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। যার পরিণতিতে সমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি-ডকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আর এসব কর্মকান্ডই আল-কুর'আনে ফিৎনারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ায় রিবার ব্যাপকতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমরা সে ফিৎনার যুগে দিনাতিপাত করছি যে যুগ সম্পর্কে নবী (স) ভবিষদ্বাণী করে গিয়েছেন। ইদানিংকালের কর্মকান্ডগুলিকেই রসুলুল্লাহ্ (স) ক্বিয়ামাতের আলামাত (নিদর্শন) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর তাই রসুল (সা) তাঁর সাহাবীদের সর্বদা ক্বিয়ামাতের আলামাত সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত: *তিনি বলেন, অন্য সবাই রসুলুল্লাহ্ (স) কে কল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, কিন্তু আমি তাঁকে ফিৎনা ও অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম–এ ভয়ে যে, কোন ফিৎনা আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রসুলুল্লাহ্ (স) আমরাতো চরম জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। অতপর আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ দান করেছেন। এই কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কোন কল্যাণ আসবে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। তবে কিছুটা ধুম্রাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, ধুম্রাচ্ছন্নতাটা কিরূপ? তিনি বললেন, এক জামা'আত আমার তরীকা ছেড়ে অন্যপথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও দেখতে পাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (স) তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই লোক হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আমাকে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত ও ইমামকে আঁকড়ে ধরবে (মু'মিনদের সংঘবদ্ধ হয়ে একই কম্যুনিটিতে বসবাস করতে হবে আর একজন নেতা বা ইমামের কাছে বাইয়াতের মাধ্যমে ওয়াদা করতে হবে এই কম্যুনিটির সকলকেই। আর প্রত্যেকেই কুর'আন সুন্নাহ্ জানবে, বুঝবে এবং শুধুমাত্র কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে প্রত্যেকে জীবন যাপন করবে)। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন সংঘবদ্ধ জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে কোন গাছের শিকড় পেলেও তা কামড়ে ধরে পড়ে থাকবে। যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়।* (সহীহ বুখারী, ১০:৬৪৯২)। [১]

১ এ সকল আলোচনা থেকে পরিস্কার বুঝা গেল কোন অজুহাতেই কুর'আন সুন্নাহ্ ছেড়ে অন্য মত ও পথে চলা যাবে না। কেননা মু'মিন হতে হলে কুর'আনের প্রতিটি বিধি বিধানকেই জানতে হবে এবং বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিতে হবে। তাই মু'মিনরা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম (২:২৮৫)। সুতরাং এই গ্রন্থ যারা পড়লেন, এবার এই গ্রন্থের তথ্য কুর'আন সুন্নাহ্র সাথে মিলিয়ে নিয়ে মানতে চেষ্টা করতে হবে। রিবা সহ বর্তমানের সকল ফিৎনা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকার উপায় হলো নিজেকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

আর প্রকৃত মুসলিম জামা'আত (তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে) এর সদস্য হওয়া যে জামা'আত পরিচালিত হবে একজন দ্বীনের বিষয়ে অভিজ্ঞ ইমাম দ্বারা। যিনি কুর'আন সুন্নাহর আলোকে তাঁর জামা'আতকে পরিচালনা করবেন [দুনিয়াবী কোন স্বার্থেই কারো কাছে বিক্রি হয়ে যাবেন না।] আর তার জামা'আতের সকল সদস্য তার কাছে আনুগত্যের বাইয়াত নিবে এবং তারই মতে পথে তথা কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে সকলের জীবন গড়ে তুলবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রিবা ও রিবা থেকে উদ্ভুত সকল গুণাহ্ ও ফিৎনা থেকে হিফাজত করুন। রসুলুল্লাহ্ (স) এর উপদেশ মত এই ফিৎনার যুগে মুসলিম জামা'আতে সম্পৃক্ত হয়ে ঐ জামা'আতের ইমামের আনুগত্য করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। রিবার মত একটি জটিল অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনে আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহ্ গফুরুর রহীম যেন আমাদের মাফ করে দেন। এবার আসুন আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দুআ করি:

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার জন্যে। তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর আর না কর আল্লাহ্ তার হিসেব নিবেন। অতপর যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। রসুল (স) ঈমান এনেছেন তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর। আর ঈমান এনেছে মু'মিনরাও। এরা সকলেই আল্লাহ্, ফিরিশতা, তাঁর সকল কিতাব এবং তাঁর সকল রসুলদের প্রতি ঈমান আনে (তারা বলে) আমরা তাঁর রসুলদের মধ্য হতে কারও মাঝে ফারাক বা পার্থক্য করিনা। আর তারা (মু'মিনরা) বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম, হে আমাদের রব আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আর (সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে কার্যভার বা দায়িত্ব দেন না। তার জন্যে তাই আছে এবং থাকবে যা কিছু ভাল সে অর্জন করেছে। আর যা কিছু সে (তার বিরুদ্ধে) অর্জন হয়েছে তার প্রতিফলও তার উপরই পড়বে। হে আমাদের রব, আমরা যদি কিছু ভুলে যাই অথবা যদি কোন ভুল করে ফেলি, আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর এমন বোঝা আপনি চাপিয়ে দেবেন না যেমনটি আপনি চাপিয়েছিলেন যারা আমাদের পূর্বে ছিল। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আপনি আমাদের থেকে আমাদের ত্রুটিগুলিকে মুছে দেন, আর আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে রহমাত করুন, আপনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক), তাই আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (২:২৮৪-২৮৬)। আ-মী-ন।

পরিশিষ্ট: রিবা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ ১ - কোন মুসলিম ব্যক্তি কি ব্যাংকে সঞ্চয়ী একাউন্টে অর্থ বা টাকা জমা রাখতে পারে? অথবা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করার কোন অনুমোদন ইসলামে আছে কি?

উত্তর - না। ব্যাংকের সঞ্চয়ী একাউন্টে মূলধনের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে যে পরিমাণ টাকা বৃদ্ধি পাবে তাই রিবা বা সুদ। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসুল (স) মুসলিমদের জন্য রিবা বা সুদ খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্নঃ ২ - কোন মুসলিমের জন্য কি অপর কাউকে রিবা বা সুদ প্রদান করা নিষিদ্ধ?

উত্তর - হ্যাঁ। যে কোন প্রকার সুদ প্রদানই হারাম। চাই তা বাড়ী, গাড়ী কেনার জন্য হোক অথবা কলেজ ইউনির্ভসিটিতে পড়ার খরচ চালানোর জন্য হোক সুদী ঋণ নিয়ে সে সুদের কিস্তি প্রদান করাই হারাম। উপরন্তু ক্রেডিট কার্ডের সুদ প্রদান করাও মুসলিমের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ। কেননা রসুলুল্লাহ্ (স) লা'নাত করেছেন সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেনদেন রেকর্ডকারী বা সুদের হিসেব লেখক এবং সুদী লেনদেনে সাক্ষীদ্বয়ের উপর। এ কারণে এই চার ধরনের লোকের মধ্যে প্রত্যেকেই সমান গুণাহ্গার।

প্রশ্নঃ ৩ - কোন মুসলিম যদি ইতিমধ্যেই সুদী ঋণ নিয়ে বাড়ী কিনে বা বানিয়ে রিবাযুক্ত লেনদেনে জড়িত হয়ে যেয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসুল (স) এর নির্দেশ মানার জন্য তার কি করা উচিৎ?

উত্তর - প্রথমেই তিনি বাড়ীটি বিক্রি করে দিয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে সুদী ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। অতপর তিনি সুন্নাতী জীবনে ফিরে এসে যথাসম্ভব ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া করে বসবাস করতে থাকবেন যতদিন না নগদ দামে একটি বাড়ী বা ফ্ল্যাট সম্ভব হয়। অতপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন যতদিন না আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঋণ না করে নিজের সুদমুক্ত জমানো টাকা দিয়ে সুন্নাহ্ অনুযায়ী ছোট একটি বাড়ী বা ফ্ল্যাট ক্রয় করার সামর্থ দান করেন।

অথবা তিনি বেশ কিছু বিনিয়োগকারী যোগাড়ের প্রচেষ্টা চালাতে পারেন যারা তার নেয়া সুদী-ঋণের অর্থ ব্যাংকে ফেরত দিয়ে দেবেন। আর বাড়ীটির মূল্য যদি আনুমানিক ১০০,০০০/- হয় এবং তিনি যদি ব্যাংক থেকে ৫০,০০০/- (ডলার) ঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে বাড়ীটির অর্ধেক মালিকানা হবে তার আর বাকী অর্ধেক মালিকানা থাকবে বিনিয়োগকারীদের। অতপর তিনি শরিকি মালিকানা বাড়ীটি ভাড়া দিয়ে দিতে পারেন। বাড়ীটির মাসিক ভাড়া যদি ১০০০ ডলার হয়, এর ৫০% অর্থাৎ ৫,০০০/- (ডলার) টাকা পাবেন তিনি আর বাকী ৫০০/- (ডলার) টাকা বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের হার

অনুপাতে ভাগ করে নিতে পারেন। অতপর উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের থেকে বাড়ীটি পুনরায় ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার চুক্তিতে যাবেন। এভাবে প্রতিবছরই বাড়ীটির বাজার দর অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি করতে হবে এবং এভাবেই এক সময় বাড়ীটা তার মালিকানায় চলে আসবে।

প্রশ্নঃ ৪ - একজন মুসলিম স্টক (শেয়ার) মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারে কি?

উত্তর - স্টক কি? প্রথমেই তা বুঝতে হবে। স্টক মূলত কোন একটি কোম্পানীর শেয়ার বা অংশ। আপনি যদি কোন কোম্পানীর স্টক ক্রয় করেন, তাহলে আপনি সে কোম্পানীর অংশীদার হয়ে যাবেন। তখন আপনি সে কোম্পানীর লাভে যেমন (আনুপাতিক হারে) অংশীদার হবেন, আবার লোকসানের ঝুঁকিও আপনাকে বহন করতে হবে। বিনিয়োগকারীগণ তাদের স্টক থেকে ডিভিডেন্ট পাবেন। স্টক যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল তা থেকে বেশী মূল্যেও বিনিয়োগকারীগণ তাদের স্টক বিক্রি করে দিতে পারবেন। মুক্ত বাজারের স্টক মার্কেট অবশ্যই বৈধ। কিন্তু বর্তমানে মুক্ত বাজারের কোন অস্তিত্ব নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্টক মার্কেটে রিবা বা সুদ ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্টক মার্কেট এখন পরিণত হয়েছে জুয়াড়ী ও চোর-ডাকাতদের আস্তানায়। অনুমাননির্ভর, ফাটকা ব্যবসা, আধিপত্য বিস্তার করেছে স্টক মার্কেটে। আর অনুমান নির্ভর ফাটকা ব্যবসাই হলো রিবা। এবার দেখা যাক অনুমান-নির্ভর (Speculative transaction) ব্যবসা বলতে কি বুঝায়। অনুমান নির্ভর ব্যবসা হলো, কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কোন পণ্য বা স্টক ক্রয় করে যে স্বভাবতই এর মূল্য বেড়ে যাবে। আর যখনই এর মূল্য বেড়ে যাবে তখনই সে ব্যক্তি পণ্যটি বিক্রি করে ফলে মুনাফা অর্জিত হবে। আবার যখন (পূর্বে বিক্রিত) পণ্য বা স্টকটির মূল্য কমে যাবে তখন পুনরায় সে তা ক্রয় করবে এবং তাতেও সে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। আসলে এ ধরনের অনুমান নির্ভর ব্যবসা আর জুয়া খেলার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। একজন মুসলিম ব্যক্তি তার নিজের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। তাতে ব্যর্থ হলে অন্য কোন হালাল ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করবে যে ব্যবসা, অভিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। বর্তমান স্টক মার্কেট তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। যে আগে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে সেই টাকার পাহাড় বানিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং সময়-সুযোগ মত তথ্য সংগ্রহ করাই স্টক ব্যবসার মূল চাবিকাঠি। তাছাড়া ঘুষ প্রদান ও তোষামোদিবৃত্তির মাধ্যমে স্টক মার্কেটের তথ্য ফাঁস করার ব্যবস্থা করা হয়। আর তাই যে যত ঘুষের মাধ্যমে পয়সা ঢালবে সে-ই স্টক মার্কেটের সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। ভোটের মৌসুমে ভোটের প্রচারণায় চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সংশি্লষ্ট কর্তাব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে তাদের থেকে স্টক মার্কেটের আভ্যন্তরীণ খোঁজ-খবর বের করে নেয়া হয়। মু'মিন ও সৎ ব্যবসায়ীরা ঘুষ দেয় না বলে তারা স্টক মার্কেটের অভ্যন্তরীণ খোঁজ-খবর নেয়ার সুযোগ পায় না। ফলে স্টক মার্কেটের পুরো ব্যবসাই পরিচালিত হয় প্রতারণার মাধ্যমে। যে কোন প্রতারণাই রিবা আর তাই স্টক ব্যবসাও রিবার আওতাভুক্ত।

প্রশ্নঃ ৫- কোন মুসলিম কি ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক হতে পারে এবং তা ব্যবহার করতে পারে?

উত্তর-ক্রেডিট কার্ডের মালিক বা গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় (সাধারণত এক মাস) নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে পারে। উক্ত সময়ের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ না করা হয় তাহলে উক্ত ঋণের বিপরীতে রিবা বা সুদ দিতে হয়। ইসলামে রিবা হারাম। এখন কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে এবং কখনোই রিবা প্রদান না করে তবে? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবেন এক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা সত্বেও ইসলামের আইন-বিধান ভঙ্গ হয় না বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো–

০ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের পদ্ধতিটিই হলো রিবার সাথে জড়িত। যে ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক হলো, সে রিবা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তাই যেই রিবা ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ হলো সে-ই রিবা ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে পড়ল। কোন মুসলিম কি এই শর্তে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে যে, সে যদি তার ঋণ সময়মত পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তাকে একটুকরো শুকরের গোশ্ত খেতে হবে অথবা পান করতে হবে এক গ্লাস হুইস্কি? না! আর কোন মুসলিম কি এই শর্তে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে যে, সে যদি সময়মত ক্রেডিটরদের ঋণ পরিশোধ না করতে পারে, তাহলে ক্রেডিটরের অধিকার থাকবে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করার? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে ক্রেডিট কার্ডের ঋণ সময়মত পরিশোধ না করলে কোন আইনে সে রিবা বা সুদ প্রদানে বাধ্য হতে পারে? সে রিবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি ঋণ গ্রহণ করতে পারে? কখনই না।

দ্বিতীয়ত, যা কিছুই রিবা ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয় তা-ই হারাম।

প্রশ্নঃ ৬ - কোন মুসলিম কি ব্যাংক চেকিং একাউন্ট চালাতে পারে?

উত্তর - আমার মতে হ্যাঁ। কেননা, চেকিং একাউন্ট সাধারণত রিবার আওতাভুক্ত নয়। তবে নির্দিষ্ট ব্যাংকের পদ্ধতিগত দিক বিবেচনা করে প্রতিটি মুসলিমকে নিশ্চিত হতে হবে এই পদ্ধতি রিবার সাথে জড়িত কিনা।

এটার কারণ দু'টি–প্রথমত, ঐ ব্যাংক আপনার টাকাকে সুদী-ঋণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি ব্যাংকের এই সুদী লেনদেনে সহায়তা করার দায়ে দায়ী হবেন। দ্বিতীয়ত, কাগুজে মুদ্রা নিজেই রিবা, কোন একসময় এই কাগুজে মুদ্রা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের নবী মুহাম্মদ (স) করে গিয়েছেন। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমেরই দায়িত্ব সর্বনাশা এই পতন থেকে নিজেদেরকে যথাসম্ভব রক্ষা করার প্রচেষ্টা করা। কেউ হয়তো সীমিত সংখ্যক কাগুজে মুদ্রা রাখার চেষ্টা করতে পারেন। আমরা আশাকরি ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রার প্রচলন হবে। দিনার ও দিরহামের

পুন প্রচলন হলে, কাগুজে মুদ্রা পতনের ভরাডুবি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্নঃ ৭ - রিবা বা সুদী অর্থ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে কিংবা মাসজিদ মাদ্রাসায় দান করে কি কোন মুসলিম রিবা খাওয়ার গুণাহ্ থেকে মুক্তি পেতে পারে?

উত্তর - না। এক মুসলিমের জন্য যা হারাম তা অবশ্যই অপর মুসলিমের জন্যও হারাম।

প্রশ্নঃ ৮ - রিবা বা সুদী অর্থ কি মাসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করা যায়?

উত্তর - না! তৎকালীন আরবের মূর্তি পূজকরাও মাসজিদুল হারামের পুনর্নির্মাণে রিবাযুক্ত হারাম অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার করেনি।

প্রশ্নঃ ৯ - সুদী অর্থ যদি নিজের জন্য ব্যবহার খরচ করা না যায়, তাহলে সে সুদী অর্থ কি করা উচিৎ?

উত্তর - রিবা বিষয়ক একটি চিঠির উত্তর আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এক মুসলিম বোন এই চিঠি লিখেছিলেন। এই বোন ইসলামে দাখিল হওয়ার পূর্বে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর একটা নির্দিষ্ট অংকের লভ্যাংশ পেয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন এই লভ্যাংশ রিবা কিনা আর যদি রিবা হয়ে থাকে তাহলে এই অর্থ কোন্ খাতে ব্যয় করা যাবে।

প্রশ্নঃ ১০ - হযরত মুহাম্মদ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে কাগুজে মুদ্রা, প্লাস্টিক বা ইলেকট্রনিক মুদ্রা এক সময় তার মূল্য হারাবে। আমরা সবাই এখন কাগুজে মুদ্রা নির্ভরশীল অর্থনীতির মধ্যে বাস করছি। এ ব্যাপারে কি কিছু করণীয় আছে?

উত্তর - বর্তমান বিশ্বে এটা একটা জটিল ও ভয়াবহ অবস্থা। সত্যিকার সমাধান/উত্তোরণ সম্ভব তখনই যখন ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম হবে। ইসলামি সরকার তখন কাগুজী, ইলেকট্রনিক মুদ্রার বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারবে। সেই সরকার তখন স্বর্ণ ও রূপাকে আইনসিদ্ধ বিনিময় মাধ্যম (Legal tender) বা মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা দিতে পারবে এবং ক্রমশ কাগুজে/ইলেকট্রনিক ইত্যাদি কৃত্রিম মুদ্রা তার মূল্য হারাতে থাকবে। তখন শ্রমিক তার শ্রমের মূল্য স্বর্ণ বা রূপার মুদ্রার মাধ্যমে পাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা স্থান পাবে। যতদিন পর্যন্ত ইসলামি শাসন এসে স্বর্ণ ও রূপাকে বৈধ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারছে ততদিন মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হবে স্বর্ণ বা রূপা ক্রয় করে আপনাদের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখুন। এছাড়া গৃহপালিত পশু (হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু) খামারেও আপনাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করতে পারেন।

প্রিয় বোন ......

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে আল্লাহকে ভীষণ ভয় করেন তা আপনি আপনার লেখনীর মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আপনার এই আল্লাহভীতির

বিষয়টি আমার হৃদয় মনকেও উদ্দিপ্ত ও আন্দোলিত করেছে। “ইসলামে রিবা নিষিদ্ধকরণের গুরুত্ব” নামের ছোট্ট বইটি আপনার নিজের জীবনে এতটা প্রভাব ফেলেছে জানতে পেরে আল্লাহর কাছে শোকর করছি। সেইসাথে আমি খুবই আনন্দিত ও উৎসাহ বোধ করছি। আলহামদুলিল্লাহ্ ।

বোন, আপনার বিনিয়োগটি ছিল এমন যাতে ক্ষতির কোন ঝুঁকী ছিলনা। ইসলামে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ হালাল। তবে এটা কখনও ব্যবসা হতে পারে না। কেননা ব্যবসার মূলনীতি হলো লাভ ও ক্ষতি উভয়টিরই অংশীদার হওয়া। আপনার বিনিয়োগ যেহেতু ঝুঁকীমুক্ত ছিল, তাই এটি নিশ্চিত রিবা। সুতরাং আপনি একটি গুরুতর গুণাহে লিপ্ত রয়েছেন। এই মুহুর্তেই আপনাকে এ জঘন্য গুণাহ থেকে মুক্তির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আপনি যদি না জানা অবস্থায় এই গুণাহয় লিপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গুণাহের বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

এবার প্রশ্ন থেকে যায়, বিনিময়ের মাধ্যমে যে সুদী অর্থ আপনার কাছে জমানো রয়েছে তা কোন্ উপায়ে খরচ করবেন? প্রথমত এই অর্থ আপনি আপনার কোন কাজে ব্যয় করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত এই অর্থ কাউকে দান করাও যাবে না। কেননা যা কিছু আপনার জন্য হারাম। তা অন্য যে কোন ব্যক্তি তথা সমগ্র মানুষের জন্যই হারাম।

একটা পথ হয়তো আপনার জন্য খোলা আছে এই সুদী অর্থ বের করে দেয়ার। যা আপনার তাওবা কবুলের জন্য সহায়ক হতে পারে। (আল্লাহই ভাল জানেন)।

আল্লাহর শত্রুরা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, বিশেষ করে বিষাক্ত রিবার ছোবলে তারা মুসলিম উম্মাহকে আক্রান্ত করেছে। বর্তমানে এই যুদ্ধ আঘাত হেনেছে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে পরতে। রিবা হলো সে যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আপনি আপনার এই সুদী অর্থ রিবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি আমাদের মতামত মেনে নেন তাহলে সুদী বিনিয়োগে যে সুদী অর্থ আপনার কাছে জমানো আছে তা দিয়ে রিবা বিষয়ক লিফলেট, বই ইত্যাদি ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারেন। সে সকল বই পড়ে মানুষ যদি নিজেদেরকে রিবার বিষাক্ত আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করে তাহলে হয়তো আপনাকে আল্লাহ গফুরুর রহীম ক্ষমা করে দিতে পারেন। যা আল্লাহতা‘আলাই ভাল জানেন।

আমি আমার এই মতামতের বিষয়ে ভাই শায়খ ইমাম আলফাহিম (Al-Fahim Jobe) জোব এর সাথে পরামর্শ করেছি। আমাদের এই পরামর্শ সঠিক হতে পারে, ভুলও হতে পারে। আল্লাহ্ তা‘আলা ভাল জানেন।

আপনার বিশ্বস্ত

দ্বীনি ভাই

ইমরাণ নযর হোসেন

প্রশ্নঃ ১০ - একজন মুসলিম কি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য Pyramid Scheme-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন? অর্থাৎ আপনি যদি কোন কোম্পানীর জন্য কমিশনের বিনিময়ে গ্রাহক/ ক্রেতা সংগ্রহ করেন বা গ্রাহক সংগ্রহের বিনিময়ে আপনার মাসজিদে সে কোম্পানী কমিশন দিলে তা কি বৈধ হবে?

উত্তর - যদি উক্ত গ্রাহক বা ক্রেতাকে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বা মাসজিদের প্রতি তার আনুগত্যের কারণে পণ্য কিনতে উৎসাহিত করা হয়, তবে পণ্য ক্রয়ে তার এই অংশগ্রহণ হবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা স্থানের প্রতি বিশেষ বিবেচনার ভিত্তিতে যা মুক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য নয়। যে কোন পণ্যকে মুক্ত ও স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হবে। বন্ধুত্ব বা বিশ্বাস-ভালবাসার বন্ধনকে পণ্য বিক্রির স্বার্থে ব্যবহার করা ও নিপীড়নের একটি রূপ। তাই এই কৌশলে পণ্য বাজারজাত করণ এক ধরনের রিবা। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণ করা মুক্ত ও স্বাধীন বাজার ধ্বংস করারই নামান্তর। এ ধরণের বাজারজাতকরণ কৌশলও এক ধরনের রিবা।

Glossary - পরিভাষা পরিচিতি

আহলে কিতাব- মুহাম্মদ (স) এর আগমনের পূর্বে যাদের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। ইহুদি ও নাসারা (খ্রীষ্টান) গণকে আহলে কিতাব বলা হয়।

ইবাদত - ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল কথা ও কাজই ইবাদাতের অন্ড়র্ভূক্ত। সলাহ্ কায়েম, যাকাত-সাদাকা, সওম, হাজ্জ, সত্যকথা বলা ও সত্য সাক্ষ্য দেয়া, আমানতদারী, মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণ, ওয়াদা পালন, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক আদায়, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, দ্বীনের ঈল্‌ম তলব, চাহিদামত কিছু না পাওয়া গেলে এবং বিপদ মুসিবাতে সবর, প্রাপ্ত রিয্‌কে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায়, অপচয় প্রতিরোধ, আমলে সলেহ, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় -অসৎকাজে বাধাদান ইত্যাদি সবই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের আওতাভূক্ত। সহজভাবে বলতে গেলে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর প্রতিটি আদেশ ও নিষেধের উপর ঈমান আনা এবং তা আমল করাই ইবাদত । ইবাদাতের বৈশিষ্ট্য দু'টি- (১) ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মত হওয়া (২) ইবাদত রসুলুল্লাহ্ (স) এর শেখানো, দেখানো ও অনুমোদিত পদ্ধতিতে হওয়া।

ঈমান- ঈমান এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। তবে শুধু মৌখিক স্বীকৃতিতে ঈমানের দাবী পূরণ হয় না বরং ঈমানের দাবী পূরণ করতে হলে প্রয়োজন – (১) ইকরার বিল লিসান বা মৌখিক স্বীকারোক্তি। (২) তাসনীক বিল জিসান বা আন্ড়রিক বিশ্বাস। মৌখিক স্বীকৃত বিষয়কে অন্ড়র থেকে মেনে নেয়া। (৩) আ'মাল বিন আরকান বা মেনে নেয়া বিষয়কে কাজে পরিণত করা। কুফরের বিপরীতেই রয়েছে ঈমানের অবস্থান তাই শির্‌ক, কুফ্‌র ও গুনাহ্‌মুক্ত হয়ে ঈমান নামক নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে তাগুতকে অস্বীকার এবং বর্জন করার পর ঈমান আনতে বলেছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া) উক্ত আয়াতেরই স্বীকৃতি বাহক। ঈমানের মূল বক্তব্য হলো

১) গয়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান আনা বলতে বোঝায়

০ তাওহীদ বা আল্লাহ্ তা'আলার অদ্বিতীয়তাবাদ।

০ তাকদীর, মালাইকা (ফিরিশতা)।

০ আখিরাত-মৃত্যু, ক্বিয়ামাহ্, হাশর-নশর (পুনর‍ুত্থান) ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান আনা।

২) রিসালাতে ঈমান আনা বলতে আমরা বুঝি

০ সকল নবী রসুল এবং

০ আল-কুর'আন সহ সকল আসমানী কিতাবে ঈমান আনা।

ইসলাম - ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। বিনাশর্তে এবং নির্দ্বিধায় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাই হলো ইসলাম। ইসলামই হলো আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীন। জীব্রীল (আ) বেদুঈন বেশে রসুল (স) কে ইসলাম কাকে বলে এই প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন-ঈমান আনা, সলাহ্ কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমজান মাসে সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ থাকলে হাজ্জ করার নামই হলো ইসলাম।

ইয়াজুজ-মা'জুজ - ইয়াজুজ মা'জুজ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ফেৎনা-ফ্যাসাদ বিস্তারে অপশক্তির উৎস। সূরা আল কাহ্ফ (১৮:৯৪-৯৮) এবং সূরা আল আম্বিয়ায় (২১:৯৫-৯৬) ইয়াজুজ-মা'জুজের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল কাহ্ফ এর বর্ণনা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যুলকারনাইন নামে এক ন্যায় পরায়ণ শাসক সাধারণ মানুষ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ইয়াজুজ-মা'জুজের মাঝে লোহার প্রাচীর বানিয়ে তাদের আটকে রেখেছেন। একসময় আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে ইয়াজুজ-মা'জুজকে মুক্ত করে দিবেন। ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান দুর্নীতিগ্রস্থ বিশ্বব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কেউ কেউ মনে করছেন লোহার প্রাচীর ভেঙ্গে ইতিমধ্যেই ইয়াজুজ-মা'জুজকে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত করে দিয়েছেন এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

কুফ্র - ঈমানের বিপরীত শব্দ হলো কুফ্র। ইচ্ছাকৃত ও সচেতনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর আইন বিধানকে অবিশ্বাস, অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করাকেই কুফ্র বলা হয়।

কাফির - কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর বিধি বিধানকে অস্বীকারকারী। এককথায় ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীরাই কাফির।

কিব্লা - যে দিকে (বাইতুল্লাহ্ বা কাবার দিকে) মুখ করে সলাহ্ আদায় করা হয়।

বিদ'আত - সওয়াব অর্জন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমন কোন ইবাদাত করা যা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসুল (স) করার নির্দেশ দেননি। যে আমল রসুল (স) নিজে করেননি, কাউকে করতে শেখাননি এবং সাহাবীদের করতে অনুমোদনও করেন নি।

জিযিয়া - ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের (নিরাপত্তা বিধানের খরচ বাবদ) উপর আরোপিত কর বা ট্যাক্স।

দ্বীন - দ্বীনের শাব্দিক অর্থ হলো বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা। আচরণধারা, আইন-বিধি ব্যবস্থাপনা। সাধারণ অর্থে দ্বীন বলতে বোঝায় আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া জীবন ব্যবস্থার

প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পন। অনেকে ইসলামকে ধর্ম বলে চালিয়ে থাকেন কিন্তু ইসলামে ধর্ম বা Religion বলতে কিছু নেই বরং ইসলামে রয়েছে দ্বীন।

দাজ্জাল - একচোখ অন্ধ ভন্ড মসীহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে মানব বেশে এবং সমাজে অদৃশ্য শির্ক ও কুফ্র শক্তি রূপে। কিয়ামাতের পূর্ববর্তী সময়ে ব্যক্তিরূপী দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে মসীহ বলে দাবী করবে এবং সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করবে। ফলে দুনিয়ার মানুষ ধোকা-প্রতারণায় নিমজ্জিত হয়ে শির্ক-কুফরের মহা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী ভন্ড দাজ্জালকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করবে। তবে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা করবেন এবং মু'মিনগণ দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে কাফির শব্দ লিখা পড়তে পারবেন (৭/৭০৯০, সহীহ মুসলিম)।

ফেৎনা - ফেৎনার শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা, বালা-মুসিবাত, কুকর্মে প্ররোচনা, প্রলোভন, মোহিনী শক্তি ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে ফেৎনা বলতে বোঝায় কুকর্মে প্ররোচিত করে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য বানিয়ে তাঁর ইবাদাত থেকে সরিয়ে রাখা।

ফ্যাসাদ - ধ্বংস, বিপর্যয়, ঝগড়া বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

ফাসিক - আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে বিশ্বাস করে বলে দাবী করে কিন্তু আমল করেনা।

সলাহ্ - সলাহ্ বাংলাদেশে ফারসী শব্দ নামাজ নামে পরিচিত। কুর'আন ও হাদীসে 'নামাজ' শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই। সলাহ্কে কেউ কেউ সালাত বলে থাকেন।

সাওম - সওম (নামাজের মত) ফারসী শব্দ রোযা নামে পরিচিতি পেয়েছে। অনেকে সাওমও বলে থাকেন তবে তাজওয়ীদের নিয়ম অনুযায়ী সাওম শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হলো সওম।

মু'মিন - জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল, মন-প্রাণ বিক্রি করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ব্যবসা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যে ঈমান এনেছে সেই মু'মিন। (তাওবা-৯:১১১)। সহজভাবে বলতে গেলে যে ঈমান এনেছে সেই মু'মিন।

ইসলাম - শির্কমুক্ত হয়ে তাওহীওদের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পন এবং শির্কমুক্ত ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে ফুটিয়ে তোলা। অন্যভাবে বলা যায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ও আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করাই ইসলাম।

মুসলিম - আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর হুকুম আহকামের কাছে যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করে সেই মুসলিম।

মুনাফিক - নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিই মুনাফিক এবং কুফ্র অন্তরে গোপন রেখে ঈমানের ভান করাই মুনাফেকী।

তাওহীদ - আনুগত্য ও ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অদ্বিতীয়তাবাদকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের মূলভাব তিনটি-

১) রূবুবিয়াত-একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই রব (পালনকর্তা) মানা।

২) উলুহিয়াত- ইলাহ্ হওয়া কিংবা ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এটা মেনে নেয়া।

৩) আসমাউস সিফাত- ইলাহ্ (ইবাদত করার যোগ্য) হিসেবে, রব (প্রতিপালক) হিসেবে কিংবা যে সকল গুনাবলী শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য, কোন মানুষ বা বস্তুকে সে সকল গুনাবলীর অধিকারী মনে করা শির্ক। যেমন সৃষ্টিকর্তা, রিয্কদাতা, আইন-বিধান দাতা, আরোগ্যদানকারী, তাকদীর নির্ধারণকারী ইত্যাদি। শির্ক তাওহীদের (অদ্বিতীয়বাদের) বিপরীত শব্দ।

মুশ্রিক - যে শির্ক করে সে-ই মুশ্রিক।

মুক্তবাজার - স্বচ্ছ ও ন্যায় বিচারমূলক বাজার। যেখানে রয়েছে–

০ প্রত্যেকের স্বাধীন প্রবেশাধিকার

০ প্রতিযোগিতায় স্বাধীন অংশগ্রহণ

০ নিজ নিজ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের অধিকার

০ যে কোন প্রকার মুদ্রা বিনিময়ের স্বাধীনতা

০ যে কোন পণ্য প্রস্তুতকরণের অধিকার

০ ছলচাতুরী, প্রতারণা, মজুদদারী, চুরী নিষিদ্ধকরণ

০ বাজার ডিঙিয়ে সুদী ঋণদান নিষিদ্ধকরণ

দারুল ইসলাম - আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মেনে নিয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ্র আইন-বিধানে পরিচালিত মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। অতীব দুঃখ ও লজ্জাজনক হলেও সত্যি যে বর্তমান দুনিয়ায় দারুল ইসলামের কোন অস্বিত্ব নেই। দারুল ইসলাম প্রতিস্থাপিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দারুল কুফ্রের দ্বারা (নাউযুবিল্লাহ্)।

দারুল হারব - দারুল ইসলামের বিপরীতে রয়েছে এর অবস্থান। তবে দারুল ইসলাম না থাকলে দারুল হারব এর উপস্থিতি অবান্তর। আরবী ভাষায় 'হারব' শব্দের অর্থ যুদ্ধ। যে দেশে মানুষ বিশেষ করে মুসলিমরা নির্যাতিত, নিপিড়ীত এবং নিগৃহীত সে সকল দেশকে দারুল হার্ব বা সংঘাতের সাম্রাজ্য বলে।

তাগুত-আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যে কোন ব্যক্তি, স্বত্তা বা বস্তুর ইবাদাত করা হয় সে ব্যক্তি বা বস্তুই হলো তাগুত। তাগুত হতে পারে শয়তান, নিজের নাফ্স, শাসক গোষ্ঠি, পীর-দরবেশ, মূর্তি, পাথর, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি। তাগুতের অন্যতম পরিচয় হলো–

০ শয়তান

০ নাফস–কুপ্রবৃত্তি, মন্দ-চাহিদা। মু'মিন কখনো নাফসের অনুগত বান্দা হয় না। (আল ফুরক্বন-২৫:৪৩, আল জাসিয়া ৪৫:২৩) ।

০ শাসন শক্তি, কুপ্রথা ইত্যাদি এবং এমন গইরুল্লাহ যার কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়। (আল বাকারা ২:১৭০, আত ত্বাহা- ২৪, আন নিসা-৪:৬০)।

০ অন্ধভাবে মেনে চলার দাবীদার শক্তি-পীর, মাজার (আত তাওবা-৯:৩১, ১৬:৩৬, ৪:৪৮,৫১)।

০ এমন গইরুল্লাহ যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক দল প্রানান্ত যুদ্ধ করে (৪:৭৬)।

মুত্তাকী - যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে বা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে সেই মুত্তাকী। আলী (রা) এর বর্ণনায় মুত্তাকী হলো তারা

০ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পায় গোপনে, প্রকাশ্যে, সামনে, পেছনে সর্বাবস্থায়।

০ যারা কুর'আন (শিক্ষা করে এবং) কুর'আনে যা আছে তাই (প্রতিটি আইন মেনে চলে) আ'মল করে।

০ যারা অল্প পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

০ যারা প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর দিনটির (অপেক্ষায় থাকে এবং আপনা থেকেই তার) জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।